Sahittya Sanskriti

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা.] ২০০৩ হিজরী ১৪২৪

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
Dhaka Sahittya Sanskriti Kendra

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ২০০৩

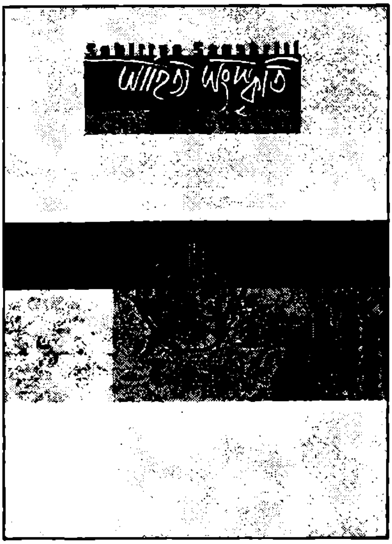

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ২০০৩

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

প্রচ্ছদ

মুবাশ্বির মজুমদার

প্রকাশকাল

রবিউস সানী ১৪২৪

আষাঢ় ১৪১০

জুন ২০০৩

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

প্রকাশনায়

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

ফোন ৯৩৩২৪১০

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

মোশাররফ হোসেন খান
আসাদ বিন হাফিজ
সোলায়মান আহসান
হাসান আলীম
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
নাসির হেলাল
শরীফ আবদুল গোফরান
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
জাকির আবু জাফর
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিচালনা পরিষদ ২০০৩

উপদেষ্টা	:	ডাঃ রিদওয়ান উল্লাহ শাহিদী
সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সহকারী	:	সালমান আযামী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ্ আলম নূর
সহকারী	:	হাসান আখতার
প্রকাশনা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
অফিস ও পাঠাগার	:	নাসির হেলাল
সহকারী	:	তৌহিদুর রহমান
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সহকারী	:	জুবাইর হুসাইন
প্রচার সম্পাদক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সহকারী	:	ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
দাওয়া সম্পাদক	:	আবদুর রহীম খান

বিভাগীয় দায়িত্বশীল

শিল্পকলা	:	ইব্রাহীম মণ্ডল
শিশু কল্যাণ	:	হাসান মুর্তজা
সাহিত্য	:	শরীফ আবদুল গোফরান
যোগাযোগ	:	জাকির আবু জাফর
তথ্য	:	শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
সীরাতুন্নবী (সা) উদযাপন কমিটি ২০০৩

আহ্বায়ক

সাইফুল্লাহ মানছুর

সচিব

আসাদ বিন হাফিজ

সদস্য

মাহবুবুল হক
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
শাহ আলম নূর
মোশাররফ হোসেন খান
ইব্রাহীম মণ্ডল
হাসান আলীম
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
নাসির হেলাল
হাসান মুর্তজা
শরীফ আবদুল গোফরান
হাসান আখতার
রফিকুল ইসলাম সরদার
মাহফুজ চৌধুরী
আবুল কাশেম
একরাম হোসেন মুজাহীদ
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
মোঃ আবেদুর রহমান
আবদুর রহীম খান
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
নিজাম সিদ্দিকী
জাকির আবু জাফর
সালমান আল আযামী
আবুল হোসাইন মাহমুদ

www.pathagar.com

শাহীন হাসনাত
তৌহিদুর রহমান
ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
মশিউর রহমান
জুবাইর হুসাইন
নূরুজ্জামান ফিরোজ
সিরাজ মুহাম্মদ
এস, এম, শামীমুল হক

বিভাগীয় কমিটি

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিভাগ

আহ্বায়ক	:	ইব্রাহীম মণ্ডল
সচিব	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সদস্য	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
		সালমান আল আযামী
		মাহবুব মুর্শিদ
		আবদুর রহীম
		মুবাশ্বির মজুমদার
		মোঃ শহীদুল্লাহ
		রফিকুল্লাহ গাযালী
		ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
		আবদুল আহাদ শোয়েব
		আহসান হাবীব খান

সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনী

আহ্বায়ক	:	আসাদ বিন হাফিজ
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সচিব	:	আবদুর রহীম খান
সদস্য	:	মাহবুবুল হক
		মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
		নাসির হেলাল
		নিজাম সিদ্দিকী
		হাসান আখতার
		আবুল হোসাইন মাহমুদ
		তৌহিদুর রহমান

www.pathagar.com

হামদ-না'ত কবিতা সন্ধ্যা

আহ্বায়ক	:	হাসান আলীম
সচিব	:	শরীফ আবদুল গোফরান
সদস্য	:	শাহ্ আলম নূর
		সোলায়মান আহসান
		মোশাররফ হোসেন খান
		আবুল কাশেম
		একরাম হোসেন মুজাহীদ
		শাহীন হাসনাত
		মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
		মহিউদ্দিন আকবর
		মশিউর রহমান
		নূরুজ্জামান ফিরোজ
		এস, এম, শামীমুল হক

স্মারক বিভাগ

আহ্বায়ক	:	মোশাররফ হোসেন খান
সচিব	:	কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
সদস্য	:	আসাদ বিন হাফিজ
		সোলায়মান আহসান
		হাসান আলীম
		মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
		নাসির হেলাল
		শরীফ আবদুল গোফরান
		জাকির আবু জাফর
		মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
		নজরুল ইসলাম

মেহমান বিভাগ

আহ্বায়ক	:	মাহবুবুল হক
সচিব	:	শাহীন হাসনাত
সদস্য	:	জাকির আবু জাফর
		সিরাজ মুহাম্মদ

www.pathagar.com

অর্থ বিভাগ

আহ্বায়ক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সচিব : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সদস্য : রফিকুল ইসলাম সরদার
ইকবাল কবীর মোহন
ওমর বিশ্বাস

অফিস

আহ্বায়ক : নাসির হেলাল
সচিব : জুবাইর হুসাইন
সদস্য : আহসান হাবীব খান

অভ্যর্থনা ও শৃংখলা

আহ্বায়ক : হাসান মুর্তজা
সচিব : মাহফুজ চৌধুরী
আবদুর রহীম খান
আবুল হোসাইন মাহমুদ

প্রচার

আহ্বায়ক : মোঃ আবেদুর রহমান
সচিব : ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
সদস্য : সরদার ফরিদ
রফিক মুহাম্মদ
ওমর বিশ্বাস

www.pathagar.com

স ম্পা দ কী য়

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলের (সা) অবদান

আজ এ সত্য অধিক উদ্ভাসিত যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে আরবের রয়েছে এক প্রাচীনতম ঐতিহ্য। রাসূলের (সা) আগমনের বহু পূর্ব থেকেই আরব ভূখণ্ড ছিল কাব্যসাহিত্যে অত্যন্ত উর্বর। আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মুহাম্মাদ (সা) যে গোষ্ঠী এবং পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন তারও ছিল এক আলোকিত ঝলমলে ইতিহাস। এরপর তিনি যে মা হালিমার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তাদেরও ছিল ঐতিহ্যিক ভিত্তিভূমি। সবমিলিয়ে দেখা যাচ্ছে রাসূলের (সা) জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং সার্বিক বিকাশ–সে ছিল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবহে অতিশয় সিক্ত।

আশ্চর্যের বিষয় বটে, এবং নিশ্চয়ই আমাদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের এক অশেষ নেয়ামত যে, তাঁর হাবীব হিসেবে যাকে গ্রহণ করলেন, তিনি এক বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ আরবী ভাষী। আর তাঁর জন্য আল্লাহ পাক যে কিতাব মনোনীত করলেন, অর্থাৎ আল কুরআন– যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ– তা অবতীর্ণ হয়েছে এই আরবী ভাষায়। আল কুরআন নিছক কোনো কাব্যগ্রন্থ বা সুপাঠ্য কোনো সাহিত্যগ্রন্থ নয়। এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার– আর তা হলো 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন'। কিন্তু এটাওতো অনস্বীকার্য, আল কুরআনের প্রাঞ্জল ভাষার যে মাধুর্য, যে শীতল ও কোমল প্রবাহ, যে গূঢ় ভাবার্থ, যে ব্যঞ্জনা, যে ছন্দ অনুরণন তাতে যে কোন রূঢ় সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য যে– হ্যা, এর ওপর আর কোনো সাহিত্য বা কাব্য হয় না। কী অসাধারণ এর আবেদন যে, লক্ষ্য-কোটিবার একই আয়াত পাঠ করেও কোনোপ্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ জাগে না। সারাক্ষণ সারাটি জীবন পাঠ করলেও পাঠের তৃষ্ণা মেটে না, পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থই এর সাথে কি তুলনীয় হতে পারে? সেটা সম্ভবও নয়। কারণ মহান রাব্বুল আলামীন একান্ত নিজের মত করেই আল কুরআনকে পূর্ণতা দান করেছেন। আর এই বিস্ময়কর নিয়ামতের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন এর উপযুক্ত এক বাহক-নবী মুহাম্মাদকে (সা)। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্বাচিত নবী মুহাম্মাদের (সা) প্রজ্ঞা এবং সার্বিক যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত।

আল কুরআনের পরে আল হাদীসের দিক যদি দৃষ্টি রাখি, তাহলে আমরা সেখানেও শিল্প-সাহিত্যের সমাহার লক্ষ্য করবো। হাদীসের ভাষা, বাক্যবিন্যাস, রিদম– চলমান যে-কোনো সাহিত্যগ্রন্থ থেকেই সর্বোত্তম। হাদীসের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে খুব স্বল্প কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশ পায়। রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন, "আমাকে স্বল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশের যোগ্যতা দান করা হয়েছে।" নিশ্চয়ই, তা না হলে তিনি কীভাবে এমন যুগান্তকারী বাক্যবিন্যাসের অধিকারী হলেন!

রাসূল (সা) ছিলেন সকল মানুষের নেতা। তাঁর মধ্যে ছিল মানবীয় সকল যোগ্যতা ও গুণের সমাহার। তিনি আমাদের সকল ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, শিক্ষক। এজন্যই কোনো জ্ঞানেরই ঘাটতি ছিল না তাঁর মধ্যে। সর্বপ্রকার যোগ্যতা আর পূর্ণতাই তাঁকে দান করেছিলেন মহান রাব্বুল আলামীন। বিস্ময়করই বটে, একজন উম্মি নবী, অথচ জ্ঞানের

www.pathagar.com

সমুদ্র। শিল্প-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বোধ তাঁর মধ্যে ছিল। শিল্পের ব্যবহারও তিনি জানতেন। আবার তাঁর শিল্পবোধসম্পন্ন সমালোচনাও উম্মতের জন্য সর্বকালের অনুকরণীয় হয়ে রইলো।

রাসূলের (সা) প্রেরণা ও সম্মানজক উচ্চারণ তো কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সত্যপন্থী, কল্যাণবাহী কবির জন্যই সমান গ্রহণীয়। সত্যই, এ এক বিরল শ্লাঘার বিষয়, কবিদের জন্য। রাসূল (সা) কবি ছিলেন না। তাঁর জন্য সেটা শোভনও ছিল না। আল্লাহ পাকের এ ধরনের কোনো মঞ্জুর ছিল না রাসূলের (সা) জন্য। কিন্তু প্রিয় নবীর (সা) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ আর সহযোগিতা যে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল তা অস্বীকারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাসূলের (সা) চারপাশে যে সকল আলোর আবাবিল, সাহাবায়ে কেরাম (রা) ছিলেন, তাদের অনেকেই সেই সময়কার একেকজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। কবি লবীদ, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ, কবি কা'ব ইবনে মালিক, হাস্সান ইবন সাবিত সহ প্রচুর কবির নাম করা যায়। তাদের মধ্যে এমনও ছিলেন, যারা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শূলিকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে গেছেন আর হাসতে হাসতে শহীদ হয়েছেন।

দুই.

একজন মুমিন-মুসলমানের কোনো কাজই উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। অশুভ, অকল্যাণকর কিংবা গর্হিত কাজের তো প্রশ্নই ওঠে না। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নিরর্থক কূটিল বাক্য একজন সচেতন ও সতর্ক বান্দার জন্য ভারসাম্যহীন ও অশোভনীয়। কেননা আমরাতো স্বীকারই করেছি, "আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু-কেবল সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যই উৎসর্গীকৃত।" তাহলে আর শংকা কিসের! সুতরাং আমাদের প্রতিটি কাজই হতে বাধ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, রাসূলের (সা) নির্দেশিত পথে।

শিল্প-সাহিত্য যে তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়, রাসূলের (সা) সূক্ষ্মদর্শী বিবেচনা থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। বরং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ব্যাপক। এই কারণে তিনি এর বিকাশ, বিস্তার ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে কী অপরিসীম ভূমিকা বা অবদান রেখেছেন, তা বর্ণনাতীত। কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলের (সা) এই অবদানের কথা বিশ্বাসী কবিদের হৃদয়ে সাহস, প্রেরণা ও শক্তি যোগোবে। সত্য বটে, তিনি কবি ছিলেন না; কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিশ্বাসী কবিই কি তাঁকে পথচলার, কাব্যচর্চা, সাহিত্যের রাহবার না মেনে পারেন! বস্তুত, আমাদের শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতির উৎসমূলেও রাসূলই (সা) একমাত্র পথপ্রদর্শক, মহান নেতা। তাঁর বিকল্প আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

তিন.

বরাবরের মত এবারও ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারই ধরাবাহিকতায় এই সংকলনের প্রকাশ। যারা যেভাবে আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেককেই মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আল্লাহ হাফিজ। ■

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৯

চয়ন

মহাকবি গ্যেটের কবিতা ১৭ ॥ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ১৮ ॥ শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা ১৯ ॥ ফররুখ আহমদের কবিতা ২০

প্রবন্ধ

মাহে রবিউল আউয়াল ॥ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ॥ তরজমা : আবুল আসাদ ২২
নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর বিপ্লবী জীবন ॥ আব্বাস আলী খান ২৫ ॥ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সমসাময়িক শাসকবৃন্দ ॥ এ. কে. এম. নাজির আহমদ ৩২
ইসলাম ও আমরা ॥ ড. কাজী দীন মুহম্মদ ৪০ ॥ রাসূলের প্রতি আনুগত্য ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৪৮ ॥ শান্তি ও প্রগতির মহানবী (সা) ॥ হাফেজা আসমা খাতুন ৫৩

কবিতাগুচ্ছ

আশরাফ সিদ্দিকী ৬৩ ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ ৬৪ ॥ মুহম্মদ নূরুল হুদা ৬৪
আল মুজাহিদী ৬৬ ॥ ব'নজীর আহমদ ৬৭ ॥ সানাউল্লাহ্ নূরী ৬৮

প্রবন্ধ

বিদেশী ভাষায় রাসূল-প্রশস্তিধর্মী কবিতার বাংলা রূপান্তর ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ৭০
মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যু-দর্শন ॥ মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন ১০৩ ॥ মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) কাদের এবং কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন ॥ আবদুস শহীদ নাসিম ১২১
যুগসন্ধিক্ষণের অনন্ত রাহবার রাসূলুল্লাহ (সা) ॥ আকরাম ফারুক ১২৪

কবিতাগুচ্ছ

সোলায়মান আহসান ৯১ ॥ মুকুল চৌধুরী ৯২ ॥ আহমদ আখতার ৯৩ ॥ মাহফুজ পারভেজ ৯৪ ॥ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ৯৫ ॥ দেলওয়ার বিন রশিদ ৯৬ ॥ আনোয়ারুল ইসলাম ৯৭ ॥ জাকির আবু জাফর ৯৮ ॥ রফিক রইচ ৯৯ ॥ ওমর বিশ্বাস ১০০ ॥ ফজলুল হক তুহিন ১০০ ॥ মহিবুর রহিম ১০২

প্রবন্ধ

রাসূল (সা) যুগে আরবী কবিতার ধারা ও প্রকৃতি ॥ ড. আবদুল জলীল ১৫৫
ছোটদের সাথে মহানবীর (সা) আচরণ ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল হক ১৬০
মহানবীর (সা) পারিবারিক জীবন ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ১৬৫

ভ্রমণ

নবীগৃহে একদিন ॥ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৭০

কবিতাগুচ্ছ

আবদুল মুকীত চৌধুরী ১৩৫ ॥ আবদুল হাই শিকদার ১৩৪ ॥ আবদুল হালীম খাঁ ১৩৭ মাহবুবুল হক ১৩৮ ॥ তমসুর হোসেন ১৩৯ ॥ মসউদ-উশ-শহীদ ১৪০ ॥ মুর্শিদ-উল-আলম ১৪০ ॥ মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১৪১ ॥ মানসুর মুজাম্মিল ১৪২ ॥ নূরুজ্জামান

www.pathagar.com

ফিরোজ ১৪২ ॥ আলতাফ হোসাইন রানা ১৪৩ ॥ হেলাল আনওয়ার ১৪৪ ॥ নিজাম সিদ্দিকী ১৪৪ ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল ১৪৫ ॥ জুলফিকার হায়দার ১৪৬ ॥ সিরাজ মুহাম্মদ ১৪৭ ॥ সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিঞা ১৪৭ ॥ সোহরাব আসাদ ১৪৮ ॥ রুকনুজ্জামান কাজল ১৪৯ ॥ বান্দা হাফিজ ১৫০ ॥ গোলাম নবী পান্না ১৫০ ॥ আবুল হোসাইন মাহমুদ ১৫১ ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস ১৫১ ॥ ইসমাঈল হোসেন সৌরভ ১৫২ ॥ উম্মে হানি পারভিন ১৫৩ ॥ মাহফুজুর রহমান চৌধুরী ১৫৪

প ত্র সা হি ত্য

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পত্র ও মু'জিয়া ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ৮৫ ॥ আরবী পত্রসাহিত্যের বিকাশধারা ॥ ড. নজরুল ইসলাম খান ২১৩ ॥ রাসূল (সা)-এর আমলে আমীর ও বাদশাহদের নামে লেখা চিঠি ॥ মুহাম্মদ আবেদুর রহমান ২১৭

গ ল্প

নেকাব হরণ ॥ হাসান আলীম ৮৮ ॥ বাঁধনের বাঁধন ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ১২৭
চন্দ্রালোকে মুক্তি ভাসে ॥ সাবিনা মল্লিক ১৯৩ ॥ আলোর সন্ধানে ॥ নাসিমুল বারী ২২৩
শান্তির দূত ॥ রফিক মুহাম্মদ ২৩৯

প্র ব ন্ধ

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা) ॥ আসাদ বিন হাফিজ ১৭৩
বিশ্বায়ন ও বিশ্বনবী (সা) ॥ শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ ১৮৪
না'ত : বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত ॥ ড. আবদুল ওয়াহিদ ১৯০
নবী করীম (সা)-এর কতিপয় পছন্দ-অপছন্দ ॥ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ১৭৯
এক নজরে রাসূল (সা)-এর জীবন ও কর্ম ॥ মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম ২৪২
আরবী গদ্যে রাসূলে কারীম (সা) ॥ মুহাম্মদ নূরুল আমীন ২২৬ ॥ জীবন সায়াহ্নে মুহাম্মদ (সা) ॥ আবু তাহের মোঃ সালেহ ২৪৬ ॥ রাসূলের (সা) পথে ॥ কাজী তাবাসসুম ২৫২

ক বি তা গু চ্ছ

সৈয়দ শামসুল হুদা ১৯৮ ॥ বিশ্বনাথ হালদার ১৯৮ ॥ মামুন আবদুল্লাহ ১৯৯ ॥ হাবিবুর রহমান ১৯৯ ॥ নজরুল ইসলাম শান্ত ২০০ ॥ মোহাম্মদ সোলায়মান আকন্দ ২০১ নজরুল ইসলাম সাধু ২০১ ॥ আসাদুল্লাহ মামুন হাসান ২০২ ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০৩ শাহ আলম বাদশা ২০৪ ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ২০৪ ॥ হোসেন সৈয়দ ২০৫ ॥ মাসুম সাঈদ ২০৬ ॥ মমিনুর রহমান মনি ২০৬ ॥ কামরুল হাসান মল্লিক ২০৭ ॥ মাসরুর নেপচুন ২০৮ ॥ মতিউর রহমান মনির ২০৯ ॥ রেজা রহমান ২১০ ॥ মনসুর আজিজ ২১১ ॥ নূরুল ইসলাম জেহাদী ২১১ ॥ নজরুল ইসলাম ২১২

প্র ব ন্ধ

মহানবী (সা)-এর অনন্য ব্যক্তি প্রতিভা : একটি নবতর মূল্যায়ন ॥ উবায়দুর রহমান খান নদভী ২৫৩ ॥ উপমহাদেশে সীরাত চর্চা ॥ নাসির হেলাল ২৬১ ॥ শামায়িলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ॥ মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান ২৮১
রাসূলের (সা) অনুসরণ ॥ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ২৯৬

প্র তি বে দ ন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুহাম্মদের গান ॥ মহাকবি গ্যেটে
তরজমা : গোলাম মোস্তফা

দেখ্ চেয়ে ওই ঝর্ণাধারা কেমন বয়ে যায়
ঝিকমিকিয়ে মাঠের পরে ছায়াপথের প্রায়।
ঘুমিয়ে ছিল সে এতদিন মেঘের স্বপন-লোক
বনগিরির শীর্ষে নেমে খুলল তাহার চোখ।
পথের নুড়ির সংঘাতে তার বাজে গানের সুর
আর্শি সম পেশানি তার স্বচ্ছ-সুমধুর
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর ॥

পথের মাঝে সিক্ত করি অনেক পতিত ভূঁই-
ফুটালো সে কতই না ফুল- নার্গিস আর যুঁই।
ফুলেরা সব কয় ইসলাম: সামনে এস ভাই।
তৃণভূমির উপর দিয়ে আনন্দে সে যায়
কুলকুল গানের ধ্বনি বাজে তাহার পায়।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর ॥

ছোট ছোট ঝর্ণারা কয়: বন্ধু, কোথায় যাও?
একটু দাঁড়াও, আমাদেরো সঙ্গে করে নাও।
অল্প পানির অভিশাপে চলার তাকত নাই
মাঠের বালুর অত্যাচারে কোথায় বল যাই?
ঝর্ণা তখন দু'পাশ থেকে বাড়িয়ে দিল হাত-
আদর করে সবাইকে সে নিল আপন সাথ।
সবার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটল সে দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর ॥

সব বাধা সে পেরিয়ে এল সাগর মোহনায়-
পাহাড় ও মাঠ পারল না তার বাঁধন দিতে পায় :

www.pathagar.com

বন্যাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে দালান-কোঠা ঘর
পার হয়ে সে গেল কতই নগর ও প্রান্তর।
সাগর সাথে মিলন তরে এখন সে চঞ্চল–
সফলতার আনন্দে তার বক্ষ সমুজ্জ্বল।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর ॥

মূল কবিতাটি গ্যেটের রচিত। গ্যেটে 'মুহাম্মাদ' (Mohamet) নামক একখানি নাটক রচনা করেন। সেখানে এই গানটি আলির মুখে দেওয়া হইয়াছে। গানটিতে হযরত মুহাম্মাদের বিরাট সাফল্যের প্রতি ইংগিত আছে। গানটির নাম 'মুহাম্মাদের গান' (Mahomet's Gesang)। ইকবাল গ্যেটের ভাবানুসরণে 'হুদী' কবিতাটি লেখেন।
–গোলাম মোস্তফা

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

দশদিক ছাপি' ওঠে আবাহন, "ধন্য ধন্য মুত্তালিব!
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আবদুল্লাহ খোশ-নসিব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি, নিখিল ভুবন করে স্তব।"
. . . .
ধন্য ধরণী-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাঁহারে, যে জন ধরেনি; অসীম শূন্যে গো
যাহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সেজন, এও কি গো কভু সম্ভবে
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি' এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া-অস্তপাট।
পূর্বে সূর্য ওঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ঐ,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল শরণ চরণের লাগি' তুই কি আরব এত সেদিন
তপস্যা করি' করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন।
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবী গো, তোমাতে আসিল নবীর শেষ।

[অনাগত ॥ মরু ভাস্কর থেকে]

www.pathagar.com

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা

মহাপয়গাম

অন্ধ তিমিরে ভরেছে ভুবন আকাশ গিয়াছে মিশি,
পাপের সিন্ধু রুদ্র গরজে ধ্বনিছে বিপুল দিশি।
মহা-তাণ্ডবে জাগে কোলাহল ঝন্‌ঝায় ওঠে রোল
এস্রাফিলের শিঙায় অকালে ধ্বংসের কলরোল।
প্রলয়ের মেঘ উঠেছে রুখিয়া রুদ্র বিষাণ গাজে
স্বেচ্ছাচারের হুঙ্কার ঘন দুন্দুভি-রোলে বাজে।
দিগ্‌দিগন্তে উঠে মহামার হাহাকারে ফাটে ধরা;
মরণের বুকে লুটায়ে পড়েছে মূরছি' বসুন্ধরা।

সহসা হেরার তুঙ্গ শিখরে কে গো বীর নির্ভয়!
উদার কম্বুকণ্ঠে ঘোষিলে নিখিলের বরাভয়।
শিহরি' চকিতে দেখিল চাহিয়া নিখিলের নরনারী
দীপ্ত মুরতি কে মহামানব যুগের তিমির বারি'
জ্যোতির রশ্মি-মণ্ডলে বসি, ঘোষিতেছে পয়গাম
শাশ্বত বাণী পূর্ণ কণ্ঠে মন্দ্রিছে অবিরাম।
মরুদিগন্ত গিরিকন্দর ধ্বনি' ওঠে বার-বার
সত্য মহান একক আল্লা, এ-তিন ভুবনে আর
নহে পূজনীয়, নহে বরণীয়, নহে কেহ মহীয়ান-
তিমির যুগের প্রভাতে আজিকে আসিয়াছে ফরমান।
উদ্দেশে তাঁর নত কর শির, মহানিধি মহিমার
শক্তি তাঁহার চির-বিজয়িনী মণি-খনি করুণার।
মানুষ আমরা চিরদাস তাঁর, প্রভু তিনি সবাকার
আকাশ-ভুবনে মহাবাণী এই ঘোষিতেছে অনিবার।
সৃষ্টির বুকে বুদ্বুদ মোরা ফুটিয়া উঠেছি সবে
চিরমঙ্গল অবদান তাঁর ধরণীর উৎসবে।
অরুণিত নব যুগের আলোকে হে মানব মতিমান!
সাধনে তোমার সার্থক কর সেই মহা-অবদান।
নিখিল মানব সোদর তোমার ভুলে যাও অভিমান!
মহামিলনের সিন্ধু-সলিলে ডালি দাও ভেদজ্ঞান।
নিখিল ভ্রাতৃমিলনে আজি এ বালুময় মরুখানে
মহামানবতা উঠুক জাগিয়া সৃষ্টির কল্যাণে।

www.pathagar.com

পাপের ঘূর্ণি থামিল সহসা সিন্ধুর কলরোল
স্বেচ্ছাচারের রুদ্র নটন কোলাহল কল্লোল
থেমে এল সব, স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসি' ধরণীরে
মহাধর্ম্মের নবারুণ ফুটে প্রাচী'র তিমির শিরে।

বিস্ময়-হত নরনারী সব চেয়ে রহে অনিমেষে
সহসা দরুদ ফুটিল কণ্ঠে অজ্ঞাতে অবশেষে;
লক্ষ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া "আলায়কাস্ সালাম
ইয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়কাস্ সালাম"।

[কলিকাতা, ১৩৩৪]

ফররুখ আহমদের কবিতা

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হ'ত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।
তাই সে যখন এল এ ধরায় সে নবী যখন আবির্ভূত
দেখে এ বিশ্ব বিস্মিত চিতে সে দূতের তনু মহিমা পূত,
নিখিল, ব্যাপ্ত তার অন্তরে পর্বত হ'তে পথের ধূলি,
এ-হাতে বজ্রনির্ঘোষ যবে ও-হাত এনেছে গোলাব তুলি,
ক্লিন্ন তিমিরে যাত্রীরা যবে দেখে সম্মুখে শ্বাপদ ভূমি
এ সময় হে জ্যোতির্ময় নূরানী চেরাগ আনলে তুমি।
'কে আমি' জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ-পালক উম্মী নবী!
দীপ্ত সূর্য আলো আরশিতে ধরিয়াছে কাল তোমারি ছবি।
সে এল, সে এল রাজার মত সে এ-ধূলিতে তবু দীনের মত,
পুষ্পকোমল তার অন্তর হ'ল বিক্ষত কাঁটায় ক্ষত,
তবু সে জাগালো মেশকের বাস, জাগালো মরুতে গুলে আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে ক্ষুব্ধ নার।

দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগণ বিপুল দেহ
ক্লেদাক্ত পথে ফোটায়ে মুকুল সাজালো তাদের ধরণী গেহ,

www.pathagar.com

যে মরুতে জানি ফুল ফোটে নাকো, যেখানে ঊষর পৃথ্বীতল,
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য, আনলে অঝোর ধারা বাদল।

তবু ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো এ অন্ধদের?
আজ বিস্মৃতি তোলে যে আড়াল তোমার দিনের এই দিনের!
এখানে যে ম্লান কদর্যতার ছবি আর ক্ষুধা যায় কি সেখা,
গড়ায় বিপুল অজগর তার লেলিহান ক্ষুধা, বিপুল ব্যথা,
আকাশে আকাশে তারি বিষাক্ত প্রশ্বাসে হেরি মূর্ছাতুর
আলো-বিহঙ্গ ভোলে হে সূর্য, তোমার শেখানো পথের সুর।

[সিরাজাম মুনীরা থেকে]

www.pathagar.com

মাহে রবিউল আউয়াল

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

তরজমা : আবুল আসাদ

□

রবিউল আউয়াল মাস বিশ্ব-মুসলিমের ঘরে বয়ে নিয়ে আসে আনন্দের প্লাবন। তারা এ সময় রাসূলুল্লার (সা) পূতঃস্মৃতি স্মরণ করে, আলোচনা করে এবং তাঁর প্রতি তাদের হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসা প্রদর্শন করে। বিশ্বস্রষ্টা আল্লার প্রিয় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যারা ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তারা ভাগ্যবান নিঃসন্দেহে। নবীগণের সর্দার যিনি, বিশ্ব-জগতের জন্য মূর্তিমান রহমত যিনি, তাঁর গৌরব গাঁথায় যেসব মানব উচ্চকণ্ঠ, তারা সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। কিন্তু যে মহামানবের স্মৃতিচারণা মুসলমানদের জীবনে বয়ে আনে ভক্তি ও আনন্দের মহাপ্লাবন, তাঁর বিরাটত্ব ও মহত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি সত্যই মুসলমানরা অনুধাবন করে?

মুসলমানদের সকল গৌরব ও আনন্দধারার উৎস যিনি সেই মহানবীর আবির্ভাবকাল বলেই যদি রবিউল আউয়াল এই মাসে তোমাদের আনন্দোৎসব হয়ে থাকে, তাহলে রবিউল আউয়াল মাস আজ তোমাদের জন্য বিষাদের মাস। কারণ এই পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, সেই মহানবীর সকল আদর্শকে কি তোমরা নিদারুণ অবহেলা দিয়ে তোমাদের জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দাওনি?

তোমাদের গৃহাঙ্গন যখন নবী-দিবসের উৎসব-জৌলুসে ভরে তোল, তোমাদের আত্মার নিঃসীম অন্ধকারে তখন মহানবীর জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালতে তোমরা ভুলে যাও। মনোরম ফুলের সুন্দর সাজিতে ভরে ওঠে তোমাদের উৎসব টেবিল, কিন্তু পুণ্যকর্মের ফুল তোমাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় না। সাজি ভরা ফুলের গন্ধে তোমাদের হৃদয় বিমোহিত হয়, কিন্তু ইসলামের সুবাস-সৌন্দর্য হতে পৃথিবী থেকে যাচ্ছে বঞ্চিত।

পবিত্র রবিউল আউয়ালের আগমনে তুমি আনন্দ-উদ্বেল হয়ে উঠ, কিন্তু সেই সঙ্গে মহানবীর আদর্শের সাথে কর তুমি বিশ্বাসঘাতকতা। মুসলিম আনন্দ-উৎসবের বসন্ত কাল এই রবিউল আউয়াল। কারণ কুফরি ও অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি টেনেছিল এই মাস এবং সত্য ও পুণ্যের সোনালী সূর্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মাসে। সুতরাং আজ

www.pathagar.com

যখন তুমি দেখ বিচারের নিক্তিতে অন্যায় ও অসত্যের কাছে সত্য ও পুণ্যের পরাজয় ঘটছে, তখন তুমি তোমার পরাজয় ও পদস্খলনের জন্য বিলাপ না করে কেমন করে আদর্শের বসন্ত-উৎসব পালন করতে সক্ষম হও?

ফারান গিরি শিখর থেকে ইসলামী আদর্শের যে সোনালী রাজপথ তার যাত্রা শুরু করেছিল, তা যেমন পরিত্যাজ্য নয়, তেমনি পরাজয়ের পশরা মাথায় নিয়ে তার অগ্রযাত্রা থেমেও যেতে পারে না। আর আদর্শের সে সোনালী রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে শুধু রবিউল আউয়ালের বসন্ত-উৎসব পালন করা চলে।

ইসলাম স্বয়ং সর্বশক্তিমানের গড়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। অসত্য ও অন্যায়ের সকল পতাকাধারীদের উপর এ চিরবিজয় লাভ করবে– এ আশ্বাসবাণীও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে পথনির্দেশনা ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যা সকল মতাদর্শ ও ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে।" (আল-কোরআন)

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব-মানবতার জন্য যে জীবন সংবিধান নিয়ে এসেছেন, তা নিপীড়িতের ঢাল নয়, বরং উৎপীড়কের মৃত্যুবাণ। পদদলিত মানবতার আত্মরক্ষার ধর্ম এটা নয়, দখলকারী শক্তিমানের জন্য বরং এটা এক মূর্তিমান বিভীষিকা। দুঃখী ও বেদনাপীড়িতদের জন্য কোন বেদনা নেই ইসলামে, বরং যারা মানুষকে বেদনা দেয়, দুঃখ দেয়, তাদের জন্য ইসলাম দুঃখ-বেদনার এক মহা আকর।

মহানবীর মহা আদর্শ– ইসলাম– অক্ষমের কোন নতুন আকাঙ্ক্ষা বা ক্রন্দন নয় কিংবা নয় এটা কোন ক্ষমতাহীন অসহায়ের আত্মবিলাপ, অথবা এটা কোন হতাশ ও অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্রুপাতও নয়। তাঁর আদর্শ ইসলাম অনাবিল সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি, বিজয় ও আনন্দের বার্তাবাহী, ক্ষমতা, আধিপত্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তাদানকারী, সজীবতা ও স্বাধীনতার দিশারী এবং চিরবিজয় ও চির-উন্নত শির মানব দলের এক চিরন্তন রক্ষাকবচ।

কিন্তু আজ যখন তোমরা মহানবীর জন্মোৎসব পালন করছ তখন তোমাদের অবস্থা কী? তোমাদের হাতে তুলে দেয়া মহানবীর সেই বিজয়ের নিশান কোথায়? বিশ্ব-মানবকে অনুপ্রেরণাদায়িনী তোমাদের সেই বিজয়ের নিশান কোথায়? বিশ্ব-মানবকে অনুপ্রেরণাদায়িনী তোমাদের সেই আদর্শ ও চরিত্রের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ? কেন আল্লাহর মূর্তিমান অসন্তোষের মত তোমাদের উপর নেমে এসেছে অবমাননা ও লাঞ্ছনার দুর্বহ ভার?

অথচ আজকের এই রবিউল আউয়ালে যাঁর আবির্ভাব সেই মহানবী কি প্রতিশ্রুতি দেননি যে, চির-সম্মানই তোমার ভাগ্যলেখা? কেন এই ব্যতিক্রম? কেন সম্মান তোমাদের পরিত্যাগ করেছে, কেন অবমাননা ও লাঞ্ছনা এসে তোমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে? সাফল্যের দ্বার তোমাদের জন্য কেন অর্গলবদ্ধ? কেনই বা বিজয় ও সৌভাগ্য পলায়ন

www.pathagar.com

করেছে তোমাদের ভাগ্যলেখা থেকে? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি তাহলে মিথ্যা, তিনি তাঁর ওয়াদা পালন করেন না? তোমরা মানুষের দেয়া ওয়াদার উপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস স্থাপন করতে পার, মানুষের হুকুমের অনুগত দাস সাজতে পার, অথচ আল্লাহর এ মহাবাণীর প্রতি কি তোমাদের আস্থা নেই : 'আল্লাহ্ কখনও তার ওয়াদা বরখেলাফ করেন না'।

না, আল্লাহ কখনই তাঁর ওয়াদা বরখেলাপ করেন না কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পথ তিনি রচনা করে চলেন না।

আসলে তুমি, তোমার পদস্খলন ও বিশ্বাসহীনতা, তোমার সত্য-বিস্মৃতি ও নৈতিক অপমৃত্যুই মহান আল্লাহর সমীপে কৃত তোমার প্রতিশ্রুতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর তোমার মনুষ্য পূজা ও মানুষের আদেশ-নিষেধের প্রতি তোমার শর্তহীন আনুগত্য তোমার প্রতি আল্লাহর ওয়াদা প্রতিপালনের পথে দুর্লংঘ্য বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ্ এখনও তোমাদেরই আছেন অন্য কারোর নয়, কিন্তু শর্ত এই যে, তোমরাও শুধু আল্লাহ্রই থাকবে, অন্য কারোর নও। ■

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর বিপ্লবী জীবন

আব্বাস আলী খান

□

বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন একটা সার্বিক সমাজ বিপ্লবের জন্যে। অর্থাৎ তৎকালীন প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থাকে তার মূল ও শাখা-প্রশাখাসহ উৎপাটিত করে তার স্থলে এক নতুন চির সুন্দর ও চির মঙ্গলকর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল তাঁর দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দশ্যে কুরআন পাকের তিনটি সূরায় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা সহজ কাজ নয়। কারণ এর পেছনে থাকে একটা জীবন-দর্শন, এক ধরনের চিন্তাধারা ও মনমানসিকতা, এক ধরনের আকীদাহ বিশ্বাস, পূজা অর্চনা উপাসনার নিয়ম-নীতি। হালাল-হারাম, ভালোমন্দ ও নৈতিকতার মানদণ্ড। তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সভ্যতা-সংস্কৃতি শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পকলা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেন। এভাবে এ সমাজ ব্যবস্থা সমাজের সকল দিক ও বিভাগে তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রাখে এবং সমাজের অভ্যন্তরে তার মূলও সুদৃঢ় হয়। এ ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বিভিন্ন স্তরের লোকের স্বার্থ। সে স্বার্থ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় অথবা বৈষয়িক হতে পারে। এখন এতোগুলো মানুষের স্বার্থ যে ব্যবস্থার সাথে জড়িত, এ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক যারা, এ ব্যবস্থার দ্বারা যারা সকল প্রকার বৈষয়িক ফায়দা লুটছে, এমনকি এ ব্যবস্থার অধীনে ধর্মের নামেও যারা অবাধে মানুষের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেও প্রবঞ্চিত- প্রতারিত মানুষের শ্রদ্ধালাভ করছে, তারা কি কখনো এ সমাজ-ব্যবস্থার মূলোৎপাটন বরদাশত করবে? কেউ এ সমাজ ব্যবস্থার স্থলে ভিন্ন কোন সমাজ ব্যবস্থার কথা মুখে আনা মাত্রই গোটা সমাজের রক্তচক্ষু তার দিকে নিবদ্ধ হবে। এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু এ দুঃসাধ্য কাজই করতে হয়েছে এবং করেছেনও নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম।

তিনি কিভাবে করলেন, কি এ কাজের হাতিয়ার ছিল এবং কি তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল তাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

নবী মুস্তাফার পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের অমোঘ ও অব্যর্থ হাতিয়ার ছিল তিনটি (১) তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তি চরিত্রের মাধুর্য ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব (২) কুরআনের অলৌকিকত্ব এবং (৩) তার মিষ্টিমধুর ও মন জয়কারী বাকপদ্ধতি। এ তিনটি হাতিয়ার ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্যে যে কোন কালে, যে কোন যুগে এবং যে কোন পরিবেশে ফলপ্রসূ হতে পারে।

ব্যক্তি চরিত্রের অলৌকিক প্রভাব

ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এমনভাবে যে একদিকে ছিল একটা সমগ্র জাতি এবং অপরদিকে এক ব্যক্তি মাত্র অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)। তাঁর দাওয়াত গোটা জাতির মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট আলোড়ন, এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। কারণ এ দাওয়াত ছিল সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে গড়ার ডাক। এ বিপ্লবের প্রাণশক্তি ছিল একটি পবিত্র কালেমা, একটি স্বর্গীয় বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ পাঁচটি শব্দ মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তিই তা শুনলো, যার কানেই এর আওয়াজ পৌঁছলো– তার মন তাৎক্ষণিকভাবে বলে উঠলো- "এর মধ্যে বিপ্লবের এতো আগুন? এ যে আমাদের গোটা সমাজের মূল্যবোধ বদলে দেবে, ভালো ও মন্দের, নেতৃত্বের, লাভ-লোকসানের এবং জয়-পরাজয়ের মানদণ্ড যে একেবারে পাল্টে দেবে!"

ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় সামান্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা আংশিক কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা আংশিক কিছু সংস্কার সংশোধনই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল একটা সার্বিক ও পূর্ণাংগ বিপ্লব। তৎকালীন সমাজপতিগণও তাদের অন্ধ অনুসারীদের এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতি এ দাওয়াত ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, সমাজের কর্তৃত্ব নেতৃত্বে থেকে উৎখাত হওয়ার দাওয়াত। তাই তারা দাওয়াত দানকারীর প্রতি হয়ে পড়লো মারমুখো, হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সত্য ও মংগলের আহ্বানকারীর প্রতি, মজলুম মানবতার শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুসংবাদদাতার প্রতি, সুপরিচিত ও প্রমাণিত মানবদরদীর প্রতি। গোটা জাতির পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা ও আক্রমণের মুখে তিনটি অমোঘ অস্ত্রের মধ্যে যে একটি ছিল নবী পাকের অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্য– তার অলৌকিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

যে লোকটির বিরুদ্ধে গোষ্ঠী জাতি ঐক্যবদ্ধ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, ভদ্রতা, শালীনতা, মানবসেবা ও পর দুঃখকাতরতা, দূর-দূরান্তের প্রতিটি মানুষের কাছে ছিল অতি সুপরিচিত, তাঁর লজ্জাশীলতা কুমারী যুবতীকেও হার মানাতো, তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী এমন ছিল যে তাঁর চরম দুশমনও তার ধন সম্পদ সুরক্ষিত করার জন্যে তাঁর কাছেই আমানত রাখতো। বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁর কাছেই সুপর্দ করতো তাদের মামলা-মোকদ্দমা সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার জন্যে। এতিম ও বিধবাদের জন্যে

www.pathagar.com

তাঁর পক্ষ থেকে ভাতা নির্ধারিত ছিল। আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখের চির সাথী ছিলেন তিনি। কেউ কোন দিন মুখ খুলে বলতে পারতো না যে তিনি কখনো কোন অসংগত কথা বলেছেন, কাউকে গালি দিয়েছেন, কারো অন্যায় করেছেন, কারো সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করেছেন এবং কারো সাথে কোন অসদ্ব্যবহার করেছেন।

ইসলামী দাওয়াতের সূচনালগ্নে তিনি সাফা পাহাড়ে চড়ে মক্কাবাসীদের উচ্চস্বরে ডাকলেন। তাঁর ডাকে তারা জমায়েত হওয়ার পর তিনি বললেন :

"বল, তোমরা আমাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?"

সকলে সমস্বরে বললো "আমরা কোনদিন কোন মিথ্যা অথবা বেহুদা কথা তোমার মুখে শুনিনি। আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি সত্যবাদী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।"

অর্থাৎ ইসলামী দাওয়াত পেশ করার পূর্বেই দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তাঁর গোটা জীবন দেশবাসীর কাছে ছিল একটি স্বচ্ছ আয়নার মতো। আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততার উপাধিতে ভূষিত।

তাঁর এ অতুলনীয় চরিত্র মাধুরী তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল অদম্য সাহস, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস। দুশমন তাঁর কাছে এসে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়তো, তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতো, তাঁর কাছে মাথা নত করতো।

একবারের একটি ঘটনা। আরাশী নামক এক ব্যক্তি তার কিছু উট নিয়ে এলো মক্কায় বিক্রি করার জন্যে। আবু জেহেল দরদস্তুর করে উটগুলো খরিদ করলো। কিন্তু দেবো-দিচ্ছি করেও তার দাম কিছুতেই চুকিয়ে দেয় না। এভাবে কয়েক দিন অতীত হলো। হতভাগা আরাশী কুরাইশ সর্দারদের কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগলো- "আমি একজন বিদেশী মুসাফির। আবুল হাকাম (আবু জেহেল) আমার হক মেরে দিয়েছে। আমার হক আদায় করিয়ে দাও।"

কার গর্দানে কটি মাথা যে দুর্দান্ত ও শক্তিধর আবু জেহেলের কাছ থেকে উটের দাম আদায় করে দেবে? অতএব তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বল্লো- ঐ লোকটির কাছে- মুহাম্মাদের কাছে যাও। সে তোমার হক আদায় করে দেবে।"

সে বেচারা তাই করলো। নবী মুহাম্মাদের কাছে তার দুঃখের কাহিনী বলতেই তিনি বললেন- "এসো আমার সাথে।"

নবী (সা) উট বিক্রেতাকে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ি গিয়ে তার দরজার কড়া নাড়লেন।

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো– কে?

নবী জবাব দিলেন– আমি মুহাম্মাদ, বেরিয়ে এসো!

ভেতর থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলো আবু জেহেল। কিন্তু তার চেহারা ফ্যাকাশে, বিবর্ণ ও ভীতিবিহ্বল।

নবী বললেন, এ লোকটির দাম চুকিয়ে দাও।

www.pathagar.com

আবু জেহেল মুখ নিচু করে নীরবে ভেতরে গেল এবং টাকা গুনে আরাশীর হাতে দিয়ে দিল।

আরাশী খুশীতে বাগ বাগ হয়ে কুরাইশ সর্দারদের কাছে ফিরে এসে ঘটনা বিবৃত করলো। একটু পরে আবু জেহেল সেখানে এসে পড়লো।

সকলে আবু জেহেলকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো– এ তুমি কি করলে?

আবু জেহেল বললো– ওরে কম্‌বখতেরা শোন, সে যখন আমার দরজায় কড়া নাড়ালো এবং তার গলার আওয়াজ শুনলাম, তখন ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো এবং আমি একেবারে কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো হয়ে গেলাম।

এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ দেয়া যায়। মোটকথা নবী পাকের চরিত্রের মহত্ত্ব, তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা শত্রুর মনেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পার্থিব স্বার্থের জন্যে শত্রুতা করলেও তাদের মন সাক্ষ্য দিয়েছে যে এ লোকটি সত্যবাদী, একেবারে খাঁটি।

নবী পাকের চরিত্রই ছিল এক বিরাট 'মুজেযা' যা ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াতের জন্যে এক শাণিত হাতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে। এ হাতিয়ার শত্রুর হৃদয় জয় করেছে। শত্রু তরবারি কোষবদ্ধ করে আত্মসমর্পণ করেছে। এমন অনুপম চরিত্রের হাতিয়ার থাকায় দুশমনদের মনে ভয়ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সঞ্চার হতো এবং প্রকাশ্যে শত্রুতা করা তাদের জন্যে বড়ো কঠিন হয়ে পড়তো। নবী পাকের নিষ্কলুষ ও পূতঃচরিত্র লোকের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতো এবং সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকের হৃদয়ে ঈমান ও ইসলামের সবুজ-শ্যামল শস্য উৎপন্ন হতো।

কুরআন পাকের অলৌকিকত্ব

ইসলামী দাওয়াতের জন্যে নবী পাকের পুণ্যকৃত চরিত্রের সাথে দ্বিতীয় যে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল তা হলো হৃদয় জয়কারী কুরআনুল করীম।

কুরআন মজিদ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রয়োজন অনুসারে পরিপূর্ণ পথ নির্দেশনাসহ ক্রমান্বয়ে নাযিল হতে থাকে। কুরআন এমন এক উচ্চাংগের ভাষা ও অপরূপ সাহিত্যের অলংকারে ভূষিত হয়ে নাযিল হয় যে, আরবের তৎকালীন বড়ো বড়ো ভাষার পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, অনলবর্ষী বাগ্মী, স্তম্ভিত বিস্মিত ও মুক হয়ে পড়েন। কুরআনের ভাষার মধ্যে ছিল যেমন অপূর্ব লালিত্য, কবিতার ঝংকার ও ছন্দের মাধুর্য, তেমনি ছিল এক বিরাট প্রাণশক্তি যা মানুষের অণু-পরমাণুতে সৃষ্টি করতো বিরাট কর্ম-চাঞ্চল্য, অজ্ঞতার ঘন অন্ধকার সরিয়ে জ্বালিয়ে দিত অভ্রান্ত জ্ঞানের মশাল, চোখের সামনে তুলে ধরতো এক আলোকোজ্জ্বল জীবন পথ ও পূর্ণাংগ জীবন বিধান। কুরআনের মতো এমন প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা অতি নিপুণতার সাথে গ্রথিত সুন্দর কথার মালা যে মানুষের তৈরী ও রচিত হতে পারে না তা তৎকালীন ভাষার দিকপালগণ

www.pathagar.com

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কুরআনও স্বয়ং চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে গোটা মানব ও জ্বীন জাতির কাছে অনুরূপ একটি গ্রন্থ অথবা একটি অধ্যায় রচনা করার। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

- হে রাসূল! সকলকে বলে দাও যদি সকল মানুষ ও জ্বিন একত্রে জমায়েত হয় এবং এ কুরআনের মতো কোন কিছু রচনা করতে চায়, তাহলে তা কখনোই করতে পারবে না যদিও তারা এ ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হয়। (বনী ইসরাইল : ৮৮)

কুরআন আর এক জায়গায় এমনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছে– যে কিতাবটি আমি আমার বান্দাহর উপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা– এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তাহলে তার মতো একটি সূরা বা অধ্যায় তৈরী করে আন এবং (এজন্যে) নিজের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আন– এক আল্লাহ ছাড়া আর যার যার খুশী সাহায্য নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটা একবার করে দেখাও। (বাকারা :২৩)

এ চ্যালেঞ্জ এখনো বলবৎ আছে। কিন্ত তার জবাব দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। কুরআনের মধ্যে আছে এক প্রচণ্ড যাদুকরী শক্তি যা মানুষের মনকে বিমুগ্ধ ও প্রভাবিত করে, তার মনের দুনিয়াকে একেবারে বদলে দেয়। মুখের জোরে কুরআনকে যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাইতো, তারাও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো যে এ কুরআন পড়লে বা শুনলে তার পরিবর্তন অনিবার্য। সে জন্যে কুরআন পড়া ত দূরের কথা, কুরআনের কথাগুলো যেন কারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে মক্কার মুশরিকরা জোর প্রচারণা চালাতো–। তারা বলতো– তোমরা এ কুরআন কেউ কখনো শুননা। যখন কেউ তা শুনতে চায়, হৈচৈ হট্টগোল শুরু করে দাও।" (হা মীম সাজদা : ২৬)

এ ছিল কুরআনেরই এক অলৌকিক শক্তি যা হযরত ওমরের (রা) এককালীন পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল। শুধু ওমর কেন? অতীত ও বর্তমানের কত অগণিত মানব-সন্তান কুরআন পাঠের মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। আধুনিক কালের মুহাম্মাদ আসাদ, মরিয়ম জামিলা, ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইউসুফ ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ কুরআন থেকেই জীবনের সত্য সঠিক পথ বেছে নিয়েছেন।

এমন একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কুরআন নবী পাকের ইসলামী আন্দোলনের বিরাট হাতিয়ার ছিল। এ হাতিয়ার দিয়ে নবী পাক গোটা আরবের দুর্ধর্ষ ও চির স্বাধীনচেতা জাতিকে জয় করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নিবেদিত প্রাণ সৈনিকে পরিণত করেছেন। আবিসিনিয়ায় খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর আশ্রয়প্রার্থী মক্কার মুহাজির মুসলমানদের মুখে কুরআন পাঠ শুনে বিগলিত ও বিমোহিত হয়েছেন, কুরআন পাঠ শুনে বিগলিত ও বিমোহিত হয়েছে কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে অশ্রুতে বুক ভাসিয়েছেন।

www.pathagar.com

নবী পাকের অলৌকিক বাক্ পদ্ধতি

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের তৃতীয় হাতিয়ার ছিল নবী পাকের (সা) অলৌকিক বাক্ পদ্ধতি। তাঁর মুখের কথা ছিল অত্যন্ত মিষ্টিমধুর এবং অল্প কথায় মানুষের মন জয় করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। ইসলামের বাণীবাহক ও মুবাল্লিগ হিসাবে তাঁকে দিন রাত সর্বস্তরের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হতো।

মুসলমান, কাফের, মুশরিক, ইহুদী খৃষ্টান, দোস্ত-দুশমন, মরুচারী বেদুইন, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, প্রভু-ক্রীতদাস, গোত্রীয় সর্দার, কবি-সাহিত্যিক সকলের সাথে তাঁকে কথা বলতে হতো। তিনি মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনতেন। পর পর জবাবে কথা বলতেন সংক্ষেপে। প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও দরদ দিয়ে বলতেন এবং তা শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতো। তাঁর প্রতিটি কথা সংক্ষিপ্ত অথচ এতো অর্থপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান ছিল যে শ্রোতা তার একটি শব্দ হৃদয়ে গেঁথে রাখতো।

উপরে বর্ণিত এ ছিল তিনটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যার বদৌলতে অল্পকালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের অবিরাম বারিধারায় মানুষের হৃদয়ের মৃত ও শুষ্ক যমীন ইসলামের সবুজ শ্যামল ফসলে ভারপুর হয়ে ওঠে।

বিপ্লবের কর্মসূচী

নবী পাক (সা) ইসলামী বিপ্লবের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ এক. ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক বিপ্লব আনয়ন করা এবং তাকে এক নতুন মানুষের রূপ দান করা।

দুই. এভাবে একটি খোদাভীরু ও চরিত্রবান দল তৈরী করা যার প্রতিটি ব্যক্তি হবে সাহসী ও নির্ভীক, শ্রম ও সাধনা এবং ত্যাগ ও কুরবানির মূর্ত প্রতীক। আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিতে তারা থাকবে সদা প্রস্তুত। বাতিলের যে কোন শক্তিশালী মোর্চার মুকাবিলায় তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলে জান দেবে, পিছু হটবে না যতোদিন না বাতিল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবীদার তাগুতের তখতে তাউস যতোদিন না খান খান হয়ে ধূলিসাৎ হয়েছে এবং আল্লাহর যমীনে মানুষের সমাজে পুরোপুরি আল্লাহর দ্বীন, তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব ও আইন শাসন কায়েম না হয়েছে, ততোদিন তাদের বিরামহীন সংগ্রাম চলবে।

এ ছিল নবী পাকের ইসলামী বিপ্লবের তিন দফা কর্মসূচী। আমরা দেখতে পাই, মক্কার তেরো বছরে তিনি একটি একটি করে লোক তৈরী করেছেন, তাদেরকে একটি দলে সংগঠিত করেছেন, তাদের চিন্তাধারা, স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ, রুচি প্রকৃতি, মন মানসিকতা পরিশুদ্ধ করেছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে তাঁরা ঈমানের সত্যতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরাই ছিলেন আল্লাহর পথের খাঁটি

www.pathagar.com

সৈনিক। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রাম করে তাঁরা ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করেছেন। ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা নির্মূল হয়েছে, সুবিচারপূর্ণ আল্লাহর আইনের শাসন এবং সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উপরোক্ত তিনটি হাতিয়ার এবং বিপ্লবের তিন দফা কর্মসূচী এখনো সেই সুফল দান করতে পারে যা নবী জীবনে আমরা দেখতে পাই। বিশ্ব মানবতার আদর্শ নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) বিপ্লবী জীবন থেকেই আমরা ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করতে পারি। নবীর প্রতি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো প্রেমপূর্ণ দরূদ ও সালাম সার্থক হবে যদি তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচী আমরা হুবহু অনুকরণ করি। নবীপ্রেমের এটাই একমাত্র পরিচায়ক এবং আখেরাতের পরিত্রাণ একমাত্র নির্ভর করে তাঁর পদাংক অনুসরণের উপর। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কাজের তৌফিক দান করুন– আমীন! ■

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সমসাময়িক শাসকবৃন্দ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

□

১। লোম্বার্ডি রাজ্য

এক সময় ইতালী, জার্মেনী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, গ্রীস, মেসিডোনিয়া, স্পেন, তুর্কী, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর , লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিলো বিশাল রোমান সাম্রাজ্য।

অখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক ছিলেন সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস। তিনি খৃষ্টীয় ৩৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করে। তাঁর পর বিশাল রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা ঃ ওয়েস্টার্ন রোমান এম্পায়ার (পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য) ও ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার (পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য)। ওয়েস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের রাজধানী থাকে রোম নগরী। ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল যার পূর্ব নাম ছিলো বাইজেনটিয়াম।

খৃষ্টীয় ৪৭৬ সনে ওডোয়েসার (Odoacer) নামক একজন জার্মেন গোত্রপতি সর্বশেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাস্তলাস (Romulus Augustulus) কে পরাজিত করে রোম নগরী দখল করেন। এইভাবে ওয়েস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের বিলুপ্তি ঘটে।

খৃষ্টীয় ৫৬৮ সনে লোম্বার্ড নামে আরেকটি জার্মেন গোত্র গোত্রপতি অ্যালবোইনের (Alboin) নেতৃত্বে ইতালীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হয় লোম্বার্ডি। লোম্বার্ডির রাজা অ্যালবোইনের শাসনকালে খৃষ্টীয় ৫৭১ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

অ্যালবোইনের পর লোম্বার্ডির রাজা হন অথারি (Authari) । তিনি খৃষ্টীয় ৫৮৪ সন থেকে ৫৯০ সন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর পর রাজা হন এগিলোলফ (Agilulf)। তিনি খৃষ্টীয় ৫৯১ সন থেকে ৬১৫ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকালে খৃষ্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

সম্ভবত এগিলোল্‌ফের পুত্র অ্যাডালোয়াল্ড (Adaloald) খৃষ্টীয় ৬১৫ সন থেকে ৬৩৫ সন পর্যন্ত লোম্বার্ডি শাসন করেন। খৃষ্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদ (সা) মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

২। ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার

সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিন খৃষ্টীয় ৫৬৫ সন থেকে ৫৭৮ সন পর্যন্ত ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার শাসন করেন। তাঁর শাসনকালেই খৃষ্টীয় ৫৭১ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় জাস্টিনের পর সম্রাট টাইবেরিয়াস (খৃষ্টীয় ৫৭৮-৫৮২), সম্রাট মরিস (খৃষ্টীয় ৫৮২-৬০২) ও সম্রাট ফোকাস (খৃষ্টীয় ৬০২-৬১০) ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার শাসন করেন। খৃষ্টীয় ৬১০ সনে সম্রাট হন হিরাক্লিয়াস। আর ঐ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। খৃষ্টীয় ৬২২ সনে তিনি মাদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন।

খৃষ্টীয় ৬২৮ সনে মাক্কার মুশরিকদের সংগে মুহাম্মাদ (সা) দশ বছর মিয়াদী একটি 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকেই হুদাইবিয়ার চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে যুদ্ধাবস্থার অবসান হওয়ায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নব গঠিত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ মজবুতি সাধনের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পান। অন্য দিকে বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছানোর জন্য চিঠি লিখেন। তিনি ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের (বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য) সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকটও একটি চিঠি প্রেরণ করেন। দাহইয়া কালবী (রা) এই চিঠি বহন করে নিয়ে যান।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস তখন তার সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ সিরিয়াতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর নিকট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি পৌঁছানোর সময় মাক্কার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি আবু সুফইয়ান একটি বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হিরাক্লিয়াস তাঁকে দরবারে ডেকে নেন ও অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফ্ইয়ান জানান যে, মুহাম্মাদ উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা ছিলেন না, সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে, যুদ্ধে তিনি কখনো হারেন কখনো জিতেন, তিনি কখনো ওয়াদা ভংগ করেন না, সাম্প্রতিককালে কেউ আর এমন বক্তব্য নিয়ে ময়দানে আসেনি এবং তিনি সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার নির্দেশ দেন।

এইসব শুনে হিরাক্লিয়াস বলেন, 'তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতে পারতাম যে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তাহলে আমি সাক্ষাত করতাম। আর আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলে তাঁর পা দুইটি পানি ঢেলে ধুয়ে দিতাম। তাঁর রাষ্ট্র আমার পায়ের নিচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।"

অতঃপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি পড়া হলো এবং দরবারে হৈ চৈ পড়ে গেলো। সম্রাট হিরাক্লিয়াস একটি খাস কামরায় বিশিষ্ট রোমানদের একত্রিত করে বললেন,

www.pathagar.com

"রোমানগণ, তোমরা কি স্থায়ী সাফল্য ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্টের স্থায়িত্ব কামনা কর?"

রোমানগণ বুঝতে পেলো যে সম্রাট তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন। আসন ছেড়ে তারা কামরা থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দারওয়াজার দিকে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় হিরাক্লিয়াস ঘাবড়ে যান। ফলে ঈমানের পথে তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। বরং রোমানদেরকে শান্ত করার জন্য তিনি বললেন, "ওহে লোকেরা, আমি তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম তা পেয়েছি।"

খৃষ্টীয় ৬৩১ সনে রোমান সৈন্যগণ মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে তাবুক নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে হিরাক্লিয়াস সীমান্ত থেকে রোমান সৈন্যদেরকে সরিয়ে নেন।

খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মারা যান খৃষ্টীয় ৬৪১ সনে।

৩। ঈজিপটাস জোভিয়া

মিসর তখন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। উত্তর মিসরকে বলা হতো ঈজিপটাস জোভিয়া (Aegyptus Jovia)। এই রাজ্যের প্রধান নগরী ছিলো আলেকজান্দ্রিয়া। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ সনে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর পত্তন করেন। রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগে রোম নগরীর পরেই আলেকজান্দ্রিয়া ছিলো গুরুত্বপূর্ণ নগরী।

এই নগরীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাইজেনটাইন সম্রাট ও ইরান সম্রাটের মধ্যে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খৃষ্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। খৃষ্টীয় ৬২২ সনে তিনি ইয়াসরিবে (মাদীনায়) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। খৃষ্টীয় ৬২৮ সনে হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর মুহাম্মাদ (সা) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেন। এই সময় ঈজিপটাস জোভিয়ার শাসক ছিলেন আর্চ বিশপ মুকাওকিস সাইরাস।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দূত হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রা) তাঁর নিকট চিঠি পৌঁছান।

মুকাওকিস মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। চিঠির উত্তরে তিনি লিখেন, "আমি আপনার চিঠি পড়েছি ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করেছি। আমি জানতাম একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে ও ধারণা করতাম যে তিনি সিরিয়ায় আবির্ভূত হবেন। আপনার দূতের আমি যথোপযুক্ত সম্মান করেছি। কিবতীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা দুইটি বালিকা, কিছু কাপড় ও একটি খচ্চর পাঠাচ্ছি।"

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে উক্ত বালিকা দুইটির নাম ছিলো মারিয়া (মেরী) ও শিরিন। খচ্চরটির নাম ছিলো দুলদুল।

৪। হাবশাহ (আকসুম সাম্রাজ্য)

লোহিত সাগরের ওপারে সুদানের গা ঘেঁষে আজকের ইথিওপিয়া ও নিকটবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিলো আকসুম সাম্রাজ্য।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে আকসুম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন এল্লা আসবেহা (Ella Asbeha)। তাঁর সময়ে নাজরানে (তখন ইয়ামানের অংশ) হাবশীদের একটি সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

ইয়ামানের বানু হিমইয়ার বংশীয় রাজা আবু কারব হাসসান ইবনু তুব্বান আসআদ ইয়াসরিবে এসে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে তিনি লোকদেরকে ইয়াহুদী হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের পর রাজা হন তৃতীয় পুত্র যুরআ যু-নাওয়াস। তিনি জোর করে লোকদেরকে ইয়াহুদী বানাতে থাকেন। এই সময় নাজরানে বহু সংখ্যক খৃষ্টান বসবাস করতো। তাদের নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু সামের। খৃষ্টীয় ৫২৩ সনে যু-নাওয়াস সসৈন্যে নাজরান এসে খৃষ্টানদেরকে ইয়াহুদী হতে বলেন। তারা অস্বীকার করে। ফলে ইয়াহুদী সৈন্যগণ বড়ো বড়ো গর্ত তৈরি করে সেগুলোতে আগুন জ্বেলে ২০ হাজার খৃষ্টানকে ফেলে হত্যা করে।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট আকসুম সাম্রাজ্যের সম্রাট এল্লা আসবেহাকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে বলেন।

খৃষ্টীয় ৫২৫ সনে সেনাপতি আরইয়াতের নেতৃত্বে হাবশী খৃষ্টানেরা ইয়ামান আক্রমণ করে রাজা সু-নাওয়াসসহ বহু ইয়াহুদীকে হত্যা করে। আরইয়াত ইয়ামানের মসনদে বসেন। পরে অন্যতম সেনাপতি আবরাহা তাঁকে হত্যা করে ইয়ামানের রাজা হয়। এই আবরাহা খৃষ্টীয় ৫৭১ সনে মাক্কার কা'বা গৃহ ধ্বংসের জন্য এগিয়ে এসে মুহাস্সির নামক স্থানে বিধ্বস্ত হয়।

খৃষ্টীয় ৫৭১ সনের মুহাররাম মাসে আবরাহা বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। আর ঐ বছরই রাবিউল উলা মাসে মুহাম্মাদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

খৃষ্টীয় ৫৭২ মতান্তরে ৫৭৫ সনে ইরান সম্রাট প্রথম খসরুর শাসনকালে ইয়ামানে ইরানীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

খৃষ্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। সেই সময় আকসুম সাম্রাজ্যের নাজাসী বা সম্রাট ছিলেন আসহামাহ। তিনিও ছিলেন একজন খৃষ্টান। তবে ন্যায় পরায়ণ শাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো।

খৃষ্টীয় ৬১৫ সনে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে একদল মুসলিম হাবশাহ হিজরাত করেন। তাঁরা সেখানে নিরাপত্তা লাভ করেন।

www.pathagar.com

মাক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁদেরকে ফেরত আনার জন্য আবদুল্লাহ ইবনু আবী রাবীয়াহ ও আমর ইবনুল আসকে দূত হিসেবে আসহামাহ-র নিকট পাঠায়। তাদের অভিযোগ শুনে সম্রাট মুসলিমদেরকে রাজ-দরবারে ডাকেন। মুসলিমদের থেকে জাফর ইবনু আবী তালিব (রা) বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য শুনে সম্রাট মাক্কার দূতদেরকে ফেরত যেতে বলেন ও মুসলিমদেরকে তাঁর সাম্রাজ্য নিরাপদে বসবাস করতে দেন।

খৃষ্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। খৃষ্টীয় ৬২৮ সনে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। অতপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট চিঠি পাঠাতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠিসহ তিনি আমর ইবনু উমাইয়াকে (রা) নাজাসী আসহামাহর নিকট পাঠান। আসহামাহ এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাফর ইবনু আবী তালিবের (রা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ষাটজন সংগীসহ তাঁর পুত্রকে একটি জাহাজে করে মাদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। দুঃখের বিষয় জাহাজ ডুবিতে সংগীগণসহ রাজকুমার প্রাণ হারান।

খৃষ্টীয় ৬৩১ সনে নাজাসী আসহামাহ ইন্তিকাল করেন।

খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।

৫। ইরান সাম্রাজ্য

আরব উপদ্বীপের পূর্ব সীমান্ত থেকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ও উত্তরে আর্মেনিয়া পর্যন্ত ছিলো ইরান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

খৃষ্টীয় ৫৩১ সন থেকে ৫৭৯ সন পর্যন্ত কিসরা (ইরান সম্রাটের উপাধি) প্রথম খসরু ইরান সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে খৃষ্টীয় ৫৭১ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ (সা) জন্ম গ্রহণ করেন।

খৃষ্টীয় ৫৭৯ সন থেকে ৫৯০ সন পর্যন্ত চতুর্থ হরমিজদ ইরানের কিসরা ছিলেন।

খৃষ্টীয় ৫৯০ সনে দ্বিতীয় খসরু (খসরু পারভেজ) অল্প সময়ের জন্য কিসরা হন। তাঁর পর খৃষ্টীয় ৫৯০ সন ও ৫৯১ সনে কিসরা ছিলেন চতুর্থ বাহরাম।

দ্বিতীয় খসরু (খসরু পারভেজ) আবার মসনদ লাভ করেন খৃষ্টীয় ৫৯১ সনে। তখন থেকে ৬২৮ সন পর্যন্ত তিনি রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে খৃষ্টীয় ৬১০ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

খৃষ্টীয় ৬২২ সনে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন।

খৃষ্টীয় ৬২৮ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও মাক্কার মুশরিকদের মধ্যে দশ বছর মিয়াদী একটি 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। অতপর মুহাম্মাদ (সা) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেন। ইরানের কিসরা দ্বিতীয় খসরুর (খসরু পারভেজ) উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি ইরান সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

বাহরাইন অঞ্চলের গভর্নর মানযার ইবনু সাওয়া-র নিকট পৌছান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দূত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাইফাহ আসসাহমী (রা)। বাহরাইনের গভর্নর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি দ্বিতীয় খসরুর (খসরু পারভেজ) নিকট পৌছান। চিঠি পড়ে কিসরা ভীষণ ক্ষেপে যান। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেন।

শুধু তাই নয় দাম্ভিক কিসরা দ্বিতীয় খসরু (খসরু পারভেজ) তাঁর অন্যতম গভর্নর ইয়ামানের বাযানকে নির্দেশ দেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) গ্রেফতার করে তাঁর নিকট পাঠাতে। বাযান দুইজন দূত পাঠান মাদীনায়। তারা মহানবীকে (সা) বলে, "ইরান সম্রাট আপনাকে তলব করেছেন। আপনি নির্দেশ অমান্য করলে আপনাকে ও আপনার দেশটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।"

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) শান্তভাবে জবাব দেন, "তোমরা ফিরে যাও। তাকে এই সংবাদ জানাবে যে কিসরার মসনদ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটবে।"

কিসরার নিকট এই বক্তব্য পৌছিয়ে দিয়ে দূতগণ যখন ইয়ামান পৌছে তখন তারা খবর পায় যে খসরু আপন পুত্র শিরওয়াহর হাতে নিহত হয়েছেন।

খৃষ্টীয় ৬২৮ সনে দ্বিতীয় খসরু নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিদ্রোহীদের উপদ্রবে ইরান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

খৃষ্টীয় ৬২৯ সনে রাজকুমারী বুরানদুখতকে মসনদে বসানো হয়। বুরানদুখত ইরানের সম্রাজ্ঞী হওয়ার খবর শুনেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, "সেই জাতি কখনো কল্যাণ পেতে পারে না যেই জাতি রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার কোন মহিলার ওপর ন্যস্ত করে।"

খৃষ্টীয় ৬৩১ সন পর্যন্ত বুরানদুখত মসনদে আসীন ছিলেন। কিন্তু ইরান সাম্রাজের দুর্গতি ঠেকানোর জন্য তিনি কিছুই করতে পারেননি।

খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।

৬। চীন সাম্রাজ্য

খৃষ্টীয় ৫২০ সন থেকে ৫৭৭ সন পর্যন্ত চীনে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিলো। ঐ সময় খৃষ্টীয় ৫৭১ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

খৃষ্টীয় ৫৭৭ সনে উত্তর চীনের রাজ্যগুলো পরস্পর যুক্ত হয়।

খৃষ্টীয় ৫৮১ সনে ইয়াং চিয়েন চীনে সুই রাজ বংশের শাসন কায়েম করেন। তিনি উত্তর চীনের মতো দক্ষিণ চীনেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি খৃষ্টীয় ৬০৪ সন পর্যন্ত চীন শাসন করেন।

সুই বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ইয়াংতি খৃষ্টীয় ৬০৫ সন থেকে ৬১৮ সন পর্যন্ত দেশ শাসন

www.pathagar.com

করেন। ইয়াংতি যখন চীনের সম্রাট তখন খৃষ্টীয় ৬১০ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

খৃষ্টীয় ৬১৮ সনে লি-ইউয়ান চীনে তাঙ বংশের শাসন কায়েম করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৬২৬ সন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে আরব উপদ্বীপে মাদীনাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খৃষ্টীয় ৬২২ সনে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন।

উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় ৬২৬ সনে হাবশাহ (ইথিওপিয়া) থেকে আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা), কায়েস ইবনু হুযাইফা (রা), উরওয়াহ ইবনু আছাছা (রা), আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা) কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনে পৌঁছেন।

খৃষ্টীয় ৬২৬ সনে রাজকুমার লি-শিহ-মিন তাঁর অন্যান্য ভাইদেরকে হত্যা করেন ও তাঁর পিতাকে তাঁর পক্ষে মসনদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি তাই সুঙ উপাধি ধারণ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৬২৭ সন থেকে ৬৪৯ সন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে আরবের মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ (সা) খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭। চেরর রাজ্য (মালাবার/কেরালা)

খৃষ্টীয় ৬১৭ সনে এক সন্ধ্যায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মিনাতে অবস্থান করছিলেন। আকাশে সদ্য উদিত চাঁদ হঠাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একত্রিত হয়ে যায়।

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত চেরর অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বর্ণনা থেকে জানা যায়, চেরর রাজ চেরুমল পেরুমল ঐ সময় কোন উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি নিজের চোখে দেখেন। অতপর তিনি নৌ-পথে আরবের মাক্কায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত রাজা চেরুমল পেরুমল ও রাজা চেরামন মালিক একই ব্যক্তি। মাক্কা থেকে ফেরার পথে তিনি শফর নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। অল্পকালের মধ্যেই চেরর রাজ্যে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। সেখানে পরপর দশটি মাসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম মাসজিদ নির্মিত হয়েছিলো রাজধানী কর্ণক্লোর বা ক্রাঙ্গানূরে।

৮। থানেশ্বর-কনৌজ রাজ্য

এক সময় উত্তর ভারতে মগধ নামে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিলো। এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিলো গিরিব্রজ বা রাজগ্রহ। পরবর্তীকালে পাটলীপুত্র হয় রাজধানী।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে। এইসব রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মালব রাজ্য, থানেশ্বর রাজ্য,

www.pathagar.com

কনৌজ রাজ্য ও গৌড় রাজ্য।

কনৌজের রাজা গ্রহবর্মন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করেন। উভয় রাজ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। পরবর্তী কালে উভয় রাজ্য একীভূত হয়ে পড়ে।

খৃষ্টীয় ৬০৬ সনে থানেশ্বর-কনৌজ রাজ্যের রাজা হন হর্ষবর্ধন। তিনি বৌদ্ধবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে আরব উপদ্বীপে খৃষ্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

খৃষ্টীয় ৬৩২ মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন। থানেশ্বর-কনৌজ রাজ্যের শাসক হর্ষবর্ধন মৃত্যুবরণ করেন খৃষ্টীয় ৬৪৭ সনে।

৯। গৌড় রাজ্য

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য মিলে গড়ে উঠে গৌড় রাজ্য।

সম্ভবত খৃষ্টীয় ৬০১ সনে গৌড় রাজ্যের রাজা হন শশাংক। রাজা শশাংক উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ প্রজাদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন।

তাঁর শাসন যুগে খৃষ্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৬২২ সনে মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন ও দশ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে খৃষ্টীয় ৬৩২ সনে ইন্তিকাল করেন।

রাজা শশাংক রাজা হর্ষ বর্ধনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। হর্ষ বর্ধন গৌড় রাজ্যের অনেক অংশ দখল করে নিতে সক্ষম হন। রাজা শশাংক খৃষ্টীয় ৬৩৭ সনে মৃত্যু বরণ করেন। ■

www.pathagar.com

ইসলাম ও আমরা

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

□

এক.

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম দয়াময়, পরম দয়ালু তিনি অনুগ্রহ করে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বকে শাসন করার জন্য ও সৃষ্টিধারা প্রবহমান রাখার জন্য তিনি তাঁর নিজের 'ইমেজে' তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছেন। বানিয়েছেন আদম। আদমকে তথা আদম সন্তানকে তিনি এতখানি ভালবেসে সৃষ্টি ও লালন করেছেন যে, এক আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তার সমান আর কেউ নেই। আল্লাহর পরেই তার স্থান। তিনি আদম ও আদম সন্তানের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ফিরিশতাদের দিয়ে তাঁকে সিজদা করিয়েছেন। ফিরিশ্তাদের স্থান তাঁর নীচে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন: লাকাদ খালাকনাল ইনাসানা ফী আহসানি তাকবীম। আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুন্দরতম গঠনে। আর তিনি ভালবেসে তাকে করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা, শ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে একমাত্র তাকেই তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। তিনি ফিরিশতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, বলেছেন : ওয়া ইয কালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নি জায়িলুন ফীল আরদি খালীফা–আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। ফিরিশতারা বলেছিল কালু আতাজ আলু ফীহা মাঁয় ইউফসিদু ফীহা ওয়া ইয়াসফিকুদ্দিমাআ ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়ানুক্কাদ্দিসু লাকা'– আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাইতো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছিলেন : ইন্নি আ'লামু মা লা তা'লামুন– আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আদমকে জান্নাতে রেখে তার সঙ্গে সবকিছুর পরিচয় করিয়ে দেন। তাকে সেথায় যথেচ্ছ বিচরণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু একটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। মাধ্যমে তার দুশমন শয়তান সেই নিষিদ্ধ কাজটি করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে। শয়তান তার প্রতি শত্রুতা করার কারণ ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন আদমকে সৃষ্টি করে জান্নাতের সবাইকে তার প্রতি সিজদা করতে বলেছিলেন, তখন শয়তান ছাড়া আর সবাই সিজদা করেছিল। শয়তান ছিল জিন্ সম্প্রদায়ের এবং সে ছিল

www.pathagar.com

বড় আবেদ। তাই তার মনে অহংকার এসেছিল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : কীসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি নত হলে না, আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম।

সে বলল : আমি শ্রেষ্ঠ তার চাইতে। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দ্বারা। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এক জায়গায় বলেছেন : কালা ইয়া ইবলীসু মা লাকা আল্লা তাকুনা মা'আস সাজিদিন– তিনি বললেন : হে ইবলিস তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হলে না?

সে জবাবে বলেছিল : কালা লাম আকুন লি আসজুদা লি বাশারিন খালাকতাহু মিন সালসালিন মিন হামায়িন মাসনুন– সে বলল: আমি সিজদা করব না সে ব্যক্তিকে, যাকে সৃষ্টি করেছেন আপন ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।

এখান থেকেই দুশমনির শুরু। সাধারণ মাটির সৃষ্টি যে আদমের কারণে চিরকালের জন্য তার গলায় লা'নতের সাইন বোর্ড ঝুলানো হল, সে আদমকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তাই তার জাত-শত্রু আদম ও তার সন্তানকে সে পথচ্যুত করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। আর এ কাজের জন্য সে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে নিল। আল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ, তুমি পথভ্রষ্ট করতে পারবে, তবে যে বান্দা আমার সাক্ষাতে বিশ্বাস করবে এবং প্রকৃত মুমিন ও মুত্তাকী হবে তাকে তুমি কিছুতেই সৎপথ থেকে টলাতে পারবে না।

শয়তান তো মিথ্যা প্রলোভনে প্ররোচিত করে আদম (আ) ও হাওয়া (আ)কে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন : ওয়া কুলনাহ্‌বিতূ বা'দুকুম লি বা'দিন আদুব্বুন– আমি বললাম, নেমে যাও তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে। এ সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বললেন : ওয়া লাকুম ফিল আরদি মুসতাকারুও ওয়া মাতাউন ইলা হীন– আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় বসবাস ও জীবিকা কিছুকালের জন্য।

আমাদের এ দুনিয়ায় যেমন জেলখানা আছে, আমাদের কেউ বিশেষ অপরাধ করলে যেমন জেলখানায় বাস করতে হয় সেখানে নির্দিষ্ট কালের জন্য তার বসবাস ও জীবিকা থাকে। তেমনি দুনিয়াতে আদমকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আদেশ অমান্য করার অপরাধে। আর বলে দিলেন, সে সেথায় নির্দিষ্ট কিছুদিন থাকবে এবং আহার ও বাসস্থান পাবে।

কেবল কি সামান্য বাসস্থান ও ভোগ্য সামগ্রী দিয়েই আমাদের পাঠিয়ে দিলেন? না আরো কিছু দিয়ে দিলেন? দুনিয়ায় আমরা কী দেখি? আমরা যখন বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করি, তখন তাদের সামনে দেওয়া হয় একটি পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা। আর সে পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করে শিক্ষক তাকে পড়িয়ে, লিখিয়ে অনুশীলনীর মাধ্যমে গড়ে পিটে মানুষ করেন। তখন ছাত্রটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে উত্তীর্ণ হবার আশা করা যায়। আর যদি কোন সিলেবাস-কারিকুলাম বা কোন শিক্ষক ছাড়াই তাদের ছেড়ে দিই, তাহলে কী ফল হবে? তাহলে তো যে ফল আশা করছি, তা কখনো হবার নয়।

www.pathagar.com

ঠিক তেমনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে আহার বাসস্থান ও যাবতীয় খোর-পোষের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলে দিলেন, Earn thy bread by sweat of thine brow- তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অর্থাৎ পরিশ্রম করে খাও এবং বাস কর। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কি কেবল ভোগ সম্পদ দিয়েই নিরস্ত হলেন? তাহলে ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক, ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য- এসবের জন্য পরীক্ষা করা হবে কেন?

তিনি সত্য মিথ্যা পৃথক করার জন্য যুগে যুগে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসে তাঁদের কাওমকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা সম্বন্ধে তাদের অবহিত এবং নেক কাজের সুফল ও বদ কাজের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন। নবী রাসূলগণ শিক্ষা দিলেন কি করে দুনিয়ায় জিন্দেগী পরিচালনা করতে হবে। কী করে সবাইকে ভালবেসে এ দুনিয়াকে শস্যক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে পক্ক শস্য ঘরে তুলে নেওয়ার সুযোগ হবে।

এ সকল শিক্ষক বললেন : হে মানুষ, শোন, তোমাদের এ জীবনই শেষ নয়। এখানে সামান্য কয়েকদিন মাত্র থাকতে হবে। অনন্ত জীবন সামনে পড়ে রয়েছে। তোমাদের এখানে পাঠান হয়েছে পরকালের সম্বল অর্জন করে, নিজেকে পূত পবিত্র করে আয়ু শেষে স্রষ্টার কাছে, তার রবের কাছে চলে যেতে হবে। সেখানে জান্নাতে রাখা হয়েছিল, আলমে আরওয়াহে, সেখানে সে পুরাতন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার এবং সেখানে অনন্ত কাল ধরে থাকার অধিকার তাকে অর্জন করতে হবে। একেই বলা হয়েছে পরীক্ষা।

আল্লাহ তায়ালা রাহমানুর রাহীম- দয়াময়, পরম করুণাময়। তিনি আমাদের কাছে সিলেবাস না দিয়ে, শিক্ষক না পাঠিয়ে কী করে আশা করবেন যে, আমরা পরীক্ষা দেব এবং তাতে উত্তীর্ণ হবো? তিনি বলেছেন : আমি এমন কোন কাওম পাঠাইনি যাদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠাইনি, তিনি আরো বলেছেন : ওয়ামা কানা রাব্বুকা মুহলিকাল কুরা হাত্তা ইয়াব'আছা ফী উম্মেহা রাসূলান ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিনা-আর নন তোমার প্রতিপালক ধ্বংসকারী জনপদসমূহের, যে পর্যন্ত না তিনি পাঠান তার কেন্দ্রে কোন রাসূল; আবৃত্তি করতে তাদের কাছে আমাদের আয়াত।

অর্থাৎ তিনি কোন সতর্ককারী, তাঁর আয়াত আবৃত্তিকারী, তাঁর বাণী বাহক কোন নবী বা রাসূল না পাঠিয়ে কোন কওমকে ধ্বংস করেন না। তিনি আরো বলেছেনঃ ওয়ামা মুহলিকীল কুরা ইল্লা ওয়া আহলুহা যালিমুন- আর আমি ধ্বংস করিনা জনপদসমূহ, কিন্তু তখনই যখন তার অধিবাসীরা হয়ে পড়ে যালিম-সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ কোন জনপদ বাসীর অন্যায় যুলম যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, কেবল তখনি আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেন।

দুই.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি কোন পথপ্রদর্শক শিক্ষক অর্থাৎ নবী রাসূল না পাঠিয়ে বান্দার পরীক্ষা নিতেন তবে বান্দার অভিযোগ করার অজুহাত থাকতো। বান্দা বলতে

www.pathagar.com

পারতো, ইয়া আল্লাহ, আপনিতো মহা পরীক্ষক, আপনিও হিসাব গ্রহণ করার মালিক আপনিতো আমাদের পাঠ্যসূচী না দিয়েই পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু বান্দার পক্ষে যাতে এ ধরনের অভিযোগ না উঠতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্বাহ্নেই পাঠক্রম ও শিক্ষক পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন : আলাইকাল বালাগ ওয়া আলাইনাল হিসাব– হে নবী, আপনার কর্তব্য কেবল আমার তরফ থেকে লোকদের কাছে সতর্কবাণী পৌছিয়ে দেওয়া; হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব তো আমার উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমি রাসূল পাঠিয়েছি সকল কওমের কাছে এবং কোন কোন কওমের কাছে কিতাবও পাঠিয়েছি। এভাবে হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত বহু নবী রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তৌরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, আল কুরআন এ সব কিতাব পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির কাছে তাওহীদের বাণী নিয়ে এসেছেন মহামানবরা। এঁরা এক আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন।

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছে সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুশীলনীতে। মানুষ ধীরে ধীরে শিক্ষা ও মননশীলতায় এগিয়ে চলেছে। অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে উন্নতির এক বিশেষ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। জাগতিক ও পারলৌকিক ধ্যান ধারণা চরমে পৌছেছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জীবন ও জগৎ এক রহস্যময় ক্রান্তিলগ্ন মাত্র। এখানে পরিশ্রম করে পুঁজি অর্জন করতে হবে। 'আদ্ দুনিয়া মাযরাআতুল আখিরা' দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং

যে চাষা আলস্য ভরে
বীজ না বপন করে
পক্ব শস্য পাবে সে কোথায়?

মানুষ যেহেতু মানুষ, তাই সে অপরাপর জীব থেকে আলাদা। অপরাপর জীবের জীবন কেবল আহার নিদ্রা ও প্রজনন–এই তিনে পর্যবসিত। মানুষ তার জৈব প্রবৃত্তির উর্ধ্বেও ভাবে। কেবল ডাল ভাতে বা আহার নিদ্রায় সে খুশী থাকতে পারে না। সে ভাবে। চিন্ত া করে। তাই তার জৈবিক চাহিদার পরই ঐশ্বরিক ভাবনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। আর সে ভাবনা থেকেই সে তার দেহ মন মস্তিষ্ক অর্থাৎ জৈব প্রয়োজনের পরেই তার মানসিক ও আত্মিক ভাবনার উদয় ও অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের মহামানব, নবী-রাসূল সকলেই মানুষের দৈহিক ও জাগতিক বিচরণ ও সমৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে আত্মিক সাধনায় উৎসাহিত করেন। জীব জগতে মানুষই কেবল আত্মা সম্বন্ধে ভাবে। আর সে জন্যই তার ইহজাগতিক ধ্যান ধারণা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মা ও মানসিক বৃত্তির সহায়তায়। যাকে আত্মা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বরং আত্মাই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তার পথচ্যুতি ঘটে। সেটি মানবীয় পথ নয়।

এই যে ভাবনার জগত, এতেই মানবজীবন শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই তার দেহ ও আত্মার সাজুয্য সাধনের জন্য দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চাই শিক্ষা। আর সে

www.pathagar.com

শিক্ষাই দিয়ে থাকেন নবী ও রাসুলগণ। তাঁরা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত, মানব হিতে নিয়োজিত ও বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ।

আর এ নবী রাসূলদের মধ্যে শেষ ও শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর কাছে প্রেরিত ওহী বা আল্লাহর বাণী আল কুরআন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ জীবনবিধান। হযরত মুহাম্মাদ (সা) জীবনের প্রতিটি কাজ ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণও আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ভরশীলতা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনই আমাদের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁর চরিত্রে রয়েছে সর্বগুণের সমন্বয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেন : লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা– অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

তিন.

পৃথিবীতে একদিন ছিল যখন মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাস করতে হত। আর বেঁচে থাকার জন্য Servival of the fittest– যোগ্যতমেরই টিকে থাকার অধিকার-এর আদর্শই প্রচলিত ছিল। বাহুবলই ছিল বাঁচার একমাত্র উপায়। যুদ্ধ করে বনের পশুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষকে জয় করে তাকে বশ করতে হতো।

ক্রমে ধারণা বদলালো। অর্থবলই মানুষের শ্রেষ্ঠ বল বলে স্বীকৃত হল। কারণ অর্থ সম্পদের মাধ্যমে বাহুবল মানে পশুশক্তি আয়ত্ত করা হল। যার রাজ্য যত বড়, যার সম্পদ যত বেশী, তার অর্থবলও তত বেশী। সুতরাং বাহুবল অর্থাৎ সৈন্য সামন্তও অধিক। তাই অর্থবল বাহুবলের স্থান দখল করল।

ধীরে ধীরে মানুষের ভাবনা চিন্তা, ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হলো। মানুষ দেখল যে, বলে যা করা যায় না বুদ্ধিতে তা সহজেই করা যায়। তখন বুদ্ধি বা জ্ঞানই বাহুবল ও অর্থবলের স্থান দখল করল। তখন মানুষ 'জ্ঞানই শক্তি' Knowledge is power– আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করল। বনের মধ্যে যুদ্ধ করে বাস করতে করতে যেমন নানা কারণে স্বীকৃত হল যে, সিংহই সবচাইতে শক্তিশালী। তাই তাকে পশুর রাজা মনে করা হলো, তেমনি আগের দিনের মানুষ বাহুবলে ইচ্ছার চরিতার্থতার সুযোগ খুঁজেছে, বাহু ও অর্থের বলের সামনে বিরুদ্ধ শক্তি টিকে থাকতে পারেনি। ফেরাউন থেকে আমাদের কালে এসে নেপোলিয়ান পর্যন্ত এইতো দেখি। কিন্তু জ্ঞান সাধানার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ার পর জ্ঞানবান সকল মনীষীই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করল। প্ল্যাটো, সক্রেটিস, এরিস্টটল, এদের চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারণায় তখন মানব-বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হল।

পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ নানা অলৌকিক গুণে বিভূষিত হয়ে তাঁদের আমলের লোকদের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা) একটি বিশেষ গুণ সাথে নিয়ে এলেন। প্রাচীনকালের মানব-মর্যাদা রক্ষা করা দৈহিক ও আর্থিক শক্তি এবং অপরিসীম গুণাবলী ছাড়াও যে গুণে মানুষ আত্মবলে বলীয়ান হয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে গোপন রহস্যটি তিনি বিশ্বের

www.pathagar.com

সমকালীন ভবিষ্যৎ মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বাহুবল, ধনবল, এমনকি জ্ঞানবলই সব কিছু নয়। সবার উপরে যে বলটি মনুষ্য সমাজে ক্রিয়াশীল সেটি হল চরিত্রবল। চরিত্রবলের কোন সীমা নেই। চরিত্র শক্তির কোন তুলনা নেই।

সকল ধর্মের সার বিদ্যা মহাধন; এই ধন 'নাহি নিতে পারে কেড়ে' যেমন একটা সত্য ছিল, তেমন 'সকল বলের সার চরিত্র মহাবল' এই বল কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে' প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তিনি। তিনি আপন চরিত্র দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, বিশ্বের কোন শক্তিই প্রকৃত শক্তি নয়, যদি না চরিত্র শক্তির সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটে।

তিনি তাঁর নিজের মধ্যে বাহুবল, ধনবল সর্বোপরি জ্ঞানবলের আশ্চর্য সংযোজন ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, বাহুবল মানে পেশী শক্তি, ধনবল মানে অর্থশক্তি, জ্ঞানবল মানে বুদ্ধিশক্তি। এ সবই কল্যাণমুখী কার্যকারিতায় প্রযুক্ত হয় এক মাত্র চরিত্র বলের মাধ্যমে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো তিনি নবী বলে পরিচিত হননি। তখনো তিনি সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সেই অসাধারণ বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ জ্ঞান যার বলে তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কাজ করেননি। করার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এসবের কাছে নতি স্বীকার করেননি। বরং অসাধারণভাবে সংযত জীবন যাপন করেছেন। আশৈশব লালিত এ নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ চরিত্র শক্তিই তাঁকে একদা নবুয়ত প্রাপ্তির যোগ্য করে তুলেছিল। তিনি যদি নবী নাও হতেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁকে বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য মনোনীত নাও করতেন; তবু তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য তাঁকে মহা মানবের পর্যায়ে উন্নীত করত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, তিনি তো জানতেন না যে, তাকে নবী বা রাসূল বলে মনোনীত করা হয়েছিল।

পৃথিবীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কালের সকল মানুষের জন্য যে তিনি মুক্তির বাণী নিয়ে আসবেন এ খবর তিনি নিজে না জানলেও অলক্ষ্যে সে বিশেষ উদ্দেশ্যেই ঐশী প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ চলছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি যখন কাফির ও মুশরিকদের আচরণে অতীষ্ঠ হয়ে উঠতেন এবং নিজের মিশন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়তেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন ঃ ওয়ামা কুনতা তারজু আঁইউলকা ইলায়কাল কিতাবা ইল্লা রাহমাতাম মির রাব্বিকা, ফালা তাকুনান্না যাহীরান লিল কাফিরীন– আপনিতো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এ-তো আপনার রহমতস্বরূপ নাযিল হয়েছে। সুতরাং আপনি কাফিরদের সহায়ক পৃষ্ঠপোষক হবেন না। কাজেই তাঁর চরিত্রের অমোঘ শক্তিই তাঁর সবকিছুর উর্ধ্বে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি তা তাঁর প্রতিটি কাজে ও কথায় সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন।

চার.

আজকের এ অশান্ত দুনিয়ায় যতখানি বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁর সময়ে তদানীন্তন বিশ্বের অবস্থা তার চাইতে তেমন কিছু কম ছিল না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুঙ্গে আরোহণ

www.pathagar.com

করে, সভ্যতার চরম বিকাশের সময়, অর্থাৎ আমাদের এ কালে কী দেখি?
অপ্রিয় হলেও একথা সূর্যালোকের মত সত্য যে, আমরা আজ নানা রোগে ভুগছি। আমাদের সমাজে আজ নৈতিকতার ও মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব। চারিদিকে হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অক্টোপাসের মত আমাদের ঘিরে ধরেছে। মূল্য বোধের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য সর্বত্র, সবার মধ্যে এক অসাধারণ আর্তি।

মানুষের মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলি জীবন থেকে নির্বাসিত। ন্যায়বিচারের আশা, সত্য সুন্দর ও কল্যাণের কামনা আজ প্রতারণার শিকার। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হতাশা ও নৈরাশ্যে জর্জরিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত। মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

সৎ অসৎ চিন্তা বিবর্জিত আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জীর্ণ। জীবানু দূষিত গ্যাংগ্রীন সমাজ দেহের সর্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। চরিত্রহীনতা, শঠতা, কপটতা, চতুরতা, ছলনা, প্রতারণা, ভাওতা, মিথ্যা আর বলপ্রয়োগই আমাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোজা কথায়, বিশ্বের সকল মানুষ আজ বর্বরতার আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকার গুহায় অবস্থিত। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, দয়া-মায়া, পরার্থপরতা, কল্যাণ ও সুন্দর আজ নির্বাসিত। বাহুবল ও মাসলম্যানদের রাজত্বে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ মাৎসন্যায় নীতির আয়ত্তে মনুষ্যত্ববোধ বন্দী।

এই কী মনুষ্য জীবন? মানুষ না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ–আশরাফুল মাখলুকাত? তাহলে তার এ দুর্দশা কেন? কেন অশান্ত এ দুনিয়ায়? এ অবক্ষয়ের মূল কোথায়? প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞানানুশীলন, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতা বোধের উৎকর্ষ পরিত্যক্ত কেন, কেন মানবিক, আত্মিক ও মানসিক প্রবণতা দুর্দশাগ্রস্ত? আত্মা-পরমাত্মার কথা কেন আজ নিরাপদ দূরত্বে? জৈবিক ও দৈহিক প্রবৃত্তি এবং পার্থিব ও ইহজাগতিক নেশায় আজ সবাই উন্মাদ কেন? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব তার জ্ঞানানুশীলনে কি এর উৎসের সন্ধান করে, মূল কারণ চিহ্নিত করে, এ সর্বনাশা অবক্ষয়ের শিকড়সুদ্ধ উৎপাটনের উপায় নির্ধারণ করতে পারে না? এ কর্তব্য কি তারই নয়? বিশ্বের যাবতীয় উন্নতি, বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি যদি তার সাধনায় সমৃদ্ধ হতে পারে, তবে এ কাজটিও কি তারই করণীয় নয়? এমন কোন আদর্শ পুরুষ কি নেই, নেই কি কোন মহামানব, যিনি এ জগদ্দল পাথর উন্মোচিত করে, উদ্ধার করতে পারে রোরুদ্যমান মানবতাকে! দিতে পারে সত্য পথের সন্ধান? পারে না কি কোন অমোঘ শক্তি পিঞ্জিরাবদ্ধ মানবতার মুক্তি এনে দিতে?

সীমাহীন অন্ধকারে আলো দিয়ে, দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে প্রকৃত মানবতার শৌর্য জাগ্রত করে, আমাদের চেতনায় ঘা মেরে মৃতকে জাদু পরশে পারে না কি জাগ্রত করতে

www.pathagar.com

কোন মহাপ্রাণ আদর্শ মহামানব? ইতিহাস বলে, যখনই বিশ্ব এমনি ধারার অচলাবস্থায় পতিত হয়েছে, যখনই নির্যাতিত মানবতার কান্না বিশ্ব পরিমণ্ডল- আকাশ বাতাস ভারী তুলেছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে উদ্ধারকর্তা পাঠিয়েছেন। তারা স্রষ্টার তরফ থেকে মুক্তির বানীসহ প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ পুরুষই রাসূল বা নবী। তাঁরা তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি। আদর্শ সন্তানদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাদর্শ মণ্ডিত যে 'বাদ' বা ' ইজম' সেটিই অমোঘ শান্তির বাণীবহ ইসলাম।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুগযন্ত্রণায় মানবতা বার বার কাঁতরিয়ে উঠেছে, কঁকিয়ে উঠেছে। হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের সহজ সরল সাবলীলতা। আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হয়ে গেছে ভোঁতা, অকর্মণ্য। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অমানবিকতার দাম্ভিক পাশবিকতা। মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো অপমৃত হয়েছে তাদের দাপটে দুনিয়া থেকে। কায়েম হয়েছে পশু প্রবৃত্তি। মানবতার করুণ আর্ত গোঙানী তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

মানবতা যখন এভাবে একপাশে অবজ্ঞায় অবহেলিত পরিত্যক্ত, তখন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এসেছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। যিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সামগ্রিক সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে যাবতীয় সমস্যা দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন 'তোমার, আমার, তার' প্রত্যেকের জন্য শান্তি। তাঁর কালের ও অনাগত ভবিষ্যতের কওমের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সুদৃঢ় সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থার। তিনি নিজের জীবনে দেশ, রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থ সকল ক্ষেত্রে নীতির প্রয়োগ করে বড়-ছোট ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, নর-নারী সকলের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমোঘ শিক্ষা। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রে ঘটেছে যার সম্যক বিকাশ, তারই অনুশীলনী করে সমাজকে কলুষ মুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা- আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এ আদর্শের প্যাটার্নেই বাঁচাতে চেয়েছেন তিনি সমস্যাজর্জরিত মানব সমাজকে। সমসাময়িক ও অনাগত ভবিষ্যৎকে মারণাস্ত্রে নয়, ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর নির্দেশিত সে অমোঘ অস্ত্রটি আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রয়োগের মাধ্যমেই কি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না বিশ্বময় প্রকৃত শান্তি? ■

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন, সূরা আরাফ ৭ : আয়াত ১২
২. আল কুরআন, সূরা আরাফ ৭ : আয়াত ১২
৩. আল কুরআন, সূরা হিযর ১৫ : আয়াত ৩২
৪. আল কুরআন, সূরা হিযর ১৫ : আয়াত ৩৩
৫. আল কুরআন, সূরা কাসাস ২৮ : আয়াত ৪৯

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য

অধ্যাপক আবু জাফর

□

রাসূল (সা) যে সর্বমানবের জন্য একমাত্র আদর্শ, ধ্রুব ও প্রকৃষ্টতম কল্যাণের একমাত্র দৃশ্যমান উৎস, সর্বতোমুখী শুভত্বের রশ্মিচ্ছুরিত দৃশ্যমান আলোকবর্তিকা–এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাই, কারণ আল্লাহপাক নিজে নানাভাবে এই এরশাদ করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর নিঃশর্ত আনুগত্যই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের একমাত্র উপায়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কখনো এরশাদ হয়েছে, 'তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্বের রহমতস্বরূপ'; কখনো বলা হয়েছে, 'তিনি সর্বোত্তম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত', 'উৎকৃষ্টতম চরিত্রের অধিকারী', 'সর্বোচ্চ আদর্শের আধার' ইত্যাদি। এবং আল্লাহপাক এসব শুধু এই কারণেই উল্লেখ করেছেন যে, সমগ্র মানবজাতির জন্য যে-একটি হেদায়েত বা নির্ভুল পথরেখা আবশ্যক, রাসূল (সা) তারই ব্যবহারিক অভিধান। এবং এজন্যই আল্লাহপাক বলেন, 'রাসূল (সা) যা দান করেন তা গ্রহণ করো, তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, বিরত থাকো'। অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ আল্লাহতায়ালার অখণ্ডনীয় নির্দেশ। আর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা)-কে আল্লাহ যেহেতু প্রেরণ করেছেন বিশেষ কোন সময়, ভূগোল ও সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তিনি প্রেরিত হয়েছেন সর্বকালে ও সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত সমগ্র মানববংশের জন্য, বিশেষ কোন সম্প্রদায় কি মানবগোষ্ঠী নয়, সব মানুষেরই তিনি আদর্শস্থল, পথপ্রদর্শক এবং একথাও অবশ্যমান্য যে, তিনি যেহেতু সকল মানুষের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বতোমুখী সকল সমস্যা ও সংকট, সকল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ, বঞ্চনা-অভিপ্রায়-অনুসন্ধান– সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান ও নির্ভুল পথনির্দেশ দান করেছেন, শুধু মুসলমানের নয় তিনি সবারই শিক্ষক, সবারই সকল রোগের সফলতম চিকিৎসক। এজন্যই মরুবাসী কোন বেদুঈন, উত্তপ্ত আফ্রিকার কোন কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো, প্রাসাদবাসী সম্রাট অথবা পর্ণকুটিরে বসবাসরত দরিদ্র-অসহায় কোন ভিখারী, শ্বেতবর্ণ ইংরেজ কি তৈলচর্চিত শ্যামল বাঙ্গালী, কবি, বৈজ্ঞানিক, যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ নৃপতি কি সওদাগর– সকলের সব প্রশ্নের নির্ভুল সদুত্তর হলো রাসূল (সা)-এর জীবন ও জীবনাদর্শ। অতএব বিনা প্রশ্নে তাঁকে অনুসরণ করাই মানবজাতির জন্য সাফল্যলাভের প্রকৃত সোপান; এবং তাঁর প্রতি অবাধ্যতার অর্থই হলো অনিবার্য বিপর্যয়।

www.pathagar.com

কিন্তু একটি গুরুতর সমস্যা হলো, যারা আল্লাহকে মানে না, আল্লাহর কোরআনকে মানে না, আপনাপন বুদ্ধি ও আবেগের বাইরে কিছুই মানে না, তাদের কী করে বুঝানো যায় যে, রাসূল (সা)-এর পথই একমাত্র পথ! কী করে বুঝানো যায় যে, রাসূল (সা) ছাড়া না কোন পথ আছে, না কোন পাথেয়। সমস্যাই বটে; কারণ রাসূল (সা) ছাড়া এমন কোন নির্ভুল সর্বতোমুখী স্বতঃপ্রভ আদর্শের দ্বিতীয় কোন উপমা পৃথিবীতে নাই, যা সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বতোভাবে অনুসরণযোগ্য— এই সুপ্রমাণিত শাশ্বত কথাটি বহু মানুষের কাছে এখনো সন্দেহের বিষয়, কিছু আজন্ম জাহান্নামীর কাছে অবজ্ঞারও বিষয়। কিন্তু কেন? কারণ অবশ্য একটি নয়, অনেক; তবে একটি কারণ বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহপাকের কী এক রহস্যময় অভিপ্রায়ে পৃথিবীর শিক্ষা ও নেতৃত্ব মাঝে মাঝেই এমন কিছু বদ্ধ-উন্মাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, যারা কূপবাসিনী মণ্ডূকের মতই নিজেকে বিরাটরূপে ধারণা করে। এবং এই আত্মম্ভরিতাবশতই তারা মানুষের 'উপকারার্থে' এমন সব তত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমাধানের উদ্ভব ঘটান, যা আসলে আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানের বিপরীত। তাদের উদ্দেশ্য যে সর্বদাই মন্দ তা হয়ত নয়, তবে মানববংশের জন্য সর্বকাল ও সর্বদেশোপযোগী সংবিধান রচনা– যে মানুষের কাজ নয়, এই সহজ অক্ষমতার কথাটি তাদের মনে কদাচ উদিত হয়। ফলে তারা হয়ে ওঠে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মানুষের সর্বনাশসাধনে নির্ভুলভাবে তৎপর এক-একটি মতবাদের উদ্ভাবক। এবং ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে আবির্ভূত এই সকল বহুমস্তকবিশিষ্ট উদ্ভাবক তাদের স্বসৃষ্ট মতবাদের প্রতি এতই দৃঢ়ভাবে আস্থাবান যে, তারা কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এমনকি নবীও দাবী করে বসেছে। এরাই তারা, তাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক সূরা শুয়ারা-তে জানিয়ে দিয়েছেন– এরা শয়তানের প্রভাবাধীন, আজগুবি মিথ্যার জনক এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের নেতা। আশ্চর্য নয় যে, এই ইবলিস-প্রভাবিত নেতাদেরও অনুসারী-ভক্তের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে প্রথমত, নেতার নিজস্ব চাতুর্যের গুণে; এবং দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক স্বার্থ ও ব্যবসার কারণেও তৈরী হয় গুরুকেন্দ্রিক উপগ্রহসদৃশ ঘূর্ণায়মান ভক্তরূপী এক শোষক সম্প্রদায়। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ঋজু ও নির্মল সংবিধান; যে সংবিধানের মূল রচয়িতা আল্লাহপাক স্বয়ং এবং যার ব্যবহারিক ও হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ রাসূল (সা)-এর জীবন; যে-জীবনের কোথাও সূচাগ্র পরিমাণ চালাকি নেই, অসংগতি নেই, আল্লাহপাকের নির্দেশ-বহির্ভূত এক বর্ণ নিজস্বতা নেই। এবং তাঁর অনুসারী সাহাবী (রা)-এর চরিত্রও প্রায় নেতার মতই একই রকম বৈষয়িক স্বার্থগন্ধরিক্ত অনুপম। অবশ্য অনেক পরে মুসলমানদের মধ্যেও আবির্ভাব ঘটেছে নানা শ্রেণীর ধর্মজীবী ইসলাম-ব্যবসায়ীদের, যারা ইসলামের নামে ইসলামের প্রকৃত রূপকেই বিকৃত করে দিয়েছে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এখানে যা বলতে চাই তা হলো, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা)-দের মধ্যে যে-সর্বকল্যাণময় আদর্শের অনিন্দ্য-উপহার, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। এমনকি অতিকট্টর ইসলামবিদ্বেষীও একথা স্বীকার করতে বাধ্য। অতএব এ প্রশ্ন

www.pathagar.com

খুবই সংগত ও খুবই স্বাভাবিক যে, সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য এমন মমতাময়, এমন নির্ভুল-হিতৈষী পথপ্রদর্শককে পরিহার করে মানুষ কোন্ গন্তব্যে পৌঁছতে চায়? বলাই বাহুল্য, গন্তব্যস্থলটি অতীব যন্ত্রণাদায়ক। আল্লাহপাক বলেন, 'ফাবাশশিরহুম বি আজাবীন আলীম'– তাদের জন্য কঠিনতম শাস্তির সুসংবাদ। সত্যই অনেক মানুষের নসীব বড় খারাপ এবং এতদসঙ্গে তাদের মূঢ়তাও গগনচুম্বী!

সব মানুষেরই এটা একটা স্বভাবগত প্রবণতা যে, তার সামনে সে একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শপুরুষ স্থির করে নেয়। এই পুরুষ কি মহাপুরুষ সত্যই কতটা আদর্শবান, সত্যই কতটা অনুসরণযোগ্য, সে একটি প্রশ্ন বটে, কিন্তু কেউ একবার আনুগত্য অর্জন করলে, তাকে খুব কমই ভক্তদের হৃদয়-সিংহাসন থেকে অনাস্থার মাটিতে অবতরণ করতে হয়েছে। মানুষের এটা দোষ নয়, স্বভাবদোষ। সে ভক্তি নিবেদন করতেও তৎপর, ভক্তিভাজনকে দীর্ঘকাল মাথায় তুলে রাখতেও সে ক্লান্তিহীন। আর এতদসঙ্গে যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈষয়িক প্রশ্নও জড়িত, ভক্তবেশী শোষক, উপশোষকদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। অবশ্য সত্যের সংস্পর্শে অনেকের যে মোহভঙ্গ ঘটে না তা নয়, ঘটে; কিন্তু বহু মানুষ যে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক জেনে কিম্বা না জেনে কাঁচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য নিরূপণে অক্ষমই থেকে যায়– এটাও এই পৃথিবীর একটি অনপনেয় দুর্ভাগ্য। এবং এজন্যই প্রাচীন মিসরে গুবরে-পোকাও যেমন ছিল পূজ্যপাদ আরাধ্য দেবতা, এখনো ভক্তপরিবৃত রজনীশ-ধরনের চতুর ভগবানদের একই রকম রমরমা পসার। শ্রীরামচন্দ্রের অসংখ্য ভক্ত প্রজাদের দুঃখপ্রহত-চিত্তের সান্ত্বনাস্বরূপ সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করেই ভরত সেকালে যেমন নিরাপদে রাজ্যশাসন করেন, একালেও একই কৌশলে মার্কসবাদ কি গোপন তাসাউফি-ইলমের কুহেলিকা সৃষ্টিকরত বহু কমরেড বা পীর-দরবেশ তাদের অনুসারীদেরকে অলীক আশার নাগপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। অনুগামী ভক্তরা ভুলেও কখনো ভেবে দেখে না, তাদের পূজিত মহামানবটি সত্যই কতখানি অর্ঘ্যলাভের যোগ্য! সারল্য ও সংস্কারাশ্রিত মূঢ়তা দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত বহু মানুষ চিরকাল এভাবেই কিছু মানুষের দ্বারা পরাভূত ও প্রতারিত হয়ে আসছে। সহস্র সহস্র বৎসরের মানব অধ্যুষিত পৃথিবীর এ-এক স্থায়ী দুশ্চিকিৎস ব্যাধি। এই ব্যাধি ছিল বলেই সূর্যদেবতার গল্প শুনিয়ে ফারাও রাজাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শত শত বৎসর শোষণ ও উৎপীড়ন অব্যাহত রাখা; পারস্য সম্রাট কিসরাদের পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডলির মহিমা প্রচার করে বহু বর্ষব্যাপী মানুষকে ভয় ও দাসত্বের শৃঙ্খলে প্রতিবাদহীন করে রাখা। বলাই বাহুল্য, এই নিদারুণ ব্যাধির নিরাময়কল্পে পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত সফল চিকিৎসক হিসেবেই ধরাপৃষ্ঠে রাসূল (সা)-এর আগমন। কথাটা দুর্বোধ্য নয়, এমনকি কাফের-মুশরিকদের কাছেও নয়। এজন্য গ্যেটে বলেন, বার্নাড'শ বলেন– পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্ব যদি মোহাম্মদ (সা)-এর মত কারো হাতে অর্পণ করা যেতো, নিঃসন্দেহে এই সমস্যাকীর্ণ পৃথিবীর একটা উপায় হতো। নেপোলিয়নও এরকমই ভাবতেন। যতদূর জানা যায়, রাসূল (সা)-এর প্রতি তার এমন অকুণ্ঠ আস্থা তৈরী হয়েছিল যে, মিসরে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন; এবং সেন্টহেলেনায়

www.pathagar.com

নির্বাসিত নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে নেপোলিয়নের অতিশয় প্রিয় ও দুঃখ-নিবারক আশ্রয় ছিল পবিত্র কুরআনুল কারীমের একখণ্ড অনুবাদ। এমনকি প্রচণ্ড একনায়ক মুসোলিনীও ইসলাম গ্রহণ করেন নি সত্য— রাসূল (সা) সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিস্ময়ে রীতিমত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ বিষয়টি তাওহিদ কি রেসালত বা অন্য কোন গুরুতর বিষয় ছিল না, নাগরিক সুবিধাসংক্রান্ত নিতান্তই একটি সাধারণ বিষয়। অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর সব কথাই যে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান, এ-কথা এমন কি মুসোলিনীর মত একরোখা একনায়কও সবিনয়ে অনুধাবন করেছিলেন। এবং একটি নয় দুটি নয়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি সমস্যায় রাসূল (সা)-এর যে ব্যবস্থাপত্র, তারই মধ্যে রয়েছে সকল কালের সকল মানুষের অব্যর্থ সুচিকৎসা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নির্ভুল নিরাময়। এজন্যই তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। অর্থাৎ তাঁর পদাঙ্কচিহ্নিত পথই যে, সকল মানুষের জন্য নির্ভুল গন্তব্যের দিকে সরল, সহজ, সঠিক পথ, এ নিয়ে কণামাত্র সংশয় পোষণ করাও গর্হিত মূঢ়তা। কিন্তু পৃথিবীর বড় বদনসীব, তার কাছে এই ঘনকৃষ্ণ মূঢ়তারই অপর নাম সভ্যতা, পাণ্ডিত্য ও প্রগতিবাদ, আধুনিকতা ও মুক্তবুদ্ধি, উত্তর-আধুনিকতা ইত্যাদি। অথচ অন্যদিকে রাসূল (সা)-এর প্রতি মুহব্বত ও আনুগত্যের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় মৌলবাদ ও পশ্চাদপদতা। আফসোস, সাধারণবিবেক ও সাধারণবুদ্ধির এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সত্যই কোন উপমা নেই। বিশেষ করে এই গুরুতর ঈমানী-সংকট যখন পুরো মুসলিম উম্মাহকেও নানাভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন এই আফসোসের আসলেই কোন সীমা থাকে না।

অন্যেরা যাই বলুক, মুসলমানের অন্তত পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক, রাসূল (সা)-এর মূল বক্তব্যটি কী? আল্লাহপাক তাঁকে কী বার্তা বা পয়গামসহ প্রেরণ করেছিলেন? তাঁর নাতিদীর্ঘ পার্থিব নবুয়তি-জীবনের মূল লক্ষ্যটি কী ছিল? অনেকে বলবেন, রাসূল (সা) অনেক কথা বলেছেন এবং সবই মূল্যবান। অবশ্যই মূল্যবান; কুরআনুল কারীম ও সহীহ্ হাদীসসমূহ থেকে প্রাপ্ত যে-কোন নির্দেশই মুসলমানের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবু সকল বিধি ও নিষেধ-নির্দেশের একটি সুস্পষ্ট মর্মার্থ আছে; এবং এই মর্মার্থটি হলো, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান ও তাঁরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, পৃথিবীর জন্য চূড়ান্ত সংবিধান হিসেবে গৃহীত হবে আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শ এবং অবশ্যমান্য আনুষ্ঠানিকতা, তা-সবই এই শর্তটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অতএব কেন্দ্রই যদি দুর্বল ও অন্তঃসারহীন হয়, অন্য যে কোন আনুষ্ঠানিকতাও দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য এবং লোক-দেখানো তুচ্ছ বিষয়ে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এজন্যই আল্লাহপাক এবং তাঁর রাসূল (সা) বলেন, এমন অনেক সালাত ও সিয়াম আছে যা পালনকারীর মুখের উপর ছুড়ে ফেলা হবে। এজন্যই 'নিষ্ঠার সঙ্গে' নামাজ-রোজা ইত্যাদি সবকিছু করা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ বিন উবাই ইতিহাস-কুখ্যাত মুনাফিক-সর্দার; এবং এজন্যই তায়েফ থেকে আগত কোন গোত্রের সদস্যরা যখন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে স্বল্প কিছুদিনের জন্য লাতের মূর্তি রাখবার অনুমতি প্রার্থনা করলো, রাসূল (সা) সরোষে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আসলে এটাই ইসলাম, এটাই

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর পয়গাম এবং এটাই বান্দাহর কাছে আল্লাহর হক। অতএব তওহিদের প্রশ্নে, আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, যে-কোন তাগুতি শক্তির উদ্ভাবিত বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রশ্নে যে-মুসলমান নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়, তার ভূমিকা খুবই নৈরাশ্যজনক এবং তার সকল ইবাদত, চূড়ান্ত বিচারে অগ্রাহ্য হবারই কথা। কারণ এই ধরনের 'নির্দোষ' অপ্রতিবাদী লেবাসী-মুসলমান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর সৈনিক হবার যোগ্যতা রাখে না; তাদের অবস্থান বরং কাফের-মুশরিকদেরই নিকটবর্তী। ইসলাম ব্যক্তিচরিত্রে সকল সদ্‌গুণের সমাহার দেখতে চায় এবং এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বও প্রদান করে, কিন্তু ঈমানরিক্ত সদ্‌গুণাবলীর একটি কপর্দকও মূল্য নেই ইসলামে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার তামান্না থেকে যে-মুসলমান মাহরূম, তার অন্য যে-কোন ইবাদতই নিষ্ফল। না-হলে তাবুকের যুদ্ধাভিযানে শরীক না-হবার কারণে সাহাবী হিলাল বিন উমাইয়া (রা), যিনি প্রায় অক্ষম একজন বৃদ্ধ, তাঁর উপর অসহনীয় বয়কটের মত গুরুতর শাস্তি প্রয়োগ করা হতো না। অথচ শোনা যায় না, নামাজ-রোজার প্রতি শৈথিল্যের কারণে রাসূল (সা) কাউকে কখনো এই ধরনের গুরুদণ্ড প্রদান করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর অনুসরণ মানেই একটি বিরাট দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নেয়া। আর দায়িত্বটি হলো, আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকেই চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠাদানের অব্যাহত চেষ্টায় সর্বাত্মকভাবে লেগে থাকা। এজন্য রাসূল (সা)-এর প্রতি মুহব্বত মানেই একটি কন্টকাকীর্ণ সংগ্রামী জীবনকে বরণ করে নেয়া; বৈরী তাগুতি শক্তিসমূহের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে তওহিদের আওয়াজকে, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও, উচ্চে তুলে ধরা। অতএব এটা পানির মত পরিষ্কার, কর্তব্যের দাবীকে কৌশলে পরিহার করে নিরাপদ তসবিহ কি দরুদ পাঠের মধ্যে যে মুহব্বত, সে আসলে একটি দায়িত্বরিক্ত মৌখিক মুহব্বত। মনে হয় না, আল্লাহপাক এই ধরনের মুহব্বতের আদৌ কোন মূল্য দেবেন। চতুর্দিকে দুর্যোগের ঘনঘটা, চতুর্দিকে কাফের-মুশরিকদের উল্লাসধ্বনি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে; এই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। একটিই মাত্র পথ, রাসূল (সা)-এর নিঃশর্ত অনুসরণ। কাফের-মুশরিক এবং তথাকথিত প্রগতিমুগ্ধ মুসলিমবেশী মুনাফিকরা যাই বলুক, কারো কথায় কর্ণপাত না করে মুসলমানকে আজ আবার নতুন করে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। ড: ইকবাল বলেন, 'সবক্ ফির পড় সদাকত্ কা আদালত্ কা শুজাবাত্ কা; লিয়া জায়েগা তুঝ্ সে কাম্ দুনিয়াকি ইমামত্ কা'। এ ছাড়া কোন পথ নেই; আর এই পথই রাসূল (সা)-এর প্রদর্শিত পথ। কারণ মহানবী (সা)-ই পৃথিবীর সম্মুখে সত্য ও ইনসাফ এবং বীরত্বের একত্রীভূত এক অখণ্ড রূপরেখা তুলে ধরেছেন। আমরা এই মহামানবেরই প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী; অথচ আফসোস, মিথ্যা-অবিচার ও ভীরুতায় আজ আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। সত্যই বড় নিদারুণ এই কৌতুক, বড়ই নিদারুণ!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রভুত্ব কায়েম করেছিলেন। আর যখনই মানুষের মিথ্যা প্রভুত্ব খতম হয়ে গেল, মানুষের উপর মানুষের প্রকৃত প্রভু, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মালিক, মানুষের প্রকৃত উপাস্যের প্রভুত্ব কায়েম হলো, তখনই দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। আর এটাই ছিল মহানবী (সা)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে তিনি একটি অসভ্য উচ্ছৃংখল জাতির জীবনে যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করলেন, তা যেমন ছিল বিস্ময়কর, তেমনি ছিল অভাবনীয়।

মহানবী (সা) সর্বপ্রথম যে দাওয়াত মানুষের কাছে পেশ করেছিলেন তা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' আর এটাই ছিল মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মূলমন্ত্র। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। এখানে ইলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে মাবুদ উপাস্য। মাবুদ শব্দটি আবদুন শব্দ থেকে এসেছে। আবদুন শব্দের অর্থ হচ্ছে দাস, গোলাম, বন্দেগী করা। আর মাবুদ শব্দ হচ্ছে, যার দাসত্ব করতে হবে, গোলামী করতে হবে, বন্দেগী করতে হবে। যার আদেশ মানতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মাবুদ নেই, যার বন্দেগী, দাসত্ব করা যেতে পারে, যার হুকুম বা আদেশ মানা যেতে পারে। সমগ্র মানব জাতি একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, আল্লাহর আদেশ মতোই জীবন যাপন করবে। এ বিপ্লবী ঘোষণাই রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' বিপ্লবী দাওয়াতের মাঝে। তারপর একজন মুসলমান ঘোষণা দেয়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। রাসূল কাকে বলা হয়? যাকে আল্লাহতালা মানুষের মধ্যে থেকে নিজেই বাছাই করে নেন এবং তাকে নির্ভুল জ্ঞান দিয়ে, তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে দুনিয়ার মানুষের মাঝে পাঠান। যিনি কোন ভুল করেন না। যিনি সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের guidence এ পরিচালিত হন তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। আমরা মুসলমানগণ কাকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করেছি? মুহাম্মাদ (সা)কে রাসূল হিসাবে ঘোষণা দিয়েছি। এ একটি বিপ্লবী ঘোষণা। আমরা মুসলমানগণ যখন কালেমা পাঠ করি তখন মুহাম্মাদ (সা)কেই রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেই। এর অর্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা)ই হচ্ছেন বর্তমান মুসলমান জাতির এবং সমগ্র মানব জাতির একমাত্র নির্ভুল পথপ্রদর্শক। কাজেই তাঁকে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে অনুসরণ করবো। একমাত্র তাঁর শিক্ষা এবং আদর্শ মেনে চলবো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের বিপরীত কোন কাজ আমরা করবো না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে আমরা এ বিপ্লবী ঘোষণাই দিয়ে থাকি। মহানবী (সা) এ বিপ্লবী কালেমার ঘোষণার মাধ্যমেই মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন- হুকুম দেয়ার মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। মানুষ মানুষের উপর নিজের রচিত কোন আইন বা হুকুম জারী করতে পারবে না আল্লাহর আইন বা হুকুম ছাড়া। এই ছিল আল্লাহর আদেশ। আল্লাহতায়ালা

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য যে আইন জারীকরেছেন, মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে শুধু তার আইন পালন করবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিভাগে। এটাই হলো বিশ্ব শান্তির একমাত্র পথ, মহানবী (সা)-এর কলেমা তাইয়্যেবার মূলমন্ত্রও তাই।

মহানবী (সা) এ কালেমার ভিত্তিতেই একটি দলকে সুসংগঠিত করেছিলেন। যারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বলে স্বীকার করত না, আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করত না। আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম বা আদেশ মানত না, আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোন আদেশ তারা পালন করতে রাজী হতো না, অর্থাৎ আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, আইনদাতা, জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা বলে স্বীকার করতো, আর কাউকেই তা বলে স্বীকার করত না। যারা ছিল নির্ভীক, অকুতোভয়, এমনি একটি মানব দলকে নিয়েই তিনি স্রষ্টার বিধানের বিপরীত একটি সমাজের সমস্ত অন্যায়, অনাচার, অকল্যাণের উৎখাত করে শান্তিময়, কল্যাণময়, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে সমাজে একজন নারী ইয়ামেন থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত পূর্ণ অলংকার পরিহিত অবস্থায় হেঁটে যেতে পারতো– তার কোন ভয় ছিল না, বন্য জন্তুর ভয় ছাড়া।

সমগ্র মানব জাতি একবাক্যে স্বীকার করেছে, মহানবী (সা) ছিলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, শুধুমাত্র মুসলমানগণই নয় বহু অমুসলিম পাশ্চাত্য মনীষী তাঁকে নিয়ে, তাঁর জীবন নিয়ে, তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে, তাঁর জীবন-পদ্ধতি নিয়ে, তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। এবং তাঁকেই একমাত্র বিশ্বশান্তির অগ্রদূত বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা) কখন এসেছিলেন, কি নিয়ে এসেছিলেন, এর সমস্ত জবাব জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তাঁকেই একমাত্র বিশ্বশান্তির অগ্রদূত বলে পরিগণিত করলেও তাঁর আদেশ আজ বাস্তবে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট নয়। তার কারণ বিশ্বের বুকে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব আজ আবার কায়েম হয়েছে। মানুষের উপর মানুষ আবার শোষণ নির্যাতন, নিষ্পেষণ চালাবার সুযোগ পাচ্ছে। এসব সুযোগ কায়েমী স্বার্থবাদীরা ছাড়তে রাজী নয়। আজ তাই সবচেয়ে প্রয়োজন রাসূল (সা) এর সাহাবীদের ন্যায় অকুতোভয়, নির্ভীক, আল্লাহভীরু সাহসী মুমিনের। যারা মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা বানাবার জন্য জীবন বাজী রেখে এগিয়ে আসবে। সাহাবীদের ন্যায় জান ও মালের কুরবানী দেবে। দরকার হলে দেশ ত্যাগ করবে। প্রয়োজন হলে জীবন দেবে। একাজ করতে গিয়েই মহানবী (সা) এত বিপদ মাথায় নিয়েছিলেন। এত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। বীরের ন্যায় মাতৃভূমি সহায় সম্পদ আপনজন ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তবু অন্যায়, অসত্যের কাছে নতি স্বীকার করেননি। আল্লা ছাড়া কারোর প্রভুত্ব স্বীকার করেননি। কারো কাছে, মানুষের আইনের কাছে মাথা নত করেননি।

ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম অর্থ শান্তি। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহতালার আনুগত্য এবং রাসূল (সা) অনুসরণের মাঝেই রয়েছে শান্তি

www.pathagar.com

। মানবীয় সার্বিক সমস্যার নির্ভুল সমাধান। এ জন্যেই মহানবী (সা) মানুষের কাছে যে দাওয়াত পেশ করেছিলেন তা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যার অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মানুষ শুধু আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করবে। আল্লাহ পাকেরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। আল্লাহতায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার যে পথ মহানবী মানুষকে শিখিয়েছেন মানুষ শুধু তারই অনুসরণ করবে। এ শিক্ষাই তিনি সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন এবং এ শিক্ষা অনুসরণ করেই মানুষ প্রকৃত শান্তি পেতে পারে।

আল্লাহ মানুষের জন্য দুনিয়াতে জীবন যাপনের যে আইন-বিধান দিয়েছেন, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন, আল্লাহর দেয়া সেই আল কুরআনের আইন-বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কোনদিন শান্তি বা কল্যাণ পেতে পারে না, মানব সমাজে কোনদিন ন্যায় ইনসাফ সুবিচার, সততা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যেই আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে আদেশ করেছেন, 'আকীমুদ্দীনা ওয়ালা তাতাফার্‌রাকু ফীহ।' অর্থাৎ তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর- এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য করবে না। আল্লাহ পাকের এ নির্দেশকে পূর্ণভাবে কার্যকর করেছিলেন মহানবী (সা) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবীগণ। মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করে সেখানে আল কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবন এবং সমাজ গড়তে যেয়েই মহানবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের পাহাড় সমান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আল্লাহ পাকের প্রেরিত আল কুরআনের প্রতিটি বিধানে রয়েছে পরিপূর্ণ শান্তি ও কল্যাণ। মানব জীবনের সংগে পূর্ণ সংগতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যশীল এ বিধান। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য, মানুষের প্রতি মানুষের হক, আল্লাহর হক, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের সুন্দরতম বিধান রয়েছে আল কুরআন এবং রাসূল (সা)-এর হাদিসে। বস্তুত এসব কর্তব্যে অবহেলার দরুনই দুনিয়াতে যত অশান্তির সৃষ্টি হয়। মহানবী তাই সকলের কর্তব্য নির্দেশ করে অশান্তির কারণসমূহ দূরীভূত করেছেন।

মহানবী (সা) মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, 'হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ না করে।'

তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে মুসলমান নয়।'

মহানবী (সা) বিদায় হজ্বে বলেছেন, তোমাদের আল্লাহ এক, তোমাদের আদি পিতাও এক, সুতরাং কোন অনারবের উপর আরবের, কিংবা কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কোন জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যিনি সংযত ও আল্লাহভীরু। এভাবে মহানবী (সা) সাদা কালো, আরব অনারবের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে এবং প্রতিটি মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। সমাজের সকল অশান্তির মূল উৎপাটন করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য মহানবী (সা) আল্লাহ পাকের নির্দেশেই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও যতক্ষণ না ফেৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং জীবন ব্যবস্থা হিসাবে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না হয়।' জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহর বিধান ছাড়া দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ইতিহাস সাক্ষী, মহানবী (সা) সব সময় অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, হিংসা- বিদ্বেষ বশত কোন জাতি বা গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি। বা কোন দেশ দখলের জন্য, কোন ভূমি দখলের জন্য বা তৈলক্ষেত্র, গ্যাসক্ষেত্র বা খনি দখলের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। কোন দেশের ওপর অন্যায়, অবৈধ হামলা করেননি। তিনি যুদ্ধ করেছেন আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের মাঝে ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার, সততা প্রতিষ্ঠার জন্য। যাবতীয় অন্যায় অকল্যাণ, অশান্তি দূরীভূত করে ন্যায়, কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। মহানবী (সা) বলেছেন, 'অত্যাচারী এবং ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ।' আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'আমি তোমাদের একটি মধ্যম পন্থী জাতি বানিয়েছি, যেন তোমরা মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের সামনে সত্যের সাক্ষী হন।' নবীজীর সময়ের মুসলমানগণ দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর নির্দেশে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারিমে যা কিছু আদেশ করেছেন, মুসলমানগণ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, যা কিছু নিষেধ করেছেন তা মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় বর্জন করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা) সাহাবীদে সংগে একত্র হলেই এই বাণীটি সব সময় তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন, 'আমানতের খেয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভংগকারীর দ্বীন নেই।'

নবী করীম (সা)-এর সময়ের মুসলমানরা জানতেন, মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না, মুসলমান ওয়াদা খেলাফ করতে পারে না, মুসলমান সুদ খেতে পারে না, ঘুষ খেতে পারে না, মদ খেতে পারে না, জুয়া খেলতে পারে না, চুরী ডাকাতি করতে পারে না, ব্যভিচার করতে পারে না, পরনারী অপহরণ করতে, পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতে পারে না। মুসলিম ব্যবসায়ী ওজনে কম দিতে পারে না, খাদ্যশস্য মওজুদ করতে পারে না। মুসলমানদের এ চরিত্র বলেই তারা হয়েছিলেন আল্লাহর ভাষায় 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি'। আর মুসলমানদের জীবনে আল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব নমুনা দেখেই দুনিয়ার মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের বিশ্বের একশত বা সোয়াশত কোটি মুসলমান যদি আল কুরআনের বাস্তব অনুসারী হতে পারে তাহলেই তারা বিজাতীয় আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে পারে, বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার অবসান হতে পারে, তাদের ওপর আবার আল্লাহর রহমত নাযিল হতে

www.pathagar.com

পারে, দুনিয়ায় আবার তারা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মহানবী (সা) শুধু শান্তির অগ্রদূত ছিলেন না, তিনি প্রগতিরও অগ্রপথিক ছিলেন। ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে মুসলমানগণ মানব সভ্যতাকে যা দান করেছে, তা অতুলনীয়, সভ্যতার বা প্রগতির এমন কোন শাখা নেই যেখানে মুসলমানদের অবদানে সমৃদ্ধ নয়।

ইসলামকে যারা প্রগতির অন্তরায় মনে করে তাদের মনে রাখা উচিত ইসলামকে ধারণ করেই মুসলমানগণ বিশ্বের অর্ধেকটায় রাজত্ব করেছিলেন। আজকের আধুনিকতাবাদের ধ্বজাধারীরা এবং কমিউনিস্টরা ইসলামকে প্রগতির অন্তরায় বলে প্রচার করাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদেরই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রোজার গারোদী তাদের সে ধারণাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। রোজার বলেছেন-'ইসলাম সমস্ত যুগের সকল বিশৃঙ্খলা ভেঙ্গে দিয়ে সব রকমের অশান্তির মূল ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইসলামী সভ্যতাই পরবর্তী যুগে রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, তমদ্দুনে ইসলাম মানব সভ্যতার গতিকে এগিয়ে এনেছিল।

তিনি বলেছেন 'ইসলামী সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা, ইসলামকে অবলম্বন করেই অসভ্য আরব জাতি মানব সভ্যতাকে যা দান করেছে তা অভাবিত পূর্ব'

তিনি বলেছেন, 'ইসলামের অনুসারীরাই আধুনিক যুক্তিবাদের, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবর্তক। পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস, লজিক, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ইসলামের অবদান মানব সভ্যতার এক পরম সম্পদ।'

সুতরাং একজন বস্তুবাদী হয়েই রোজার গারোদী ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, তথাকথিত মার্কসবাদের ইসলাম সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল– বিশেষ করে ইতিহাসের অজ্ঞতার ফলেই মাকর্সবাদের অনুসারীরা বা অন্যান্য বস্তুবাদীরা যে ভুল করেছিলেন, তারই অনুসারী গারোদীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা ধরা পড়ে গেল।

গারোদী বলেন, শান্তির মহানবী (সা) জগতের আদর্শ মানব। বিশ্বের সকল জীবনী সমালোচকগণ তাকে একবাক্যে মহামানব বলে স্বীকার করেছেন, তিনি কেবল বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, কৃষ্টির ইতিহাসেও এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন যে, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি মনীষীরা যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা মিটে গেছে। কার্লমার্কস, লেনিন প্রভৃতি মনীষীরা যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন তা হাজার বছর বেঁচে থাকবে সে কথা কেউ কি বলতে পারে? কিন্তু মহানবীর সব সৃষ্টি আজও পর্যন্ত টিকে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

গারোদী আরও বলেন, জগতে অনেক মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু মহত্ত্বের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন

www.pathagar.com

কেবলমাত্র একজন, তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

একজন ফরাসী লেখক আলফ্রেড দ্যা লা-মার্টিন তাঁর তুর্কী ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, 'দার্শনিক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, দেখ সেই মুহাম্মাদ (সা)। মানুষের মহত্ত্বের যতগুলি মাপকাঠী আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে?'

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে হজরত মুহাম্মাদ (সা) আমাদেরই মতো মানুষ ছিলেন। তবু তিনি যে এত বড় হতে পেরেছিলেন এটা মানবতার পরম চরিতার্থতা, মানবতার মহাবিজয়। হজরতকে বলতে হয় জগতের আশ্চর্যতম মানুষ। The Wonderful man of the world. গারোদীর মতে 'সাম্রাজ্যবাদীদের বিভেদ সৃষ্টির কূটনৈতিক চাল হচ্ছে, আধুনিক বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলামী সভ্যতার দান অস্বীকার করা। 'আমাদের দেশেরও অতি আধুনিকদের তথা কমিউনিস্টদের একটা প্রগতিশীল ফ্যাশন হয়ে দাঁড়য়েছে।'

ইসলামী সভ্যতা মূলত একটি সাম্যবাদী সভ্যতা এবং সে সভ্যতার যে বিপুল ভবিষ্যৎ রয়েছে এ কথা গারোদী অনেক যুক্তি ও নজিরের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, 'মার্কসবাদী এবং ভুয়া-মার্কসবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে যেখানে সেখানে খুব উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এরা ধর্ম বা ইসলাম সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যার সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাকে নিয়ে আলোচনা করা যে কত বড় কুসংস্কার এরা তা বোঝে না।'

মানুষের প্রগতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব শাখায় আরব জাতিসমূহের বিশেষ অবদান রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে সৃষ্টি হলো এমন সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে যুগের বিশৃংখল ও পরগাছা সমাজ-বিন্যাস ভেঙ্গে গেল।

১৮৬১ সালে যখন নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীরা সারা দুনিয়ায় হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, স্পেনিশ ঐতিহাসিকরা যখন ইসলামের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা বলতে ভয় পেতেন না, তখন প্রাচ্য বিদ্যায় মহাপণ্ডিত দোজি লিখেছেন, (স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা) 'স্পেনের পক্ষে আরব অভিযান হল মঙ্গল। এর ফলে এল সামাজিক বিপ্লব। দীর্ঘকাল ধরে স্পেনের বুকে যেসব অত্যাচারের ভূত চেপে বসেছিল, সেসব দূর হয়ে গেল। দোজি পরিষ্কার করেই বলেছেন, আরবদের শাসনতন্ত্র ছিল এইরূপ, আগের সব সরকারের তুলনায় খাজনার হার কমানো হলো। শিভালরীর অবিভাজ্য শাসনতন্ত্র গঠনের দ্বারা আরব বিজেতারা এমন একটা প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন যা মানব সভ্যতার সৃষ্টিময় যুগে অপরিহার্য।'

আনাতুল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'ফ্রান্সে আরব সভ্যতার বিস্তার না হওয়ায় ফ্রান্সেরই লোকসান হয়েছিল।'

বিখ্যাত লেখক ব্লাসকো ইবাখেনের সাক্ষী! (ক্যাথিড্রেলের ছায়ায় ২০১-৪) 'উত্তর থেকে

www.pathagar.com

বর্বরদের দ্বারা স্পেনে কখনো নবজীবনের সূচনা হয়নি। হয়েছে দক্ষিণ থেকে আগত আরব বিজেতাদের মধ্যস্থতায়। যোদ্ধার অভিযান না বলে বরং একে সভ্যতার প্রসার বলা যায়।' গ্রীসের মধ্য দিয়ে দারিস বা খেবখেলের মতো স্বাধীনতা হরনের জন্য নয়, স্পেনের মধ্য দিয়ে যখন প্রবেশ করেছিল আগন্তুকরা বহু রাজা বহু ধর্মতাত্ত্বিক এবং দাঙ্গাবাজ বিশপদের দাসানুদাস হয়ে পড়েছিল যে জনসাধারণ, তারা দিলখোলা স্বাগতম জানিয়েছিল আগন্তুকদের। এ অভিযানকারীদের পদানত হল যে সব নগর সেখানে খৃষ্টান গির্জাও যেমন রইল, তেমনি রইল মন্দিরও।

মহানবী (সা) এর অনুসারীরা মহান প্রগতির ধারক-বাহক হয়েও ইসলামের উদারতার কারণেই তারা বিশ্বের অর্ধেক জয় করেছিল। আজকের বিজেতা খৃষ্টান ইহুদী এবং হিন্দুদের মাঝে ইসলামের মহান শিক্ষা নেই। উদারতার অভাবেই তারা বিশ্বজুড়ে ধিকৃত ও নিন্দিত। মানবতা চরম লাঞ্ছিত অবহেলিত। এসব পরশ্রীকাতর, লোভী, হিংসুক জাতির দ্বারা মানবতা কোন দিন উপকৃত হবে না বরং চরম দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হবে। যেমন আজকের ইরাকে এবং প্যালেস্টাইনে খৃষ্টান বুশ-ব্লেয়ার এবং ইহুদী শ্যারন ও হিন্দু নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা মানুষের জীবন চরম বিপন্ন ও দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়েছে এবং আরও হতেই থাকবে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'আমি নিশ্চয়ই যবুরেও লিখে দিয়েছিলাম যে আমার পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে কেবল আমার সৎকর্মশীল বান্দারা।' কাজেই স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার ভাষ্য অনুযায়ী এসব নিষ্ঠুর, বর্বর, মানুষ হত্যাকারী, পররাজ্য দখলকারী, পর-সম্পদ লুণ্ঠনকারী, খুনী, সন্ত্রাসী বুশ-ব্লেয়ার-নরেন্দ্র মোদী এবং শ্যারনের মতো মানুষরূপী শয়তানেরা মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহর পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বা শাসক হতে পারে না। হিটলারের মতোই, রাশিয়ার মতোই ক্ষমতার স্তম্ভ থেকে এদের পতন হবে। দামাস্কাসের উমাইয়া খলিফাদের সময়ে ইসলামের প্রথম পর্ব শুধু শতাব্দীকালের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ ৭৫০-৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুবাদের যুগ বলা চলে। ৯ম শতাব্দী শেষ হবার আগেই এরিস্টল, গ্যাবলে, প্লেটো, টলেমী, ইউক্লিড এবং আর্কিমিডিসের লেখা আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, যে যুগে ইউরোপের বর্ণ পরিচয়ও হয়নি। ৮১৩-৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খলিফা আল মামুন অসংখ্য অনুবাদ পুঁথি সংগ্রহ করে বাগদাদে জ্ঞান ভবন নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে যারা কুরআন পড়তেন তারা পরিচিত হলেন হেলেনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের সংগে। পরবর্তী যুগে আল হাকাম সংগ্রহ করেন ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) বই।

এই গ্রহণ ও আত্মসাতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আলকিন্দির সংকলন। (৮৫০ খৃষ্টাব্দ) তিন শতাব্দী কাল পরও একুনামের সেন্ট টমাস কৃত এনসাইক্লোপেডিয়া ছাড়া এরিস্টটল পন্থী এই বই এর মত বড় এনসাইক্লোপেডিয়া তখনকার যুগে ছিল না। বহু শতক পর্যন্ত

www.pathagar.com

এ বই আরববিদ্যা শিক্ষার পক্ষে আদর্শ স্থানীয় ছিল।

আরব সভ্যতা শুধুমাত্র মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিশর, গ্রীস আর রোমের সভ্যতাই পুনরুজ্জীবিত করেনি বরং প্রতি পদক্ষেপেই প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই নতুন অভিযানকারীদের সমুদ্র এবং মরুভূমি পারাপার করতে হত বলে ভূগোল, জ্যোর্তিবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এদের কাছে। সমরখন্দ, কায়রো, কর্ডোভায় স্থাপিত প্রথম মন্দিরগুলি এদেরই কীর্তি। প্রায় ৫০০ বছর পরেও যখন ভাস্কোদাগামা আফ্রিকার উপকূলে মেলিন্তিতে পৌছেন, একজন আরব পথ প্রদর্শক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আহমদ আবু মহজিদ নামে একজন মুসলমান সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কে যে বই লেখেন তার উপর নির্ভর করেই নাবিক-শ্রেষ্ঠ হেনরীর পরিচালনায় পর্তুগীজরা নৌ-বিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা চালায়।

সুয়েজ খাল কাটার কথা যিনি চিন্তা করেন, তিনি একজন খালিফা। কিন্ত রাজনীতির কারণে তিনি পরিকল্পনাটি কার্যকর করতে পারেননি।

কাজেই এ কথা আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করতে কারোরই লজ্জা করা উচিত নয় যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও উন্নত প্রযুক্তির মূলে ছিল যাদের অবদান, তারা ছিলেন শান্তি ও প্রগতির মহানবী (সা) এর অনুসারী, মহানুভব, উদার ও নৈতিক শিক্ষায় প্রভাবিত আরব মুসলমান জাতি। মহানবী (সা) এর আদর্শের নির্ভীক উত্তরসূরী।

আজ আরব জাতির অবদান আরব জাতিই ভুলে গেছে। তারা রাসূল (সা) এর যুগের আরবদের মতো কষ্টসহিষ্ণু, বিশ্বপরিভ্রমণকারী বিশ্ববিজেতা, জ্ঞান বিজ্ঞানের উদ্ভাবক জাতির উত্তরসূরী হয়েও আজ ঘুমন্ত জাতি। আজ তারা বিজাতির দ্বারা লাঞ্ছিত, পরাজিত, নিগৃহীত।

তারা আবার জাগ্রত হতে পারে, তারা আবার উদ্যমী, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী বীর মুসলিম জাতিতে পরিণত হতে পারে, যদি তারা সত্যিকারভাবে মহানবী (সা) এর আদর্শের যথার্থ অনুসারী হতে পারে। মধ্যমপন্থী জাতি হিসাবে আবার বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, যদি আল কুরআনের সত্যিকার অনুসারী হতে পারে, আল কুরআনের দিকে আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কাজেই আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মহানবী (সা)-এর আদর্শ শিক্ষা, সাহচর্য পেয়ে একটি অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র, রাখাল, বেদুইন জাতি বিশ্বের বুকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছে তৎসঙ্গে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন, আল কুরআনের আইন কায়েম করে যেভাবে দিকে দিকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মহানবী (সা) ছিলেন তাদের পথ প্রদর্শক। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শান্তি ও প্রগতির পথপ্রদর্শক এবং ইসলামেই রয়েছে প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও প্রগতির মূল চেতনা ও শিক্ষা। ■

www.pathagar.com

মিলাদুন্নবী ॥ আশরাফ সিদ্দিকী

আসো ঈদ– মিলাদুন্নবী
আসো সেই ত্যাগের ইঙ্গিতে
আনো সেই ঈদের ছবি
এই নীল ভুবনে আবার
আমাদের মানুষ বানাও!
এ হৃদয় জাগাও– জাগাও!!
জালো লাল
আলোর মশাল
হৃদয়ের আঁধার নাশুক!
দিকে দিকে শান্তি আসুক!!

আনো ফের
ইবরাহিমের
সেই ত্যাগ হৃদয়ে আমার!
এ হৃদয় জ্বলুক আবার!!

আহা নীল
মৃতের মিছিল
কারা ওই পথে পথে চলে!
কে এসেছে সেই ঈদ বলে!!
বিপ্লবের
মহাসাম্যের
জয়গানে দুরন্ত রঙীন
আনো ঈদ– আনো সেই দিন!
আনো সেই মিলনের দিন!!

আহা লাল
রক্তিম সকাল
জ্বালে প্রাণে দুরন্ত রোশ্‌নাই :
চোখ তুলে সমুখে তাকাই!!

www.pathagar.com

শুদ্ধতম গোলাপ ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ

আকাশে বাতাসে কার আগমনী আনে সুসংবাদ?
—ধসে পড়ল পারশ্যের খসরুর বিশাল প্রাসাদ।

অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল কত শত হাজার বছর—
সে কেন হঠাৎ নেভে? এলো আজ কে অবিনশ্বর?

দ্যাখো, দ্যাখো, আরবের আকাশে নতুন তারা;
ঝলমল করে উঠল আদিগন্ত সমস্ত সাহারা।

কী হলো হঠাৎ? কেন লুটিয়ে পড়ল লাত-মানাত?
—তাবৎ তমসা ভেঙে আসছে কী সোনার প্রভাত?

অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত— অন্য এক আলো জ্বলে ওঠে,
অন্য আলো শুদ্ধতম গোলাপের মতো ওই ফোটে।

হঠাৎ শুকিয়ে গেল সাগরের মতো সাবাহ্রদ।
কে এল? কে এল আজ?— ভুবনের প্রিয় মুহম্মদ!

কোরান কাব্য ॥ মুহম্মদ নূরুল হুদা

সূরা হুমাযা

আফসোস খুব, পেছনে গেলে নিন্দা করে, সামনে এলে দোষে,
সঞ্চিত ধন গোণে বারবার, স্থায়ী করার বাসনাটা পোষে;
ধারণাও করে না যে পড়বে সে-ও হুতামাহ্-রোষে;
জানেন নাকি হুতামাহ্ কি? ভয়াবহ প্রজ্বলন্ত অগ্নি আল্লাহ্‌র
পৌঁছে যাবে হৃৎপিণ্ডে; দীর্ঘায়িত স্তম্ভ দিয়ে সেই অগ্নিঘেরা চারিধার।

সূরা তাকাছুর

ধনরত্নের প্রাচুর্যেই বেভুল তোমরা সব
গোরের খবর দিচ্ছে কবর ভবের কলরব;
সঙ্গত নয় এসব মোটে; দেখবে সচক্ষে
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, দেখবে নরককে;
নিয়ামতের প্রশ্ন শুনে জাগবে কাঁপন বক্ষে।

www.pathagar.com

না'তে রাসূল ॥ আল মুজাহিদী

মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
সাল্লু আলায়হি ওয়াসাল্লাম...

তুমি নূরের নবী, তুমি নবীর নবী
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি জান্নাতের ছবি
তুমি আঁধার ধরায় পূর্ণতিথি চাঁদ।

মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
সাল্লু আলায়হি ওয়াসাল্লাম...

অসীম আকাশ আর রবি, শশী, তারা
পাহাড়, সাগর, নদী ঝর্ণাধারা
গায় যে না'তিয়া, নিখিল কায়েনাত।

মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
সাল্লু আলায়হি ওয়াসাল্লাম...

হাজার যুগের আদি আধিয়ার
ভাঙলো কুঠুরি আঁধার গুহার
হলো অবসান হলো চির ক্ষয়
হেরার তোরণে আলোর অভ্যুদয়।

এলো পৃথিবীতে মানুষের নবী
আমেনার চোখে নিখিলের ছবি
বিশ্বজুড়ে জাগে মিলন প্রভাত।

মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ
সাল্লু আলায়হি ওয়াসাল্লাম...

www.pathagar.com

সূরা কারিয়াহ
হৃৎ-কাঁপানো বস্তু চেনো, আঘাতকারী বস্তু?
প্রলয়দিনে দুনিয়াটাই ক্ষিপ্ত ভীষণ বস্তু।
মানুষ সেদিন ছিটকে যাবে কীটপতঙ্গ-প্রায়
পাহাড়গিরি ধূনা-পশম, শূন্যে উড়ে যায়।
ভারী পাল্লায় সুখী জীবন, হাল হকিকত হক,
হাল্কা পাল্লায় ঠিক-ঠিকানা হাবিয়া দোজখ;
দোজখ কী?— দোজখ মানে অগ্নিকুণ্ড, জ্বলন্ত, টগবগ।

সূরা লাহাব
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুইটি হাত
ধ্বংস হোক, লাহাব স্বয়ং যাক নিপাত
ধনদৌলত কিছুই তার আসেনি কাজে
তার কোনো আয়-উপার্জনও আসেনি কাজে;
অচিরেই সে, আর তার বউ, মাথায় বোঝা করে বহন
ঢুকবে দোযখে যেখানে তপ্ত শিখার দহন;
আর একখানা শক্ত মজবুত পাকানো রশি
ঝুলবে বউয়ের গণ্ডদেশে অহর্নিশি।
বেশুমার তার ধনদৌলত লাগেনি কাজে
তার যত আয়-উপার্জনও আসেনি কাজে।

সূরা নছর
যখন এসেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও জয়
দেখেছেন দলে দলে মানুষেরা ইসলামেই সুদীক্ষিত হয়।
তাহলে প্রশংসা করুক আপনার প্রতিপালকের,
প্রার্থনা করুন ক্ষমা তাঁর কাছে, ক্ষমতা রয়েছে যাঁর ক্ষমা গ্রহণের।

সূরা কাফেরুন
আপনি বলুন,
অবিশ্বাসীরা শোনো তবে জবাব আমার;
উপাসনা করো যার, আমি তো করি না সেই দেবতার;
আমি উপাসনা করি যার, তোমরা তো করোনা সে সত্তার;
উপাসনা করবো না আমি তোমাদের দেবতার;
তোমরাও উপাসনা করবে না আমার মহান সত্তার;
তোমাদের ধর্ম থাক তোমাদের, আমার ধর্ম থাক তাহলে আমার।

www.pathagar.com

না'ত ॥ ব'নজীর আহমদ

তোমার তুলনা তুমি
সা'দীর তারিফে পাই
খোদার পরেই তুমি
জামীর কালামে তাই।
পাপের আঁধার ভূমি
নূরের আলোয় চুমি'
উজালা করেছ তুমি
তোমার তুলনা নাই।
হাশর দিবসে তুমি
আমার পাপের ঠাঁই
তোমার নামটি চুমি'
সালাম দরূদ গাই।
দিবসে তুমিই রবি
আঁধারে চাঁদের ছবি
মাটির মানুষ নবী
তোমর করুণা চাই।

২.

নবীদের সেরা নূরনবী
আলোর দিশারী আহমদ
রসূলের সেরা বিশ্বনবী
আমার পেয়ারা মুহাম্মদ।
তুমি দিবসের বিবস্বান
তুমি নিশীথের শামাদান
তুমি উম্মতের পরিত্রাণ
তুমিই আমার প্রেমাস্পদ।
চন্দ্রালোকে তুমি বোরাকের
আসনে করেছো অভিযান
স্বশরীরে তুমি মে'রাজের
জমিনে মাটির ইনসান।

www.pathagar.com

তুমি যহমতে প্রিয়তম
তুমি রহমতে দো'আলম
তুমি কেয়ামতের শ্রেষ্ঠতম
আমার পেয়ারা মুহাম্মদ।

মহান ক্রীতদাস ॥ সানাউল্লাহ্ নূরী

এক রৌদ্র দগ্ধ মরুভূমি
জ্বলন্ত চুল্লির মতন ছড়ানো
আগুন পোড়া-পোড়া বালুকার
কণা। গড়ালো সকাল-দুপুর।
হস্তপদ-বাঁধা এক কৃষ্ণকায়
ক্রীতদাস ঝলসাচ্ছেন সেই
উত্তপ্ত কন্টাঙ্গে
পুড়ে কাবাব হওয়া এক
অসহায় মাছের মতন।

চারপাশে নাচে তার হিংস্র
থাবা মেলা গিদড়ের দল
শাণিত বল্লম এবং খাপখোলা
অসি ঝলকায় তাঁর
মস্তকের 'পর।
তীর-তীব্র স্বরে হাঁকলো ওরা—
বিলাল! ওরে ঘৃণ্য ক্রীতদাস
একবার হ' দেখি বশ
প্রভু লাত-দেব এবং মাতা
ওজ্জা দেবীর। তাহলে মুক্তি
দেবো, বন্ধনমুক্ত করবো তোর।

কাতর কণ্ঠে বিলাল
কেবলি জপে চলেন :
ওয়াহেদ! ইয়া ওয়াহেদ!

www.pathagar.com

একক একক তিনি
অংশী নেই যাঁর।

মুক্ত হলেন তিনি অবশেষে
দাসত্বের নাগপাশ হতে
এক মহৎজনের উদার কৃপায়
আর দুই হাত-ভরা তাঁর
পণের টাকায়।

বিদ্ধ হলো না আর
বুকে বিলালের পাষণ্ডের
খরশান অসি।

বিমুক্ত হলেন তিনি
হলেন স্বাধীন মানুষ
গাত্রবর্ণ তাঁর ধুয়ে গেলো
ভেদহীন তাওহীদের
অপার সৌরভে।

বুকে নিলেন তুলে
নবী সেই অসামান্য দাসেরে
স্নেহ স্পর্শ দিলেন ওঁর
সমস্ত শরীরে।

ঠাঁই হলো কৃষ্ণবর্ণ বিলালের
মানবিক সমতার
ছত্রছায়া তলে।
হলেন প্রিয় সহচর
তিনি মহান নবীর।
হলেন সত্যের উদাত্ত
সুকণ্ঠ ঘোষক
এবং তার নিরন্তর
এক তূর্যবাদক।

www.pathagar.com

বিদেশী ভাষায় রাসূল-প্রশস্তিধর্মী কবিতার বাংলা রূপান্তর

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

❑

রাসূল (সা)-এর অতুলনীয় চিন্তাদর্শ অন্ধকার বিশ্বে যে আলোক-বন্যা নিয়ে আসে তা সমকালীন ইতিহাসে ছিল অকল্পনীয়। ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে এই চিন্তাদর্শ ও চিন্তাদর্শন উৎপীড়িত মানব-মুক্তির হাতিয়ার বলে বিবেচিত হয়। মানব-সমাজ, মানব-সভ্যতা, মানব-দুর্দশা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল— কোন মানুষের পক্ষে এর থেকে অচিরে নিষ্কৃতি প্রায় ধারণাতীত ছিল। এ ধরনের অবস্থা দীর্ঘদিন জগতে টিকে থাকবে এটাই হ'য়ে পড়েছিল মানুষের ধারণা। রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব এবং তার অতুলনীয় সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে বিজয় লাভ করে দৈত্য-শাসনে নিষ্পেষিত মানুষেরা শীতের পরে বসন্তের আগমন মনে করে। খরা-প্রবল সময়ে প্রাণী ও প্রকৃতি গ্রীষ্মের বৃষ্টি-সুধা মনে করে, অতিবৃষ্টি-বন্যার পরে শ্যামল পৃথিবীর জাগরণ মনে করে। রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবে সেটাই মনে হয়েছিল উৎপীড়িত ও নিপগৃহীত মানুষের। অন্ধকার মেঘাবসানের পর নীলাকাশের চন্দ্রোদয়ের মত এই মহামুক্তি বিশ্বের ভিন্ন ভাষার কবিদের চিত্তে সৃষ্টি-প্রেরণা যে যুগিয়েছিল সেটা আরবী, ফারসী ভাষার কবিতা পাঠে উপলব্ধি করা যায়। বাংলাভাষী পাঠকেরা বিশেষ করে যাঁরা ভিন্‌দেশী ভাষার সঙ্গে অপরিচিত; তাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য বাঙালী লেখক ও কবিরা ঐ সব দেশের চিন্তাবিদ, মনীষী, রাসূল-সাহাবী ও রাসূলভক্তদের রাসূলপ্রশস্তি সংক্রান্ত কবিতার যে অনুবাদ করেছেন এখানে সে সম্বন্ধে কিছু চিত্তরোচক আলোচনা করছি। আশা করি এতে রাসূলভক্ত এবং রাসূল-প্রেমিকরা এ বিষয়ে অবহিত হয়ে শুধু আনন্দিত হবেন না– রাসূল-প্রশস্তির প্রেরণায় নব-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হবেন। অন্ধকার কবলিত নিপীড়িত বিশ্বের আলোক পিপাসা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল "মরু ভাস্কর"-এ নজরুল ইসলাম সেই ব্যাকুল অনুভূতির একটি অমর চিত্র এঁকেছেন এইভাবে–

> শত শতাব্দী যুগ-যুগান্ত বহিয়া যায়
> ফিরে নাহি আসা স্রোতের প্রায়
> চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ্' ও 'নূহ' নবি–

www.pathagar.com

জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!
চলে গেল 'ঈসা', 'মুসা' ও 'দাউদ', 'ইবরাহিম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম ।
গেল 'সুলেমান', গেল 'ইউনুস', গেল 'ইউসুফ' রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইসাহাক', 'ইয়াকুব' গেল, জবীহুল্লাহ্ 'ইসমাইল'
খোদার আদেশ করি হাসিল।
এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়াল তুতী পাপিয়া পিক
বুলবুল শ্যামা; ভরিয়া দিক
যাহার কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান।
উর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন ঈসা, অমর মর্ত্যে 'খাজাখিজির'
— দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর–
ঘোষিতে যেন গো এপারে ওপারে তাহারি আসার খোশ খবর
যাহার আশায় এ চরাচর
আছে তপস্যারত চিরদিন, ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।
আদিম ললাটে ভাতিল যে আলো উষার পূরব গগন-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তারে খুঁছিছে হায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন', পরী, হুর পাগল-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খোঁজে অপ্সর কিন্নর খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশতায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ, যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে সুখে, আনন্দে, নব-সৃষ্টির ঘন-ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!

www.pathagar.com

শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বদ্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ ছেদন নবী কোথায়?
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তহার অসীম স্তবতায়
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার জগদল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধ প্রায়
খোঁজে প্রাণ বিদ্রোহী কোথায়!
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত-ব্যথায়
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগ-যুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়
চির-সুন্দর তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব ওঙ্কার ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায় –
তুমি কোথায়! তুমি কোথায়!

আসলে শুধু আরব সমাজ নয়, গোটা দুনিয়ার মানব সমাজ পাশবিক আবেগে উদ্বোধিত, পাশবিক ঘৃণা, লোভ, জিঘাংসায় সমৃদ্ধ দৈত্য দানবের অত্যাচার উৎপীড়নে এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে অবস্থায় কোন উদ্ধারকারী অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। সেই অবস্থার যন্ত্রনা ব্যাকুল যে ছবি নজরুল এঁকেছেন রাসূর-প্রশস্তিতে তা দুর্লব। সেই অবস্থার বর্ণনা আমরা গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' এবং আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত'-এর গদ্যভাষ্যে দেখেছি। 'মরু-ভাস্কর'-এ এর ছন্দিত উপমাসমৃদ্ধ কাব্যরূপ দিলেন নজরুল ইসলাম। তিনি লিখলেন–

এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয় রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ-অনাচার দ্বেষ-হিংসার আশী-বিষ ফণাতলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণ-জ্যোতি মানিকের মত জ্বলে!
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে-ভল্লুকে রণ; নখর-দন্ত-খত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম!
শূন্য অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম,
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জমে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল!
ধরণী ভগ্ন তরণীর প্রায় শূন্য পাথার-তলে

www.pathagar.com

হাবুডুবু খায় বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ!

এই অবস্থার অচিন্তনীয় পরিবর্তনে যাঁর বিপুল কর্ম-প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও সংগ্রাম ধরণীর বুকে নব-স্বপ্নের দুনিয়া সৃষ্টি করেছিল; আরব-মনীষী, রাসূল-সাহাবীরাই প্রথমে তাঁকে প্রশংসা-অঞ্জলি দিয়ে বরণ করেন। এখানে তাঁর সাহাবী ও ইসলামের খলিফাদের তাঁর উপর লেখা কয়েকটি কবিতা-উদ্ধৃতি তার সাক্ষ্য দেবে–

হযরত আবু বকর (রা) :

গুহার আধারে আমরা তখন,
আমি শংকিত হইনি
নবীজী আমাকে দিলেন আশ্বাস,
বললেন, ভয় নেই কিছুরই,
আল্লাহ্ আমাদের তৃতীয় জন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি
ঘোষাণা দিলেন আমাকে, সকলকে
তিনিই তো সাফল্যের জমিদার!
(অনু : ফরীদউদ্দীন মাসউদ)

হযরত উমর ফারুক :

বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
আল্লাহ্ই আমাদের খালেক ও মালিক
আর আহমদ (সা) এক ভাস্বর নবী।
সত্যের নবী তিনি, সত্যসহ এসেছেন মর্ত্যলোকে
পরিপূর্ণ আশ্বাসে, পূর্ণ ভরসায়;
অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততায় করেছেন আদায় নিজ আমানত-ভার।
শোষণহীন সমাজের অনন্য রূপকার
যার পথে নেই কোন জুলুম শোষণ।
(অনু : ফরীদউদ্দীন মাসউদ)

হযরত উসমান (রা) :

রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর দীন গ্রহণ করায়
তোমরা আমাকে ভ্রষ্ট ও পথহারা বলছ সবাই

www.pathagar.com

কিন্তু তবুও আল্লাহ্কেই চাই আমি
হক দীন তো আমাদেরই দীন,
যতই জুলুম আর বাড়াবাড়ি
করো না কেন তোমরা।
(অনু : পূর্বোক্ত)

হযরত আলী (রা) :

ফাতিমা!
মানুষের প্রভু দয়াময় রহমানের ভালোবাসা
আর নবী আহমদের সাথীদের জন্যে
আমার পরীক্ষা নেয়া হয়। আমি বিজয়ী বীর;
যেহেতু, আল্লাহ্র পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টি আর
নেয়ামতে ভরা জান্নাতের কামনাই
উদ্দীপ্ত জীবনের লক্ষ্য আমার। বক্ষ আমার
স্ফীত হয়, যুদ্ধের দামামা গর্জে ওঠে
যখন জেহাদের ময়দানে।
সেখানেও চুম্বন করে বিজয় গৌরব আমার ললাটে
আর আবদ দার পুত্রের শির ছিল
আমার নিশানা। তীক্ষ্ণধার তলোয়ার
দ্বিখণ্ডিত করে রেখে দেয় সে শির। মুষ্টির
তলোয়ার আমার সুরাইয়া সিতারার মতোন
কাফির দুশনের শির ছেদন করে অবিরাম এবং
বিলকুল বিরান করে শত্রুর জমায়েত আর
জালেমের বিরান ভূমি হাসি ফোটায় মজলুম জনতার
(অনু : আবদুস শহীদ নাসিম)

উল্লেখ্য, রাসূল (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস, হযরত হামজা (রা) নবী করীম (সা)-এর উপর কবিতা লিখেছিলেন। উদাহরণ–

হযরত আব্বাস :

হে নবী যখন ভূমিষ্ঠ হ'লে তুমি
পৃথিবী ভেসে গেলো আলোর রশ্মিতে।
চতুর্দিক জ্যোতির্ময় হ'ল তোমার বিভায়
আর আমরা আছি

www.pathagar.com

সেই আলোকময় জ্যোতির গোলকে
সত্যের পথের পথিক আমরা
কেবল হেঁটে চলেছি। হাঁটছি...
(অনু : ফরীদউদ্দীন মাসউদ)

হযরত হামজা (রা) :

এমন পয়গাম নিয়ে এলে আহমদ (সা)
যার প্রতিটি আয়াতে আছে পথের দিশা
যার প্রতিটি অক্ষরই
আলোকবর্তিকা।
(অনু : পূর্বোক্ত)

রাসূল (সা)-র প্রিয়তম কনিষ্ঠা কন্যা, হযরত আলী (রা)-এর সহধর্মিনী, হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসেন (রা)-এর আম্মা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রা)-ও রাসূল (সা)-এর উপর কবিতা লিখেছেন–

১. যে কেউ সুঘ্রাণ নেয় নবীর ঘামের একবার
লাগবে না ভালো তার পৃথিবীর কোন ঘ্রাণ আর।

রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর হযরত ফাতিমা (রা)-এর লেখা মর্সিয়া

২. তোমার বিহনে আমি বৃষ্টিহীন বিশুষ্ক মৃত্তিকা
তোমারই অন্তর্ধানে বন্ধ আজি ঐশীবাণী সব।

* * *

আমার হৃদয়ে আজ অন্ধকার; কণামাত্র তার
পড়তো এ বিশ্বে যদি, আলো বলে কিছু থাকতো না আর।
(অনু : আবদুস সাত্তার)

এবারে কয়েকজন বিখ্যাত আরবী কবির রাসূল (সা)-এর উপর লিখিত কবিতার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করব। প্রথমে ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত কা'ব বিন যুহায়র (রা)-এর লেখা 'বানত-সু'আদ'-এর গদ্য অনুবাদ তুলে ধরছি। উল্লেখ্য কা'ব ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুদলের সঙ্গী হওয়ায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কাব্য রচনার জন্য রাসুল (সা) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বলা বাহুল্য, রাসূল (সা) নিজের প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা করলেও ধর্মের শত্রুকে ক্ষমা করতেন না। কিন্তু তিনি কাবকে, কাব ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর দরবারে আসেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন যেটা আরবী কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রশস্তি গাইলে রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর স্কন্ধের চাদর উপহার দেন। যে চারদটি তুর্কী সুলতানের কোষাগারে রক্ষিত ছিল। ইসলামে দীক্ষিত কাবের সেই অসাধারণ কবিতাটির

www.pathagar.com

অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল–

৩৯। "আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।

৪০। "অনন্তর আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অনুযোগকারী হইয়া আমি আসিয়াছি, কেননা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট ওজর গ্রাহ্য ইহয়া থাকে।

৪১। "আমাকে ক্ষমা করুন, সেই আল্লাহ্‌ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, যিনি আপনাকে কুরআন অতিরিক্ত অনুগ্রহরূপে দান করিয়াছেন। তাহাতে উপদেশ ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

৪২। "নিন্দুকগণের বাক্যে আপনি আমাকে নিগৃহীত করিবেন না; যেহেতু যদিও আমার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইয়াছে, আমি কিন্তু কোন অপরাধ করি নাই।

৪৩। "নিশ্চয় আমি এমন স্থানে দণ্ডায়মান ইহয়াছি এবং এইরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি যে, যদি হস্তী সেই স্থানে দাঁড়াইত ও শুনিত, সে কম্পিত হইত।

৪৪। "এতদূর পর্যন্ত যে, আমি আমার দক্ষিণ হস্ত সেই প্রতিশোধ গ্রহণকারী করতলে রাখিলাম, যাঁহার বাক্যই বাক্য। আমি তাঁদের অবাধ্যাচরণ করি নাই।

৪৬। "এই যে যখন আমি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম এবং আমাকে বলা হইল, 'নিশ্চয়ই তুমি দোষী এবং শোচনীয় হইয়াছ', তখন তিনি আমার নিকট।

৪৭। "সেই ভয়ানক ব্যাঘ্র হইতে অধিক ভীতিজনক বোধ হইয়াছিলেন, যাহার বাসস্থান সেই 'আসসর' নামক অরণ্যের মধ্যে যথায় বনের পরে বন বিরাজমান,

* * *

৫২। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসুলএ মন এক জ্যোতিঃ যাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। তিনি আল্লাহ্‌র তরবারীসমূহ মধ্যে এক কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি সদৃশ।

ছন্দ-ঐশ্বর্যে সমুন্নত কা'বের রাসূল প্রশস্তির কাব্যানুবাদ প্রায় দুঃসাধ্য বলে শহীদুল্লাহ্‌ এটা গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। ফলে ছন্দহীন গদ্যানুবাদ অনেকটা রসহীন হয়ে পড়ায় মাধুর্যহীন হয়ে পড়েছে। সে জন্যে মাওলানা আখতার ফারুক কবিতাটির কাব্যরূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। সেই রূপান্তরিত কবিতাটির কিছু অংশ এখানে উদ্বৃত হল–

আমার হেথায় হইত যদি মস্ত কোন মত্ত হাতি
আজব ব্যাপার নজর করে কাঁপত ভয়ে দিবস রাতি
আশার আলো মিটির মিটির জোনাক সম জ্বলছে মনে
কেউ বা জানে দয়ার সাগর উথলে ওঠে কোন লগনে।।

কাফের-তরাস যুগল বাহু দখিন বাহু রাখনু তাতে
ফেলব না তাঁর পুণ্যবাণী সন্দেহ নেই বিন্দু যাতে
ভয় শুধু এই সেসব কথা শুধান যদি রসূল আবার
নিন্দুকেরা রটাল যা আমার নামে শহর বাজার।।

www.pathagar.com

বাঘ কি বা ছার ভয় করি তার ভয়ংকর সে বাঘের চেয়ে
অগুণতি বাঘ দাস হয়ে যার কাটায় বনে ভয়ে লুকিয়ে
ভোর না হতে বাচ্চাটি যার নাস্তা করে আস্ত নরে
এক শ' নরের ধূসর কেশর ধূম আয়োজন একের তরে।

সমস্তরের বাঘ যদি তায় সাহস ভরে হামলা করে
হয় না হালাল তিলেক দেরী আছড়ে দিতে মাটির পরে
হিংস্র পশু রয় না বনে দিবস রাতি কাটায় ত্রাসে
ভ্রান্তিবশে যায় না মানুষ শংকাতে সেই বনের পাশে।
হাজার সবল হোক না সে বীর যায় যদি সেই কানন মাঝে
লড়ার আগেই হার মেনে যায় শির পেতে দেয় শংকা লাজে।
মানতে হবে দীপ্ত নূরে ব্যাপ্ত ভুবন সেই রসূলের
খোদার গড়া খাস তলোয়ার নিধান-ঘেরা দূর ভারতের।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মুহম্মদ শেষের এই দু'টি পংক্তির অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

নিশ্চয় আল্লাহের রসূল এমন এক জ্যোতি : যাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। তিনি আল্লাহ্‌র তরবারিসমূহ মধ্যে এক কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি সদৃশ।

অনূদিত কবিতার ভূমিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ লিখেছেন—

"কাব হযরতের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া কালিমা (দীক্ষাবচন) পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর স্বরচিত এই কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন এবং হযরত ও ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে কাবের সুললিত কবিতাটি শুনিতে লাগিলেন। যখন কাব পড়িলেন, 'আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, সে নিশ্চয় আল্লাহের প্রেরিত পুরুষ, আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহের প্রেরিত পুরুষের নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।"

তখন হযরত বলিলেন, "বরং আল্লাহর নিকট ক্ষমা।" তারপর যখন কাব পড়িতে লাগিলেন–

ইন্নার রাসূল লা-নূরুন যুমতাদাউ বিহি
মুহম্মদুন মিন সুয়ুফি- লাহিন্দি মুম্‌লুলু।।

"নিশ্চয়ই আল্লাহের রাসূল এমন এক জ্যোতিঃ যে তাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। তিনি হিন্দুস্থানের তরবারিসমূহের মধ্যে এক কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি সদৃশ।"

তখন হযরত বলিলেন, "বরং আল্লাহের তরবারিসমূহের মধ্যে"। তৎপরে তিনি নিজ স্কন্ধ হইতে চাদর উন্মোচন করিয়া কা'বকে প্রদান করিলেন।"

www.pathagar.com

আখতার ফারুক এই সংশোধনের অনুবাদ করেননি– মুহম্মদ শহীদুল্লাহ করেছেন।

শহীদুল্লাহ্ আরবী ভাষার রাসূল-প্রশস্তিমূলক দীর্ঘ কাসিদার অনুবাদ করেছেন; সেটি শেখ ইমাম সালেহ আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ শরফুদ্দীন বিন সাঈদ বিন্ হাসান বুসীরীর 'কসীদাতুল বুর্দা।' কবি এই বহু বিখ্যাত কবিতা রচনার সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনায় বলেছেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এই কবিতা লিখে রাসূল (সা)-এর মাজারে গিয়ে কবি রাসূল (সা)-কে কবিতাটি পড়ে শোনাবেন বলে ভেবেছিলেন; কিন্তু রাত্রিতে স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। রাসূল-প্রশস্তি রচনা করার পর কবি পক্ষাঘাত রোগ থেকে মুক্তি পান।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন–

> "আরবী সাহিত্যে এই গীতি-কবিতা অতি প্রসিদ্ধ। ইসলাম জগতে শান্তি-সস্তয়নে, আনন্দে' উৎসবে এবং রাজ্যাভিষেক কালে এই কবিতা পঠিত হয়। ভক্তগণ ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহাদের নবীর (সা) এই জীবন গাথা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আবৃত্তি করেন। দরবেশগণ ভক্তি বিজড়িত স্বরে এই কবিতা গান করেন। আরবী ভাষায় ইহার ত্রিংশতাধিক টীকা আছে। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে লাতিন, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত ইহয়াছে।...
>
> লোকমুখে কবিতাটির খ্যাতি প্রচারিত হইলে রাজমন্ত্রী বাহাউদ্দীন কবিতাটি হস্তগত করেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নগ্নপদে নগ্নমস্তকে কবিতাটি শ্রবণ করিতেন। এবং আপদ-বিপদে কবিতাটি পাঠ দ্বারা আল্লাহের নিকট মঙ্গল কামনা করিতেন।
>
> এই সম্বন্ধে ইবন ফারুকীর বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ আছে। কথিত আছে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টি শক্তি হীন হইয়া যান। পরে তিনি স্বপ্নে হযরতের আদেশ পাইয়া কাযী বাহাউদ্দীনের নিকট গিয়া কবিতাটি প্রার্থনা করেন। তিনি কবিতাটি আনিয়া তাঁহার চক্ষে স্থাপন করিবা মাত্র ইবন্ ফারুকী আল্লাহের আদেশে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হন। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, যে কোন অভাব অভিযোগের জন্য এই কবিতা পাঠ করিলে, আল্লাহের ইচ্ছা হইলে ইহার কল্যাণে পাঠকের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়।...

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবিতাটির শাব্দিক অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন–

'আরবী ভাষায় ডুরে চাদরকে বুর্দ বলে। এই কবিতায় বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহার নাম কসীদাতুল বুর্দ : বা ডুরে চাদরের কবিতা। এইরূপ কথিত আছে যে, হযরত (সা) তাঁহার কবিতা শুনিয়া স্বপ্নাবস্থায় কবিকে আপন চাদর খান করেন। ইহা সাধারণত বসিত্ব ছন্দে গ্রথিত।

এখানে শহীদুল্লাহ কর্তৃক গদ্যে অনূদিত কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম–

www.pathagar.com

১। তুমি কি যূ সলম স্থিত প্রতিবেশীগণের স্মরণে চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুকে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়াছ?

২। কিংবা কাযিমা নগরীর বর্ত্ম হইতে কি সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছে? অথবা ইযম পর্বত হইতে কি নিশীথ কালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত ইহয়াছে?

* * *

৩১। উন্নত পর্বত সুবর্ণ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি দেখাইয়াছিলেন তিনি কত উন্নত।

৩২। তাঁহার সাংসারিক অভাব তাঁহার বৈরাগ্যকে দূর করিয়াছিল, নিশ্চয় অভাব বিশুদ্ধ স্বভাবকে পরাভূত করিতে পারে না।

৩৩। যিনি না হইলে জগৎ অনস্তিত্ব হইতে প্রকাশিত হইত না, অভাব কিরূপে তাঁহাকে জগতের দিকে আহ্বান করিতে পারে?

৩৪। মুহাম্মদ (দঃ) ইহ পরকালে, দানব মানবের এবং আরব আযম জাতির মধ্যে প্রধান (সায়্যিদ)।

৩৫। আমাদের নবী আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা। আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কেহ হইতে পারে না।

৩৬। তিনি এমন বন্ধু যে, যে সমস্ত ভয়ানক বিপদে মানুষ প্রবলভাবে নিপতিত হয়, তাহার প্রত্যেকটির নিমিত্ত তাঁহার ক্ষমার অনুরোধ (শফা'আত) আশা করা যাইতে পারে।

৩৭। তিনি আল্লাহের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে'। সে ধর্ম রজ্জুকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে, যে তাহা কখনও ছিন্ন হইবে না।

৩৮। তিনি অন্যান্য নবীগণকে আকৃতি প্রকৃতিতে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞান ও সম্মানে তাঁহার নিকটেও পৌছিতে পারেন নাই।

৩৯। আল্লাহের পয়গম্বর গণের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁহার সমুদ্র হইতে এক অঞ্জালর, কিংবা তাঁহার প্রচুর বৃষ্টিধারা ইহতে এক চমুকের প্রার্থী।

৪০। তাঁহারা তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় বিন্দুরূপে কিংবা তাঁহার বুদ্ধির তুলনায় স্বরচিহ্ন রূপে নিজ নিজ স্থানে অবস্থানকারী।

৪৪। তাঁহার সভা সম্বন্ধে যে গৌরব ইচ্ছা কর; আরোপ কর এবং তাঁহার মর্যাদা সম্বন্ধে যে মহত্ব ইচ্ছা কর; আরোপ কর।

* * *

৫১। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানের শেষ সীমা এই যে তিনি মানব অথচ আল্লাহের সমুদয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

৫২। সম্মানিত পয়গম্বরগণ যে সমস্ত অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই জ্যোতিঃ হইতে তাঁহাদিগেতে সংক্রমিত হইয়াছিল।

৫৩। নিশ্চয়ই তিনি উৎকর্ষের সূর্য এবং তাঁহারা সেই সূর্যের গ্রহমণ্ডলী, যাহা অন্ধকারে মানবের নিমিত্ত তাঁহারই জ্যোতি প্রকাশ করে।

এইভাবে একশ' বাষট্টিটি শ্লোকে এই 'ডোরা চাদর' সম্পূর্ণ হয়েছে। এর প্রথম চার পংক্তির মূল ভাষার মূল ছন্দটি শহীদুল্লাহ্ এমনিভাবে দেখিয়েছেন-

অ মিন। এয্ স্কুরি যী। রানিন্ বিযী। মলমী।
ময্ বতে দম্। 'আন জরা। বিন স্মুকলতিম্। বিদমী।
আম্ হব্ বাতির। রীহু মিন। তিলকাই কা-। যিম্তিন্।
আও আম্ মযূল্। বরকু ফীনয্। যুলমাই মিন্। ইয্মী।।

মাওলানা রুহুল আমীন খান এই সুদীর্ঘ কবিতার ১৬৫টি শ্লোক বাংলা কবিতার স্বরবৃত্ত ছন্দে অনুবাদ করেছেন। তাঁর সেই অনুবাদ থেকে এখানে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হ'ল-

৫৩. সূর্য তিনি তাঁর আকাশে নবী সমাজ গ্রহ তারা
তাঁরই জ্যোতির কেন্দ্র থেকে সবাই পেল জ্যোতির ধারা ॥

৫৪. উদয় হ'তে সেই দিবাকর নিখিল ভুবন উঠল মাতি
মেষ সুবিমল আলো ধারায় করলো গাহন সকল জাতি ॥

৫৫. চারু স্বভাব মঞ্জু কায়া দেহ মনের রূপ মাধুরী
দু'য়ে মিলে সেই অপরূপ রূপ কুমারের নেই যে জুরি॥

৫৬. কোমলতায় গোলাপ কলি উজ্জ্বলতায় তারাপতি
বদান্যতায় মহাসাগর শৌর্যে অমোঘ কালের গতি ॥

৫৭. কুসুম কোমল তবু যে তাঁর স্বভাবসুলভ তেজঃ মহিমায়
একলাকেও মনে হতো ঘেরা বিপুল সৈন্য-সেনায় ॥

৫৮. মুচকি হাসির অন্তরালে ঝিলিক হানে দন্ত সারি
যেন সাগর ঝিনুক থেকে আনলো তাজা মুক্তো পাড়ি ॥

আরবী ভাষার পর নবী করীম (সা)-এর স্তুতি গেয়ে ধন্য হয়েছেন ফারসী ভাষার কবিরা। এখানে তাঁদের কবিতা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হ'লো-

ওমর খৈয়াম :

ওহে ঐ ব্যক্তি যে বিশ্বের অদ্বিতীয়
আমার মন, চক্ষু ও জীবনের চেয়েও প্রিয়
জীবনের চাইতে প্রিয় কোন জিনিস নেই
অথচ আমার জীবন হ'তে শতগুণ বেশী প্রিয় তুমি।

(অনু : আবদুস সাত্তার)

www.pathagar.com

শেখ মসলেহউদ্দিন সাদী :

তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছেন উপনীত,
অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছেন তমসাকে,
আশ্চর্য চরিত্র তাঁর অতুল সৌন্দর্যে মণ্ডিত
রাহমাতুল্লিল আলামীন হাজার সালাম তাঁকে।
('বালাগাল উলা বে-কামালিহি'-র আবদুল মান্নান সৈয়দ কৃত অনুবাদ)

হাফিজ :

দেখ শত শত মনি ভবের বাজারে
বিকাইছে প্রতিদিন
মোর কহিনূর মনি-পার্শ্বে হইল
সব মনি জ্যোতি হীন!
তাই আমি সেই রূপ বাখানিতে
বন্ধ রেখেছি তুলি
আঁখি শুক্তি মাঝারে পুষ্টি লভিছে
অশ্রু মুকুতাগুলি।
(অনু : শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র)

জামী :৯

হে সৌন্দর্যের রাজা, হে মানবকূলের সর্দার
তোমার চেহারার জ্যোতিতে চাঁদ পেল আলো।
তোমার প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই
সংক্ষেপে এইটুক বালি। আল্লাহ্‌র পরই তোমার আসন।
(অনু : আবদুস সাত্তার)

জালালউদ্দিন রুমী :

ইঞ্জিলে রয়েছে নাম নবী মোস্তফার
ত্রাণের সাগর তিনি নবীদের সরদার।

নবী স্তবে উর্দু কবিরাও পিছিয়ে থাকেননি। কয়েকটি উদাহরণ–

বাহাদুর শাহ জাফর :

যদি নবীজীর নূর ভবে না হ'ত প্রকাশ
সবুজ বৃক্ষ শাখার হ'ত না ঠিকানা
যদি না আসতো ধরায় নবীজীর আলো
চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্র হ'তো গভীর কালো।
যদি না মেলতো আঁখি নূরের নবী

www.pathagar.com

পেতো না সুবাস ফুল, হাসতো না রবি।
(অনু : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী)

মীর্জা আসাদুল্লাহ্ গালীব :

কী আনন্দ!! কী আনন্দ!! যখন তোমার কথা ভাবি
আমার আত্মার ঘর আলোকিত বেহেশতী বাগান।
আল্লাহ্ আমাকে দাও চিরন্তন অপার করুণা
নবীর আদর্শে হোক আমার জীবন উজ্জীবিত।

মুহম্মদ ইকবাল :

মুসলিমের অন্তঃকরণ মুহাম্মদের আবাস
যত গৌরব আমাদের,
মুহাম্মদের নাম থেকে
সিনাই তাঁর গৃহের ধুলিরাশির আবর্ত মাত্র।
ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি তৃণের আস্তরণে,
কিন্তু লুণ্ঠিত হয়েছিল খসরুর রাজ মুকুট
তাঁর অনুগামীদের চরণ তলে।
তিনি গ্রহণ করলেন হেরা পর্বতের
নৈশ নিস্তব্ধতা
আর গঠন করলেন একটা রাজ্য, আইন
আর শাসকমণ্ডলী।
কতো রাত্রি তাঁর কেটে গেছে
নিদ্রাহীন চোখে
যেন ঘুমাতে পারে মুসলিম পারস্য সিংহাসনে।
(অনু : সৈয়দ আবদুল মান্নান)

উপমহাদেশের বাইরে বাইরে যেসব ভাষায় রাসূল-প্রশস্তি বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে সর্বোজ্জ্বল জার্মান কবি গেটের লেখা রাসূল প্রশস্তি। গেটের সেই অনন্য কবিতাটির শহীদুল্লাহ্ কৃত অনুবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল–

তবে এস তোমরা সকলে;
এখন ফুলিছে সে
প্রভু রূপে; একটি গোটা জাতিকে
তার রাজকীয় স্রোতে উঠায় উর্ধ্বে
এবং সঞ্চরমান জয়যাত্রায়
দেয় সে নাম দেশকে, নগর জন্মে তার পদতলে।

www.pathagar.com

সতত অবাধ গতি ধায় সে দূরতর
ছেড়ে চলে সে টুপির আলোক চূড়াময়
মর্মর প্রাসাদগুলি, সৃষ্টি তার পূর্ণতায়, দূর পশ্চাদভাগে।
দেবদারু গৃহগুলি বয় 'আতলান'
তার রাক্ষস-স্কন্ধে পত পত শব্দে উড়ে
মস্ত উপরে তার;
সহস্র পতাকা মলয়-পানে, দেখায় তার প্রভুত্ব।

এরূপে বয়ে নিয়ে যায় সে তার ভাইগুলিকে,
তার ধন ভাণ্ডারগুলিকে, তার শিশুগুলিকে
প্রতীক্ষমান জনকের কাছে,
আনন্দ-চিৎকারে তাঁর বক্ষ মাঝে।

ইউরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে আর কোন ভাষায় রাসূল-প্রশস্তিধর্মী কোন কবিতা লেখা হয়েছে কিনা জানি না। আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত 'রাসূলের শানে কবিতা' সংকলনে বিদেশী ভাষায় লেখা রাসূল-প্রশস্তিমূলক যে-সব অনুবাদ ছাপা হ'য়েছে তার অধিকাংশই আরবী, ফারসী এবং উর্দুতে রচিত রাসূল-প্রশস্তির অনুবাদ। আমি এখানে মীর্যা আসাদুল্লাহ গালিব, বাহাদুর শাহ জাফর ও মুহাম্মদ ইকবাল বাদে আরও কয়েকজন উর্দু কবির রাসূল-প্রশস্তির বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করছি। এই অনুবাদসমূহ থেকে উর্দু ভাষায় রাসূল (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

দাগ দেহলভী :

আপনি দয়ার সাগর
যতই পাপী হই না কেন, আমরা তো আপনারই উম্মাত
আমরা জানি আপনি সেদিন
আমাদের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবেন
আহা! কতই না উত্তম সৌভাগ্য আমাদের।
(ভাষান্তর : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, কাব্যানুবাদ : আসাদ বিন হাফিজ)।

জিগর মুরাদাবাদী :

নবীগণের গর্ব হে রাসুল
আপনার আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে বিশ্বজাহান।
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এনেছেন আপনি

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন-ই কামিল—
যার অনুসারী হ'য়ে নিজেকে ধন্য ভাবে
জ্বীন, ইনসান এবং ফেরেশতাকুল।
হে রাসূল!
আপনার নূরের প্রদীপ্ত শিখায়
অন্ধকার দূর হলো, জ্যোতির্ময় হলো অন্তর বাহির
সে আলোর দীপ্তিমান প্রভায়
প্রজ্ঞা ও বোধের অজ্ঞাত সত্য যত হ'ল তা জাহির।
(পূর্বোক্ত)

জোশ মালিহাবাদী :

হে রাসূল আপনার পয়গাম্বরীর বড় প্রমাণ হলো,
আপনি পথের ভিখারীকে দিয়েছেন শাহানশাহী মর্যাদা ও সম্মান।
আপনি বিপথগামীদের করেছেন খিজিরের ঈর্ষার পাত্র,
আপনি ডাক দিলেন রাহযান বা দস্যুদলকে
তাঁরা হ'য়ে গেল হেদায়েতের দিশারী ও সত্যের মশাল বরদার।

আপনার প্রেমপাত্র থেকে তারকারাশি প্রেমসুধা পান করছে আর
আপনার আশপাশ আবৃত্ত করে রেখেছে আসমানী ফেরেশতাকুল।

এই প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র
আপনার প্রক্ষিপ্ত জ্যোতির শরীরে আছে
সমুদ্ভাসিত হওয়ার মত জীবনের অনেক মণিমুক্তো।
হে বিনাশহীন নন্দিত আলোকপুষ্প
আপনার বিস্তারিত অমৃত সুবাসে আছে
জীবনকে পরিপূর্ণ করার অনিবার্য প্রেম আর অতুল ঐশ্বর্য।
হে পয়গম্বর-ই-ইসলাম
অনুগ্রহের প্রার্থনাসহ আপনার প্রতি জানাই হাজার সালাম
আল্লাহর ওয়াস্তে এ অধমের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন,
আপনার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে ধন্য করুন এ মানব জীবন।

(ভাষান্তর : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, কাব্যানুবাদ : আসাদ বিন হাফিজ)

অনুবাদে কখনও— বিরল কিছু অনুবাদ ছাড়া, যেগুলো পরিণত হয় মৌলিক কবিতায়— মূল কবিতার রূপ-রস-মাধুর্য্য স্ফুরিত হয় না— তবু ভিন্ন ভাষার কবিদের ও মনীষীদের প্রেমের ও শ্রদ্ধার গভীরতা জানা আয়াসসাধ্য হয় না। বাংলা অনুবাদে সেই সার্থকতার চিহ্ন অস্পষ্ট নেই। ■

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পত্র ও মু'জিযা

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

□

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের পার্শ্ববর্তী বিভিন রাজা-বাদশা ও শাসকদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত পাঠান। দিহইয়া ইবন খলীফা আল-কালবীকে রোমান সম্রাট হিরাকল, আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আসসাহমীকে পারস্যের কিসরা, 'উমার ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে হাবশার নাজ্জাশী, হাতিব ইবন আবী বালতা'আ আল-লাখমীকে মিসরে রোমান সম্রাট হিরাকলের প্রতিনিধি শাসক মুকাওকাস, সুলায়ত ইবন 'আমর আল-'আমিরীকে ইয়ামামার শাসক হাওযা ইবন 'আলী আল-হানাফী, শুজা ইবন ওয়াহাবকে আল-হারিছ ইবন আবী শিমার আল-গাসসানী, আল- 'আলা' ইবন আল-হাদরামীকে বাহরায়নের শাসক আল- মুনযির ইবন সাওয়া এবং 'আমর ইবন আল-'আসকে 'আল-জানাদীর দুই পুত্র জায়ফার ও 'আব্বাছের নিকট পাঠান। (তারিখ আ-তাবারী ৩/৮৪-৮৫; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ- ২/১৫৮-১৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল রাজা-বাদশা ও আমীর উমারার নিকট পত্র পাঠান তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা যদি রাসূলের দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে ইসলাম তাঁদের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু আরব উপদ্বীপের বাইরে একমাত্র হাবশার নাজ্জাশী ছাড়া কোন রাজা-বাদশা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একথা জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত দূতের সাথে ভালো আচরণ করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে পত্র গ্রহণ করেন। উত্তর দানেও তাঁরা শিষ্টাচারের পরিচয় দেন। আবার অনেকের আচরণ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কেবল পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট লিখিত পত্রটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে।

পারস্য সম্রাট কিমরা আবরুভেজের নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (সা) পত্র নিম্নরূপ :

'এ পত্র মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান সম্রাট কিসরার প্রতি। যারা সত্য-সঠিক পথের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পতি বিশ্বাস স্থাপন

www.pathagar.com

করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি আপনাকে মহান আল্লাহর আহ্বানের দ্বারাই আহ্বান জানাচ্ছি। নিশ্চয় আমি গোটা মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। যাতে, যারা জীবিত আছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহর বাণী সত্যে পরিণত হয়। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপদে থাকুন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে এই মাজূসীদের (অগ্নি-উপাসক) সকল পাপ আপনার উপর বর্তাবে।'

পারস্য সম্রাট কিসরা আবরুভেজ বংশীয় উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর পবিত্র সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেনে। স্বভাবতঃই তিনি ও তাঁর জনগণ আরবদের অনুগত ও অধীন হওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া সম্রাট ও সাম্রাজ্য ছিল পারস্যের জনগণের নিকট অতি পবিত্র, তাই ব্যক্তি সম্রাটও ক্ষমতার জন্য আরবের এই দ্বীনকে ভীতি ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ছিল অতি স্বাভাবিক। তাছাড়া পারসিকরা আরবের ইয়ামন ও হীরা শাসন করার অধিকারী বলে বিশ্বাস করতো। আর তারা আরবের এ দুটি অঞ্চল হিজায থেকে কোন অংশে কম ছিল বলে মনে করতো না।

এসব কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র পেয়ে কিসরা প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দূতের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। সাথে সাথে তিনি ইয়ামনে তার প্রতিনিধি শাসক বাযানকে লিখলেন : 'তুমি হিজাযের এই ব্যক্তির (মুহাম্মাদ) নিকট দু'জন এমন সাহসী লোক পাঠাও যারা তাকে পাকড়াও করে আনতে পারে।' কিসরার এ পত্রের প্রেক্ষিতে 'বাযান' রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একটি পত্রসহ দু'জন দূত পাঠান। পত্রে তিনি বাহকদ্বয়ের সাথে রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর নিকট উপস্থিত হবার নির্দেশ দেন। পত্রসহ বাহকদ্বয় তায়িফে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা মক্কার কুরায়শ বংশের কিছু লোকের দেখা পায় এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে অবগত হয় যে, তিনি মদীনায়। কুরায়শ বক্তিবর্গ লোক দু'টির পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে দারুণ উৎফুল্ল হয়। তাদের একজন আনন্দের আতিশয্যে এমনও বলে : তোমাদের জন্য সুসংবাদ! এবার শাহেনশাহ ইরান কিসরা তাকে দেখে নেবেন। লোকটির জন্য তিনিই উপযুক্ত।

লোক দু'টি মদীনার পথে রওয়ানা হলো এবং এক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললো : কিসরা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) তাদেরকে মদীনায় আগামীকাল আবার দেখা করতে বললেন। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসমান থেকে এই খবর এসে গেল : 'আল্লাহ কিসরা আবরুভেজের উপর তার পুত্র শীরাওয়ায়হিকে ক্ষমতাবান করেছেন। সে তার পিতাকে হত্যা করেছে।' পরের দিন লোক দু'টি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলে তিনি তাদেরকে এ সংবাদটি জানালেন। তারা বললো : আমরা কি আপনার পক্ষ থেকে এ সংবাদ আমাদের রাজাকে জানাবো? বললেন : হাঁ, তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাঁকে

www.pathagar.com

এ সংবাদ অবহিত কর। তাঁকে একথাও বল যে, আমার এ দ্বীন, আমার এ রাষ্ট্র কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাকে আরো বলবে, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে যেসব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী আপনার শাসনাধীনে আছে তা সবই ঠিক থাকবে।

লোক দু'টি ইয়ামনে ফিরে গেল এবং 'বাযানে'র নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) সব কথা খুলে বললো। বাযান সব কথা শুনে বললেন : আল্লাহর কসম! এ কোন রাজা-বাদশাহর কথা নয়। তিনি যেমন বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি একজন নবী। আমরা তাঁর কথার সত্য-মিথ্য নিরূপণের জন্য অপেক্ষা করবো। যদি সত্য হয় তাহলে তিনি অবশ্যই একজন নবী। আর সত্য প্রমাণিত না হলে পরবর্তীতে তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিব। একথা বলার অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর হাতে 'শিরাওয়ায়হি'-এর এ পত্রখানা এসে পৌঁছে ঃ 'অতঃপর এই যে, আমি কিসরাকে (আবরুভেজ) হত্যা করেছি। আমার এ পত্র আপনার নিকট পৌঁছার পর আপনি ও আপনার নিকটে যারা আছে, আমার আনুগত্য মেনে নেবেন। আর ইতিপূর্বে কিসরা যে ব্যক্তির ব্যাপারে (রাসূলুল্লাহ সা) আপনাকে লিখেছিলেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁকে কোন রকম বিরক্ত করবেন না।' শীরাওয়ায়হির এ পত্র পাঠ শেষে বাযান বলে ওঠেন : নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল, অতঃপর তিনি এবং তাঁর সাথে ইয়ামনের মাটিতে পারস্যের যত লোক ছিলেন সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি অল্পকালের মধ্যে ইসলামী খিলাফতের অধীনে আসে। (তারীখ আত-তাবারী ৩/৯০, ইবন কাছীর, আস সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্- ২/১৫৮-১৬১০) ■

www.pathagar.com

নেকাব হরণ

হাসান আলীম

□

ক.

শেষ পর্যন্ত সে চলে এল। এক্কেবারে দলবল সহ। স্বাগত জানাল নগরের অন্যান্য প্রধান লোকেরা। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রেরও পত্তন করলো সে। আমাদের সাথে বেশ চুক্তিও করেছে। দারুণ লোকটি। এক্কেবারে আধুনিক, জ্ঞানী রাষ্ট্রনায়কসুলভ আচরণ তার।

না আমরা আসলে ওসব চুক্তিতে নেই। ওটাতো লোকদেখানো। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বিরোধিতা করে কতদূর চলা যাবে? যদি আবার নিজেদের শহর ছাড়তে হয়। যা হয় হোক। ভেতরে ভেতরে ওদের দেখতেই পারি না। আনসার লোকগুলোই ওদের স্থান দিয়েছে। এখন ওরা রাজত্ব করবে। এটা কি সহ্য করা যায়!

তারপর সে বলে নবী। নবী হওয়ার কথাতো বনি ইসরাইল বংশে। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! রাষ্ট্রনায়ক আবার ধর্মীয় নেতাও। এক্কেবারে নবুয়ত দাবী করছে সে।

কোন বনি ইসরাইলী– ইহুদীর বাচ্চা এসব মেনে নেবে না। শহরের যুবক শ্রেণীর লোকেরা মুসলমানদের ভালচোখে দেখে না। পর্দানশীল মেয়েলোক দেখলে ঘৃণা আর উপহাস করতে ইচ্ছে হয়।

কেন এমন করে ওরা? অমন সুন্দর চেহারা গোলাপের মত সুগন্ধী সুশ্রী মেয়েরা কেন অমন করে কালো পর্দায় ঢেকে থাকে।

মোছলমান মেয়েগুলো আস্তে আস্তে গেঁয়ো ভূত বনে যাচ্ছে। এ থেকে এদের মুক্তি দিতে হবে। এদের স্বাধীন করতে হবে। মুক্তি হলো আমাদের মন মতো করে দাস করা। ওদের জ্বালাতন করা, ভোগ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। – নব্য মোছলমানদের এভাবে ত্যাক্ত-বিরক্ত করলে একদিন তওবা করে ধর্ম ছেড়ে দেবে। নইলে দেশ ছেড়ে দেবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

ইহুদী যুবকদের কেউ কেউ বলছে, না এসব পাগলামী করে লাভ হবে না।

একেবারে সরাসরি চুক্তি অমান্য করলে কেমন হয়? ঐ নেতার কোন কাজকেই আমরা সমর্থন দেবো না। ইহুদীর বাচ্চারা তার জান-বিরোধী।

www.pathagar.com

এই যুবকদের আড্ডা শহরের কোন কোন অলিগলিতে কোন কোন বড় দোকানে লেগে থাকে।

খ.

তারিখ সুলতানার ডাইনের মোড়ে শামতলের সোনার দোকান। বনি কাইনুকা গোত্রের লোক সে। বেশ বড় ব্যবসা তার। সারা ইয়াসরেব, খাইবর, সানা, ফারান পর্যন্ত তার ব্যবসার বহর। – নতুন গহনা গড়ার অর্ডার আর কেনা-বেচার ভিড় লেগেই থাকে তার দোকানে। হুণ্ডি ব্যবসাও তার আছে। চক্র বৃদ্ধি সুদে মেয়েদের সোনার গহনা রেখে টাকা খাটায়। দু হাতে টাকা কামায়। সোনা পাচারের সাথেও সে যুক্ত। তার চাই টাকা আর টাকা।

তার দোকানে বিকেলে বসে উঠতি বয়সের যুবকদের আড্ডা, গালগল্পের আসর। তাতে ব্যসার তেমন ক্ষতি হয় না। বরং লোকের ভিড় থাকে, ফলে আরও লোকের আমদানি হয়।

পাশে বসে কয়েক যুবক ফিসফাস করছে। এমন সময় এক মুসলিম রমণী গহনা কিনত আসে দোকানে। যুবতী মহিলার আপাদমস্তক কালো বোরকায় ঢাকা। চেহারা দেখা যায় না। তবে শরীরের গঠন-গাঠনে মনে হয় বেশ সুঠাম সুন্দরী কান্তা।

যুবকদের কেউ ভাবে, আহ্ যদি সুন্দরীর মুখচাঁদটা দেখা যেত!

একদল বলছে, আরে রাখনা সুন্দরী খুলে ফেল ওর নেকাব। চেহারাও দেখা হবে অপমানও করা হবে। হা - হা- হা।

যুবকদের কথাবার্তায় সুন্দরী মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসে। দোকানী ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সে যুবকদের কিচ্ছু বলছে না বরং উপভোগ করছে। যুবকদের একজন জোরে হেসে হেসে বলছে : কি হে সুন্দরী, অমন ঢেকে এসেছো কেন? আমাদের দেখতে পাচ্ছ না। মুখটা খোল, রূপটা দেখি। যুবকদের কথায় রমণী উঠে দাঁড়ায়। সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। এমনতো কোনদিন হয়নি! এর আগেও সে এখানে এসেছে। শুনেছি মুসলিম-ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। সমঝোতা হয়েছে। কিন্তু ঐ কুকুরের ছানাগুলো এমন করছে কেন?

রমণীর মন এক অজানা আশঙ্কা আর ঘৃণায় তেঁতে ওঠে। না, আর এক মুহূর্তও এ দোকানে থাকা যাবে না। বাইরে পা বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় এক কপট যুবক রমণীর মাথার আবরণ ও মুখের নেকাব হেচকা টানে খুলে ফেলে।

রমণী চিৎকার করে ওঠে : আমাকে বাঁচাও ইয়া মুহাম্মদ! কুকুরের বাচ্চারা আমাকে ঘিরে ধরছে!

রমণীর আর্তচিৎকারে পাশের দোকান থেকে এক মুসলিম যুবক ছুটে আসে। হাতেনাতে ধরে ফেলে ইহুদী যুবককে। প্রচণ্ড জোরে কিলঘুষি মারতে থাকে। যুবকটি মারা যায়।

www.pathagar.com

ইহুদী যুবকটির মৃত্যুতে অন্যান্য ইহুদী যুবকেরা ছুটে আসে। মুসলিম যুবকটিকে তারা একযোগে আক্রমণ করে। এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে।

সাথে সাথে দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে। চাপা উত্তেজনায় ফুঁসে উঠছে শহর। আবার বুঝি শুরু হবে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ। মুসলিম-ইহুদীদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আনসার গোত্রের লোকেরা বনি কাইনুকা গোত্রকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। এ গোত্রের ইহুদীরা নবীর নিকট এ পরিস্থিতি জানাতে যায় না। তারা যায় তাদের মিত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নিকট। মুসলিম আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তারা পরামর্শ চায় তার নিকট। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর নিকট সাহায্য চায়।

আনসার গোত্রের নেতৃত্বে মুসলিম জনগোষ্ঠী বনি কাইনুকা গোত্রের মহল্লা ঘিরে ফেলে। অবরুদ্ধ করে রাখে দীর্ঘ দিন। ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার সামর্থ্য রাখে না আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই নবীর নিকট যায়।

সে ভাবে হয়তো নবীজী ইহুদীদের হত্যা করে ফেলবে। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রাসূল (সা) কে সরাসরি বলে, বনি কাইনুকা গোত্রের লোকেরা আমাকে সব সময় সাহায্য করছে। আপনি কি তাদের হত্যা করবেন?

নবীজী বললেন : 'আমি তাদের প্রাণদণ্ড দেব না।'

রাসূল (সা) মদীনা নগর রাষ্ট্রের প্রধান। এখানে মুসলিমদের একটি দল আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইয়ের নেতৃত্বে ছিল। তারা সরাসরি নবীর বিরোধিতা করত না। তবে তারা ছিল ইহুদীদের বন্ধু এবং মুনাফিক।

নবীজী আনসার হত্যার জন্য অপর ইহুদীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন কিন্তু তা তিনি দিলেন না।

মুসলিম হত্যার পরিবর্তে ইহুদীর প্রাণদণ্ড দিলে তাতে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পাবে। মদীনা নগর রাষ্ট্রের ভেতরের সংহতি তাতে মারাত্মক ব্যাহত হবে। তাই নবীজী প্রাণদণ্ডের বিধান কার্যকর করলেন না। তবে তাদের এর চেয়ে কঠিন শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। সাহাবাদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শও করলেন।

খুনের উৎপত্তি এক মুসলিম নারীর নেকাব হরণ। তাই ইহুদীদেরও নেকাব হরণ অর্থাৎ তাদের জাতিসত্তা অর্থাৎ পতাকার অবনমন করতে হবে।

তিনি বিধান দিলেন বনি কাইনুকা গোত্রের সকল ইহুদী তাদের বাসস্থান মদীনা ছেড়ে চিরতরে চলে যাবে। তাদের বাসস্থান ও অর্থসম্পদ সবকিছু রেখে চলে যেতে হবে এক বস্ত্রে, গোত্রীয় পতাকা অর্থাৎ স্পর্ধার নেকাব খুলে।

ইহুদীরা বাধ্য হয়ে তাদের গোত্রীয় পতাকা– তাদের নেকাব খুলে মদীনা ছেড়ে চলে গেল দূরে। ■

www.pathagar.com

তোমার কথাই মনে পড়ে ॥ সোলায়মান আহসান

যখনি কোথাও মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারে
আদিম কলা-কৌশল প্রয়োগ দেখি,
দেখি শক্তিধর কতো পাশব হতে পারে শক্তিহীনের ওপর
তখন তোমার কথা মনে পড়ে।

যখনি দেখি ছিন্নভিন্ন বসনিয়া, রক্তাক্ত কাশ্মীর, প্রজ্বলিত ইরাক
রোরুদ্যমান সোমালিয়া, হতভাগ্য চেচনিয়া, আহত আলজেরিয়া
হতমান তুর্কী, বিধ্বস্ত আফগানিস্তান, উদ্বাস্তু আরাকান
আর পৃথিবীর ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তু শিবিরে মৃত্যুর কাৎরানি
তখন তোমার কথা মনে পড়ে।

যখনি দেখি কূটনীতির ধারাল ছুরিতে স্থানে স্থানে
মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরে খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে
বিভক্ত করা হচ্ছে তাদের মানচিত্র
আর নানা অজুহাতে চালানো হচ্ছে নির্যাতন–
অস্ত্রের মহড়া, মহাসমরের;
তখন তোমার কথাই মনে পড়ে।

যখনি দেখি সম্পদের চূড়োয় বসে আত্মপরিচয় বিস্মৃত মুসলিম
শিরাক, পুতিন, জর্জ বুশ কফি আনানের আশ্বাসে
নিশ্চিত ঘুমে নিরুত্তাপ– আর করমর্দনে এমন হাসি ছড়ায়
যেনো পরম বন্ধুর সাহচর্যে কতোই না তৃপ্ত!
অথচ কুরআনের বাণী– বিধর্মীদের বন্ধুত্বে বিশ্বাসী হয়ো না!
তখন তোমার কথাই মনে পড়ে নবীজী!
তোমার কথাই মনে পড়ে!

আমরা সোয়াশ' কোটি মুসলিম জনতা–মিল্লাতে ইব্রাহীম
বড় অসহায়, স্থানে স্থানে লাঞ্ছনা আর রক্তপাতের মধ্যে
আমাদের দিন ও রাত্রির পরিক্রমা– দুঃখময়;
আমাদের জীবনে শুধু পরাজয়– রক্তপাত, বীভৎসতা
আমরা কি তাহলে পরাজিতের ইতিহাস হবো?

www.pathagar.com

হে নবী! আখেরী নবী! উম্মতের এই নিদান কালে
আপনি আমাদের রবের কাছে দরখাস্ত পেশ করুন–
যেনো আমাদের উদ্ধারে একজন ইমাম পাঠান
যিনি আমাদের সমূহ ধ্বংস হতে উঠে আবার জিহাদে
সামিল করবেন– সেই জিহাদ– যা ফত্‌হুম মুবীন দেবে।

সালাম তোমাকে ॥ মুকুল চৌধুরী

মুহাম্মদ (তাঁর সমীপে দরুদ ও সালাম)
এ নামের মানবিক জোয়ারের ঢলে মানুষের মুক্তির পতাকা
প্রথম উড়েছে এক দুরূহ বিশ্বাসে
যেমন উড়তে পারে পাখিদের ছানাগুলো মায়েদের পাখার ছায়ায়
উপদ্রুত শহরের নীরবতা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে কিশোর যেভাবে তার
ভাবনায় মুক্তপক্ষ স্বপ্ন ছড়ায়।

মানুষের হাত দুটো হয়েছে কী এতোটা উদ্বাহু
যতোটা মদীনা থেকে হয়েছিলো নবীজীর উর্ধ্বমুখী হাত
পবিত্র যে হাতে তিনি অনায়াসে পিষেছেন সংখ্যাহীন অন্ধকার রাহু।

মানুষের ভালোবাসা এতোটা কী পেয়েছে কোন প্রসিদ্ধ হৃদয়
যেমন 'নবীজী' 'নবীজী' এই শব্দের প্রতিধ্বনি জনে জনে অশ্রু হয় কাজল চোখের,
অনন্তর বাতাসের সাথে মিশে প্রকৃতিতে ছড়ায় সুবাস।
এ নামের ওসিলায় আলোকিত সত্তার কাছে ঘূর্ণিবেগে
মানুষের প্রার্থনার ভাষাগুলো বিগলিত করুণায় গ্রাহ্যতা পায়।

মুহাম্মদ (তাঁর সমীপে দরুদ ও সালাম)
এ নামের সাথে মিশে আছে মানুষের কী যে এক সীমাহীন প্রত্যাশার বিভা!
একটি জীবন দিয়ে শুরু হলো, শেষ হলো– ভাঙচুর হলো সব
অনাচার-অত্যাচার নষ্ট অপয়া। উদ্দাম হাওয়ায় ভেসে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো পৃথিবীর সকল খবর, শেষ হলো ধ্যানভঙ্গ হেরার উতলা।

মুহাম্মদ (তাঁর সমীপে দরুদ ও সালাম)
এ নামের সাথে মিশে আছে প্রগতির তৃষিত শিকড়
সহস্র শতাব্দীর এই জ্ঞানের ফসল সঠিক অন্বিষ্টে যারা করতলে নেয়

www.pathagar.com

নিশ্চিত তারা হবে আকাঙ্ক্ষিত জীবনের সফল বাসিন্দা।

তখন তো মানুষের জীবন ছিলো চাকুর ডগায়
মানুষের হাতে ছিলো মানুষেরই মৃত্যু আর জীবন পাহারা
শক্তিহীন মার খায় শক্তিবান মারে, নারীর অবলা রূপ আরও যে করুণ
গৃহের মূক পশু হতে পারে শুধু এর যোগ্য উপমা
মুহাম্মদ (তাঁর সমীপে দরূদ ও সালাম)
এ নামের সম্পন্ন মানুষ এসে ফিরিয়ে দিলেন সব রুদ্ধ স্বাধিকার।

এখন এখানে এই আমাদের গাঙ্গেয় বদ্বীপে
আমাদের পদ্মা-মেঘনা-সুরমার উপকূলে নিকষ আঁধার,
মানুষের শ্বাস থেকে উবে গেছে সকল সুবাস
কোথায় কোথায় সেই ঝলসিত কোষমুক্ত বাহু!

আমার নিঃশ্বাসে আমি একটি সুবাস পাই সময় সময়
আমার হাতের মাঝে স্পর্শ পাই পবিত্র হাতের
চোখের তারায় দেখি নূরের মিহিন ঝিলিক
পাতায় পাতায় গাঁথা সহস্র উজ্জ্বল পংক্তিতে হতাশায় সুখ খুঁজি আমি।

এমন ঘ্রাণের জন্য দাঁড়িয়ে ভিজবো আমি অনাগতকাল
এমন স্পর্শের জন্য শাদা করোটির মতো রুক্ষ হাওয়ায় তাপদগ্ধ হবো
চোখের কাজল তারা শুষ্ক এই জনপদে শিরদাঁড়া খাড়া করে
দূর-দিগন্তের দিকে থাকবে তাকিয়ে আজন্ম আগ্রহে।

সোনালী পাতায় গাঁথা পবিত্র অক্ষরগুলো হৃদয়ের খুব কাছে আছে
আমার কানের শ্রুতি সততঃ পানির শব্দে শুনেই চলেছে
হিমালয় পাহাড়ের সানুদেশে ধ্যানমগ্ন পাথরের কোলাহল চিরে
দিনরাত ঝিঁঝিরা কীভাবে জানান দেয়, হে নবীজী সালাম তোমাকে!

হযরত মুহাম্মদ ॥ আহমদ আখতার

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

ভাষা ছিলো শুদ্ধতম। শব্দের সাবলীল বোধ
কবিতার দরোজা ছাপিয়ে
মহাকাল রাখে করতলে।

অনুতপ্ত মোম গলে...

www.pathagar.com

আঁধারের গ্লানি মোছে
কান্নার নিঃশব্দ প্রপাত
দুঃখভারাক্রান্ত আদম সম্বিত ফিরে পান
নবীজীর নামে।

অনন্ত আকাশ ডাকে, খুলে যায় জান্নাত বাগান।
জিব্রাইল ত্রস্তপদ।
অথচ আপনার দ্রুততর উত্থান
নিমেষে পেছনে রাখে সর্বোচ্চ আকাশ খিলান
আল্লাহর শাশ্বত কালাম ধরে রাখে সে আলেখ্য
অনির্বাণ, অনন্ত বিস্ময়ে।

পুনরুত্থানের সুর ॥ মাহফুজ পারভেজ

একবিংশের অসহায় কাহিনী লিখতে লিখতে মনে হল
আমাকে বাঁচাতে আমি যেন দিগ্‌বিদিগ পালিয়ে বেড়াচ্ছি ...

মেঘ পালায় বৃষ্টির বুকে
বাতাস অরণ্য অববাহিকায়
ঢেউ সৈকতে কিংবা বেদনাদগ্ধ, মননে :
হায় মনন! বেলাভূমির সর্পিল বালির খেলাঘর যেন!!
মতবাদ আর আদর্শের কতগুলো তথাকথিত তাসের ঘর
মিথ্যা হাওয়াই মিঠাইয়ের মত প্রবঞ্চক !!!

এই তো আজকে
মানবাধিকার বলে চিৎকার করা মুখের ভিতরে
লুকানো ড্রাকুলা দাঁত মানবতার তাবৎ অস্তিত্বই খেয়ে নিল।
মরুভূমির বাস্তব মঞ্চে শীতপ্রধান দেশের জান্তব শূকরেরা
শরীরের আরাম কামাতে চাটছে রক্তের আইসক্রিম!!
তাদের আধুনিকায়নের (!) কাঁচামাল এখন মানুষ...

ভণ্ড আদর্শবাদের নেংটো ছবিটি দেখে
মানুষ আর মানবতার আতংকিত উর্ধ্বশ্বাস দৌড়...
অতএব একবিংশের অসহায় মানব কাহিনী হয়ে

www.pathagar.com

পালাচ্ছি আমি ও সামগ্রিক মানব প্রজন্ম...

এ রকম পলায়নপরতার কথা ইতিহাসে এসেছে অনেকবার
শেষবার পবিত্র মক্কায়–
নারী, শিশু, অসহায়, নিঃস্ব, রক্তাক্ত মানবতার কোরাস ক্রন্দনে
হে মহান খোদা, তুমি ঢেলে দিয়েছিলে শান্তির শীতল জমজম
তোমার হাবীব আমার নবীর পরশ-পাথর টানে
মানবিক কষ্ট-গাথা শেষে এসেছিল
আলোকিত উত্থানের বহু প্রত্যাশিত ভোর :
সবুজে-শ্যামলে-শান্তিতে-আনন্দে মানুষ ও পৃথিবীর প্রিয় জাগরণ ...

সকল প্রশস্তি আল্লাহর আর সালাম তোমার প্রতি হে রাসূল
মুক্তির আলোয় দাও আঁধার-বিনাশী পুনরুত্থানের সুর
তোমার ব্যথিত উম্মাতকুলের বিভ্রান্ত হৃদয়ে আর
পৃথিবীর অলিন্দে অলিন্দে... ।

আলো-ইশারা ॥ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

পথের টানে সে কি গো জানে কোথায় চলেছে ভুলে
কোন্ সমুদ্রে দূর সীমানায় এসেছে পাল তুলে?
এখন শুধু দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পথের নিশানা নেই
কোথায় বন্দর! নোঙর কোথায়— নেই জানা নেই।
অনেক যুগের কৃষ্ণপহর দীর্ঘ হয়েছে ঢের
ফুটবে যে কবে ভোরের আলো প্রদীপ্ত হয়ে ফের?
তবু পথচলা— নিঃসীম কালো অনন্ত আঁধিয়ার
জাগবে আবার প্রাণ-উল্লাসে যাত্রীরা দরিয়ার?

অকূল পাথারে অন্ধ সাঁতার যুগে ও যুগান্তরে
উদ্‌ভ্রান্ত-শ্রান্ত পথিক মাথা ঠুকে শুধুই মরে।
রাহা খুঁজে ফেরে দীর্ণবক্ষ লক্ষ বেভুল পথিক
ঘোর আঁধারে স্বপ্ন হারায়ে বেহুঁশ দিক-বিদিক।
ভুলেছে লক্ষ্য— কোথায় জাগে হেরার তোরণ-দ্বার
রাসূলের পথ : আলো-ইশারা, আলোকের সম্ভার।

www.pathagar.com

সে পবিত্র নাম ॥ দেলওয়ার বিন রশিদ

স্বাচ্ছন্দের ছড়াছড়ি
হৃদয়ে সবুজ উষ্ণতা
সুনীল আকাশে
চাঁদ উদ্ভাসিত

শান্তির ঐশ্বর্য
ঝরে পড়ে
        থরে থরে,
কষ্ট যন্ত্রণা
মুছে যায়
        এক লহমায়
পত্র পল্লব
দুলে ওঠে
জেগে ওঠে
নক্ষত্ররাজি
সুখ সৌরভে
হৃদয় পূর্ণ
        হয়ে যায়
যে পবিত্র নামে
সে পবিত্র নাম
        'মুহাম্মদ'

সাল্লাল্লাহু
        আলায়হি
                ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

ফুটলো গোলাপ ফুল ॥ আনোয়ারুল ইসলাম

মরুর ঐ গুলবাগিচায় ফুটলো রে আজ
ফুটলো গোলাপ ফুল।
যেন তাই উঠলো মেতে বিশ্বনিখিল
পায় না খুঁজে কূল।
ওরে আজ ফুটলো গোলাপ ফুল ॥
সে ফুলেরই মধুর লাগি
মন-ভোমরা হয় বিবাগী,
(তার) খোশবু মেখে উঠলো গেয়ে
পাপিয়া বুলবুল।
বুঝি পাপিয়া বুলবুল ॥
নীল আকাশের চন্দ্রতারা
তাঁহার ধ্যানে আত্মহারা,
(সেই) ফুলের মালা রাখবো গলায়
করবো কানে দুল।
আমার করবো কানে দুল ॥
যার রঙে ঐ পুব আকাশে
রঙিন হয়ে সূর্য হাসে,
(আজ) হৃদয় খুলে তাঁহার তরে
গাও দরুদ বিলকুল।
মোমিন গাও দরুদ বিলকুল ॥

www.pathagar.com

সমুদ্র হয় আদিগন্ত ॥ জাকির আবু জাফর

আমার ভেতর ঘুমিয়ে থাকা, আবীর মাখা
সেই আকাশে, তোমার নূরের জোছনা যখন
পর্দা খুলে দাঁড়িয়েছিলো
এই পৃথিবীর সব কিছুকে তুচ্ছ ভেবে, মুগ্ধ মনে একাগ্রতায়
তোমার প্রেমের রৌশনীতে ডুবিয়ে যেতে
ব্যাকুল দুহাত বাড়িয়েছিলো।
মনের ভেতর অথৈ নদী, দুপাড় ভেঙে সমুদ্র হয়
আদিগন্ত সাগর বুঝি ছড়িয়ে পড়ে প্রেমের বিভায়
এ কোন প্রেমে উথলে উঠে ঢেউ ছলোছল-
এ কোন প্রেমে বিভোর আমার অসীম ধরা
এ কোন প্রেমে মন হয়ে যায় চাতক পাখি
তোমার ভালোবাসায় উজ্জ্বল আমার আকাশ
এবং আমার মনের মহল।

কেমন ছিলো তোমার পথের সেই ধুলিরা
তোমার ঘামে যাদের হৃদয় সিক্ত হতো
সেই মরুনীল যে নীল ছুঁয়ে বিভোর হাওয়া
উড়িয়ে নিতো হেরার সুবাস
কেমন ছিলো হেরা গুহার বুকের গহিন
যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলো তোমার আঁখি
ও হেরা কী বলতে পারো
সেই ক্ষণিকের স্মৃতির প্রকাশ।
তোমার স্মৃতির সব জানালা মুক্ত করে দেখাও দেখি-
কেমন ছিলো সেই নিরালা-নিঝুম রাতের নিঃশব্দতা
একা যখন তোমার বুকে ধ্যানী পুরুষ
কী ছিলো তাঁর মনের ছবি
কোন বেদনায় তোমার গুহায় অধীর হতেন
কেমন ঝড়ে উদ্বেলিত হৃদয় ছিলো
আমার এখন জানতে ভারি ইচ্ছে করে
কেমন দুখে অশ্রু ঢেলে বুক ভাসাতেন
প্রেমের নবী।

www.pathagar.com

সেই তায়েফের ধূসর বালি কেমন ছিলো
উষ্ণ খুনের তরঙ্গ স্রোত বইলো যখন বালির বুকে
কাঁপছিলো কী থরোথরো এই পৃথিবী
কে জানে কী অবাক চোখে তাকিয়েছিলো
আকাশ জমিন
মূর্খ এবং গোমরা মানুষ বুঝলো না কী জঘন্য কাজ
অনায়াসে ঘটিয়ে দিলো। আহা তিনি একলা কেবল
দাঁড়িয়েছিলেন দৃপ্ত পায়ে, জাহেলিয়াত ধ্বংস করার সাহস বুকে
আলোর দিকে ডাক দিয়েছেন
সংগী বিহীন।

ভেঙে দিলেন সব ব্যবধান উঁচু কিংবা যেসব নীচু
এমন মানুষ, তাঁর তুলনা দেবার মতো নেই তো কিছু।

না'ত ॥ রফিক রইচ

আমার নবী মহান নবী
মানবতার মুক্তির রবি
যাঁর প্রেমে দুস্থ পায়
বাঁচার ছবি।

এই নবীকেই সৃষ্টি করায়
সৃষ্টি হলো সব
বন বনানী আর বনের হরিণ তাই তাঁর নাম যপে
করে পাখি কলরব
বিশ্বালয়ে যাঁর তুলনা নাই
তাঁর উম্মত হয়ে নাচে গ্রহের সবি।

এই মানবের মুখটা দিয়ে
আসলো ধরায় কোরানখানি
তার বিধানই কুল মাখলুকাতের
মহা মুক্তির খনি
আসমানী শ্রেষ্ঠ এই কিতাবখানি
জানে মানে মানুষ আর পৃথিবী ॥

www.pathagar.com

বসতিহীন ছায়া মেঘ ॥ ওমর বিশ্বাস

শেষ রাত্রি ঘুম ভাঙে সেই সুর ধ্বনি শুনে শুনে
ডেকে যায় বারেবারে মন ভোর হলো যার গুণে
অবিরত মায়াময় চেতনার অবেলা কিশোর
মোনাজাতে ডুবে থাকে সমর্পণে আশায় বিভোর

জাগতিক খটখটে সময়ের হাত ধরে চলে
ব্যতিব্যস্ত ফিরে চলা সুখময় খুঁজে নেয় বলে
অনুতাপে শুদ্ধ হয় মনহীন উত্তাল আবেগ
ভেঙে দেয় নীরবতা বসতিহীন ছায়া মেঘ।

দেখ এই শুভ রাত্রি কোথায় কেমনে যেন উড়ে
ক্ষয়ে চলে পাপের যে কালোক বেদনা বাসনায়
সমস্ত শহরময় একজন বেঁচে ব্যবসায়
বেরোয় আজানা সুর ফিরে আসে বার বার ঘুরে

নগরীর নীল নখে ডুবে থাকে অপাপ আমার
সুবহে সাদিকে দেহে তুলে ধরি হাত প্রার্থনার।

ইতিহাস কয় ॥ ফজলুল হক তুহিন

ইতিহাসে
        আমাদের হায়
                ভুল হয় বারবার
পৃথিবীর ঘাসে
        তাই
                আমাদের রক্ত ঝরে, ঝরে হাহাকার।

হাজার বছর
        কেটে যায়
                তবু কাটে না আঁধার

www.pathagar.com

নিজেদের
        পাপে-তাপে হায়
                শুধু অদ্ভুত সাঁতার।
একবার
        তবু তাঁকে
                করি না স্মরণ
জীবনের
        বাঁকে বাঁকে
                ঢেউ খ্যালে ঘাতক ক্ষরণ!

সব কিছু বুঝি
        বুঝি না শুধুই
                বিশ্বাসের করুণ মরণ
সব কিছু খুঁজি
        খুঁজি না শুধুই
                আলোকিত রসূল জীবন।

আর তাই
        ইতিহাস কয়
                আমরা ছিঁড়েছি মূল
পরিচয়
        ঠিকানা আশ্রয়
                হারিয়ে বসেছি হে রসূল!

তবু আশা আছে
        ভালোবাসা আছে
                একদিন নিশ্চয় পাবো তোমার উপকূল ॥

www.pathagar.com

নবীজী (সা) ॥ মহিবুর রহিম

সমগ্র জগত আর সমস্ত সময় একটি রেশম পোকার গুটি হয়ে আছে
যুদ্ধ ক্ষুধা বঞ্চনা অন্যায় সবই সপ্রাণ তার ভেতরেই সক্রিয় আছে
কিন্তু সময় ফেরাউনের পরিত্যক্ত প্রাসাদে আর যেন দম নিতে পারছিল না

জঅজিরাতুল আরবের বালির তৃষ্ণার পাশে জমজমের পানির শব্দকে
ঘূনের কর্তনের শব্দ মনে করে বিশ্বাসী এক ইহুদীও রাত জেগে নক্ষত্র দেখে
তাদের কুসীদবৃত্তি তাদের ঘুমন্ত বিছানার পাশে বিষাক্ত সাপের ফনার মতো
মক্কার কোরেশের ধারালো কুড়ালের জমাট কালো রক্তের মতো রাত্রি আরো ঘোর হয়ে ওঠে
ওকাজের মেলার পাশে সময়ের গর্তে এক বালিকার 'আব্বা আব্বা' বলে ভয়াবহ চিৎকারে
খর্জুর বীথির বনে বাজপাখির শোকের মতো সামান্য কুয়াশা ঝড়ে পড়ে

তবু প্রতিহিংসা পরায়ণ গোত্রগুলো অন্তত এক গ্লাস রক্তের প্রতিশোধ পান করার জন্যে
তাদের উষ্ট্রির পিঠে চাবুক হেনে 'সাবআ মুয়াল্লাকায়' একবার দৃষ্টি ফেলে যায়
আর সময় থমকে থাকে যেন একটা রেশম পোকার গুটির মধ্যে এ পৃথিবী আটকা পড়ে আছে
আমার নবীজী (সা) হেরা গুহার আলোকপ্রভা আর বুননের কর্মস্পৃহা নিয়ে বেরিয়ে এলেন

রেশমের গুটি ভেঙ্গে তিনি পৃথিবী বুননের এক ঐশি সূতা বের করে শুধু বললেন–
'বিশ্বাস করো'। নবীজীর উচ্চারণে শ্বাসরুদ্ধকর শয়তান চামচিকে হয়ে উড়ে গেল
আর মক্কার দাম্ভিকেরা নিজেদের ধারালো অস্ত্রের ঝিলিকে দেখলো তাদেরই কর্তিত মুণ্ডু

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সা)-এর মৃত্যু-দর্শন

মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন

□

মরণ থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি,
যদিও সুদূর আকাশ পারে
লুকাও সেথা লাগিয়ে সিঁড়ি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুখনাশককে বহুবার স্মরণ কর'। জিজ্ঞেস করা হলো, ও কি? তিনি বললেন, 'মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু'।

–তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ

মৃত্যুর শাব্দিক অর্থ: মৃত্যুবরণ করা, বন্ধ হয়ে যাওয়া, থেমে যাওয়া। যেমন, বাতাস থেমে গেল। আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

প্রচলিত অর্থ: কোনো প্রাণী মৃত্যুবরণ করা, প্রাণ চলে যাওয়া এবং নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া।

পারিভাষিক অর্থ: "আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা" –কুরআনুল করীম, পৃ. ১৩৯১

মৃত্যুর উদ্দেশ্য: "পরম করুণাময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলে (কর্মে) শ্রেষ্ঠ। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।" –সূরা আল–মূলক ৬৭: ১-২

মৃত্যুর গুরুত্ব: মানবজীবনে মৃত্যুর গুরুত্ব অপরিসীম। কালামে পাকে মৃত্যুকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদীসের সংকলন গ্রন্থে, ফিকহ শাস্ত্রে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে, এমনকি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে-এর দিকনির্দেশক প্রচুর উপাত্ত সমাহৃত হয়েছে। মৃত্যুকে জয় করার জন্যে যুগ যুগ ধরে মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু মৃত্যুর দুর্বার পথযাত্রা মুহূর্তের জন্যেও থেমে যায়নি।

মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মৃত্যু 'আলমে বরযখের প্রবেশদ্বার এবং 'আলমে আসবাবের পরিসমাপ্তি। পরহেযগার বান্দাহর মুক্তির উপায়, আল্লাহর সাথে মিলনের প্রতিশ্রুতি পূরণের নির্ধারিত সময়।

মুমিনের জন্যে মৃত্যু জান্নাত লাভের অসীলা, সমস্ত পাপের বিনিময় (সগীর, হাদীস

www.pathagar.com

শরীফ, পৃ ১৫০)। দরিদ্রের পক্ষে শাহাদাত (সগীর, হাদীস শরীফ, পৃ ১৫০)। মুমীনের জন্যে একটা অনুগ্রহ (বায়হাকী, হাদীস শরীফ, পৃ ১৫০)।

আল্-কুরআন ও মৃত্যু

মৃত্যুর তাৎপর্য ও রহস্য, মৃত্যু ও মানুষের অসহায়ত্ব, মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুর সময়, মৃত্যু ও জীবন, মৃত্যু ও 'আমল, মৃত্যু ও দুনিয়া, মৃত্যু ও আখিরাত, মৃত্যু ও 'আমলের পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে কালামে পাকের নিম্নোদ্ধৃত সূরা ও আয়াতে :

সূরা সাজদাহ ৩২: ১০-১, আয়াত,
সূরা ওয়াকি'আহ ৫৬: ৬০, ৮৩-৯৪ আয়াত,
সূরা 'আনকাবুত ২৯: ৫৭ আয়াত,
সূরা জুমু'আহ ৬২: ৮ আয়াত,
সূরা 'আবাসা ৮০: ১৭-২৩ আয়াত,
সূরা নুহ ৭১: ৪ আয়াত,
সূরা কিয়ামাহ্ ৭৫: ২৬-৩০ আয়াত,
সূরা ক্বাফ ৫০: ১৯ আয়াত,
সূরা মুনাফিকুন ৬৩: ১০-১১ আয়াত,
সূরা আল্-মুলক ৬৭: ২ আয়াত,
সূরা আল্-লাইল ৯২: ১১ আয়াত,
সূরা হুমাযাহ ১০৪: ২-৪ আয়াত,
সূরা আন্-নাযি'আত ৭৯: ১-২ আয়াত,
সূরা আল্-আন'আম ৬: ৬০, ১৩৩-১৩৪ আয়াত,
সূরা আদ্-দাহর ৭৬: ২ আয়াত এবং
সূরা আল-মু'মিন ৪০: ৬৭ আয়াত।

কুরআনের অন্যান্য সূরা এবং আয়াতেও বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতন, মানুষের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন, হিদায়াত, উপদেশ বা তিরস্কার, দুনিয়া ও আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে মৃত্যুর আলোচনা পুনঃ পুনঃ এসেছে।

মৃত্যুর শ্রেণীবিভাগ

১। স্বাভাবিক মৃত্যু

২। অস্বাভাবিক মৃত্যু যেমন, ক. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শহীদ পাঁচ ব্যক্তি :

(১) যে মহামারিতে মারা গেছে,
(২) যে পেটের পীড়ায় মারা গেছে,

www.pathagar.com

(৩) যে পানিতে ডুবে মারা গেছে,

(৪) যে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গেছে এবং

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে মারা গেছে।”

–মুত্তাফাকুন আলাইহ। মিশকাত, খ. ৪, হা. নং ১৪৬০

হজরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কাকে শহীদ গণ্য করে থাক? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা তাকেই শহীদ বলে গণ্য করি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ ত্যাগ করে। হুযুর (সা) বললেন, এমতাবস্থায় আমার উম্মাতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অতি নগণ্য হবে। (সুতরাং তোমরা জেনে রাখ) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায় সেও শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায় সেও শহীদ।–মিশকাত: ৭ম খ., হা. নং ৪৫১০, পৃ ২৪৩।

(৬) দ্বীনের দুশমনীর কারণে মৃত্যু

(৭) শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনজনিত মৃত্যু

(৮) শরীয়তের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু

(৯) আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু

(১০) আযাব ও গযবে মৃত্যু

(১১) কিয়ামতকালীন মৃত্যু

(১২) রোগভোগজনিত মৃত্যু

(১৩) বিবিধ।

শ্রেষ্ঠ মৃত্যু

বিভিন্ন শ্রেণীর মৃতুর মধ্যে শাহাদাতই লাভই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে (অন্যান্য মৃতের ন্যায়) মৃত ধারণা করো না, তারা পরিতুষ্ট ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহতা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, আর যারা তাদের নিকট পৌছেনি, পেছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে, ওদের অবস্থার প্রতিও তারা (শহীদানরা) সন্তুষ্ট হয় যে, তাদেরও কোনো ভয়-ভীতি ঘটবে না এবং তারা বিষণ্ণও হবে না। তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে, আর এ জন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।”–সূরা আল-ইমরান ৩: ১৬৯-১৭১

হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের দু'আ করেছে এবং তারপর

www.pathagar.com

তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে বা তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে। - আবু দাউদ তিরমিযী

আর এই বিষয়বস্তুরই শুহাল বিন হুনায়ফ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 'যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে শাহাদাতের দু'আ করেছে যদিও সে নিজ বিছানায় মরে তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন।" -পথের সম্বল, হা. নং ২০২

"হযরত সা'ঈদ বিন জাবাল (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি : যেসব লোক নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারা শহীদ। আর যেসব লোক নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ। আর যেসব লোক নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ।"-আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ।

সুওআয়দ বিন মুবারবিন-এর যে বর্ণনা এ প্রসঙ্গে নাসাঈতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

"যেসব লোক কোনো অত্যাচারীর নিকট থেকে নিজের অধিকার নিতে গিয়ে নিহত তারাও শহীদ।"-পথের সম্বল-হা. নং ২০৪, পৃ. ২৪৯।

যে মৃত্যু নবী (সা)-এর পছন্দীয় ছিল

"হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর মুঠির মধ্যে আমার প্রাণ। যদি কিছুসংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করা আদৌ পছন্দ করতো না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না বলে আশঙ্কাও হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই; তারপরও পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই।"-বুখারী, খ. ৩, পৃ. ২৯; হা. নং ২৫৮৯

শাহাদাতের আকাঙ্খা

ওফাতের কিছুদিন পূর্বে হযরত খালিদ (রা) বলেছিলেন, "আমি আমার জীবনে প্রায় তিনশ' (অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ'র বেশি) যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার শরীরের প্রতিটি অংশ তীর, তরবারি এবং বর্শার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু শাহাদাত ভাগ্যে জোটেনি। আর আজ বিছানায় উটের মত জীবন দিচ্ছি। আল্লাহ বুজদিলদেরকে কখনো শান্তি দেন না।"-বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খ. পৃ. ২ ৫৮

হযরত আমর (রা) "আল্লাহর পথে জিহাদে অকুতোভয় ছিলেন। রাসূল (সা) এর যুগে এবং তারপরও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ে তিনি জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ

www.pathagar.com

করেছেন। সব সময়ই শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনের বীনায় বাজতো। এজন্যে প্রত্যেক যুদ্ধেই শত্রুর বুহ্যে অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়তেন এবং বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করতেন। আজ-নাদাইনের যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর ভাই হিশাম (রা) সারারাত শাহাদাত প্রাপ্তির দু'আ করলেন। পরের দিন হজরত হিশাম (রা) যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। আর তিনি বেঁচে রইলেন এবং শাহাদাত থেকে মাহরুম থাকার কারণে আজীবন দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, হিশাম আমার থেকে আফজাল ছিলেন। এ জন্যে তার শাহাদাতের দু'আ কবুল হয়ে গেল।"–বিশ্বনবী (সা)–এর সাহাবী, ১ম খ., পৃ. ৩ ১২

শিশু সন্তানের মৃত্যু জান্নাত লাভের উপায়

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "কোনো মুসলমান এমন নেই যার তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার আগেই মারা যায় আর আল্লাহ তাঁর রহমতের মাহাত্ম গুণে ঐ সন্তানদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না'।–বুখারী, মুসলিম

মৃত্যু চিরস্থায়ী মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময় সহনশীল।" –সূরা হজ্জ ২২: ৫৮-৫৯

মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়

মিশকাত ৮ম খ., হা. নং ৪৪১৫

মুজাহিদদের মৃত্যু ভাবনামুক্ত

বুখারী ৩য় খ., হা. নং ২৮১৮, পৃ. ১৮২-১৮৩

মুজাহিদের মৃত্যু পাপ থেকে নিস্কৃতি ও জান্নাত লাভের উপায়

"–সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিস্কৃত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং জিহাদ করেছে ও শহীদ হয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবে এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে এমন বেহেশতে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে এবং (তারা) বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহরই তরফ হতে; আর আল্লাহরই নিকট উত্তম বিনিময় রয়েছে।"– সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৯৫

নির্যাতিত মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে আল্লাহ পাকের উদাত্ত আহ্বান

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। আর

www.pathagar.com

তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"– সূরা আন-নিসা ৪ : ৭৪-৭৫

মুজাহিদের মৃত্যু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, দয়া ও স্থায়ী শান্তির বার্তাবাহী

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ পাকের কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদিগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।"–সূরা আত্-তাওবাহ ৯ : ২০-২২

মৃত্যুর মাধ্যমে বান্দাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আখিরাতের নিয়ামাতের মধ্যে একটিকে বাছাই করতে আহ্বান জানানো হয়।

বুখারী : ৩য় খ., হা. নং ৩৩৮২, আধুনিক প্রকাশনী অনূদিত

আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী

সাবেত ইবনে দাহ্হাক নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে মিথ্যা শপথ করে তাকে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সেই অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে।"–বুখারী ১ম খ., হা. নং ১২৭৩, পৃ. ৫৫৪

মৃত্যু অনিবার্য

"প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, অতঃপর সকলকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।"–সূরা আনকাবুত ২৯ : ৫৭

মৃত্যু আনন্দদায়ক

ক. "মানুষ দুটি জিনিস ভালবাসে না–একটি মৃত্যু, যদিও তা মুমিনের পক্ষে বিয়ে করা অপেক্ষা উত্তম; অপরটি দারিদ্র্য, যদিও পরিণামে তার হিসেব সংক্ষিপ্ত হবে।"–মিশকাত, হাদীস শরীফ, পৃ. ১৫১

খ. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সা) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ফাতিমাকে ডেকে নেন। তিনি ফাতিমার কানে কানে কিছু বলেন। ফাতিমা কাঁদতে থাকেন। তখন তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আবার কানে কানে কিছু বলেন। এবার ফাতিমা

www.pathagar.com

হাসতে থাকেন। আমরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি (নবী সা-এর ইন্তেকালের পরে)। তিনি বলেন, নবী (সা) (প্রথমে) তাঁর কানে কানে বলেন, এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কাজেই এ কথা শুনে আমি কাঁদতে থাকি। তারপর তিনি আবার আমার কানে কানে বলেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি তাঁর সাথে মিলবো। এ কথায় আমি (আনন্দে) হাসতে থাকি।"–বুখারী, ৪র্থ খ., হা. নং ৪০৮৪

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না

"আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেননা তার মিয়াদ অবধারিত।"–সূরা আল্-জুমুআহ ৬২ : ৮

মৃত্যুস্থল মানুষের অজ্ঞাত

"কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে। না কেউ জানে তার মৃত্য কোন জমিনে হবে। আল্লাহ সবই জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল।"–সূরা লোকমান ৩১ : ৩৪

রাসূল (সা)-এর কবরের পাশে দাফন লাভ করেও মৃত ব্যক্তি নিজের পবিত্রতা বাড়াতে পারে না

হিশাম ইবনে উরওয়া (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় [নবী (সা)-এর রওজার] দেওয়াল যখন ধসে পড়ে তখন সবাই তা পুনর্নির্মাণ শুরু করলেন। হঠাৎ একটি পা বেরিয়ে পড়ল। সবাই এ ভেবে ভীত হয়ে পড়ল যে, এটি নবী (সা)-এর পা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক জানে এমন কাউকেই তারা পেল না। অবশেষে উরওয়া তাঁদেরকে জানালেন, আল্লাহর শপথ! এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পা নয়। বরং এটি অবশ্যই উমরের পা হবে। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা রা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে অসিয়ত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের [নবী (সা) আবু বকর ও উমর] পাশে দাফন করো না, আমার সঙ্গিনীদের (সতীনদের) সাথে বাকীতে দাফন করো। কারণ, ওঁদের পাশে দাফন করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাব না।–বুখারী, ১ম খ., হা. নং ১৩০১

মৃত্যুকাল পূর্ব নির্ধারিত

"আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই।"–সূরা আল-ওয়াকিয়াহ ৫৬ : ৬০

মানুষ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এবং আখিরাতের দিকে এগিয়ে চলছে

হযরত মালেক (রা) হতে বর্ণিত, হযরত লোকমান (আ) স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! মানুষের সাথে যে সমস্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, (যথা–মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার বা শাস্তি) তার দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। আর তারা পরকালের দিকে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। হে বৎস! তুমি যেদিন জন্ম 'নিয়াছ সেদিন হতে তুমি দুনিয়াকে পেছনে ছেড়ে আসছ এবং ক্রমশ আখিরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছো। বস্তুত যেই ঘরের দিকে (পরকালের দিকে) তুমি যাচ্ছো, তা ঐ ঘর অপেক্ষা তোমার অতি নিকটবর্তী, যেই ঘর হতে তুমি বের হচ্ছো (অর্থাৎ দুনিয়া হতে)।-মিশকাত, নবম খ., হা. নং ৪৯৯২

মৃত্যুকালে অবকাশ দেওয়া হয় না

"... নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে।"- সূরা নূহ ৭১ : ৪

কল্যাণকর ব্যয়ই মৃতের সম্পদ, রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশের

- রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খ., হা. নং ৫৪৫

মৃতের সঙ্গী তার আমল, আত্মীয়-স্বজন বা সম্পদ নয়

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃত লাশের সঙ্গে যায়। দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার সঙ্গে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল।-মিশকাত নবম খ., হা. নং ৪৯৪০

নেক আমল করার জন্যে হায়াত বাড়ানো হয় না

"যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাও যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা পূর্বে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"-সূরা আল্-মুমীমুন ২৩ : ৯৯-১০১

মৃত্যু থেকে পালিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুর পর দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়

"বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা দৃশ্য ও অদৃশ্যে জ্ঞানবান আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেসব কর্ম যা তোমরা করতে।" -সূরা আল্-জুমুআহ্ ৬২ : ৮

মানুষ ছোট ছোট বিপদকে এড়াতে পারে কিন্তু মৃত্যুকে নয়

মিশকাত, নবম খ., হা. নং ৫৩৮, ৫৩৯

www.pathagar.com

সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে লুকিয়ে থেকেও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও।"–সূরা আন্ নিসা ৪ঃ ৭৮

মূসা (আ)-এর মত শক্তিমান রাসূলও মৃত্যুকে নির্ধারিত সময়েই বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসার কাছে পাঠান হল। ফেরেশতা তাঁর কাছে এলে পর হযরত মূসা (আ) তাঁকে (ফেরেশতাকে) চপেটাঘাত করলেন। ফেরেশতার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। ফেরেশতা তার প্রভুর নিকট ফিরে গিয়ে বলে, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতাকে বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে বল, একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে। তার হাত যতটুকু জায়গার ওপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। এ কথা তাঁকে জানান হল। তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে পবিত্রভূমি (বায়তুল মাকদেস) থেকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এ সময় আমি যদি সেখানে (বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র এলাকায়) থাকতাম, তবে পথি-পার্শ্বে বালুর লোহিত ঢিবির কাছে তাঁর হযরত মূসার (আ) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।–বুখারী, ১ম খ., হা. নং ১২৫১, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা সংস্করণ

মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্ট

"আল্লাহ পাক আরও বলেন, যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল অগ্রবর্তী বা পশ্চাতবর্তী হতে পারে না।"– সূরা নহল ১৬ : ৬১

আল্লাহপাকের বন্দেগীতে বার্ধক্য অর্জনকারী মৃত্যুর পরও নেক আমল করার জন্যে পৃথিবীতে আসতে চাবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, একবার আ'যরা গোত্রীয় তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন : তোমাদের মধ্যে কে এদের দায়িত্ব নিতে পার? তাল্হা (রা) বললেন, আমি। (শাদ্দাদ বলেন) সুতরাং তারা তাল্হার নিকট থাকতে লাগল, এর পর একসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন, তখন তাদের (উক্ত তিন জনের) একজন ঐ সেনাদলের সাথে বের হল এবং যুদ্ধে শহীদ হয়ে

www.pathagar.com

গেল। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি সেনাদল পাঠালেন। এই দলের সাথেও দ্বিতীয় একজন বের হল এবং সেও শহীদ হল। এরপর (একদিন) তৃতীয়জন (স্বাভাবিক অবস্থায়) আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল। বর্ণনাকারী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, হযরত তাল্‌হা (রা) বললেন, এরপর আমি একসময় উক্ত ব্যক্তিত্রয়কে (স্বপ্নযোগে) বেহেশতের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং এও দেখলাম যে, আপন বিছানায় মৃত ব্যক্তিটি তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে শহীদ ব্যক্তিটি রয়েছে তার পেছনে, আর এর পেছনে রয়েছে প্রথম ব্যক্তি। (তাল্‌হা রা. বলেন,) তাদের এই ক্রমিক মানে আমার মনে একটু খট্‌কা জাগল। সুতরাং এই কথাটি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেন : কিসে তুমি আশ্চর্যান্বিত হলে? (জেনে রাখ!) যে ঈমানদার ইসলামের মধ্যে থেকে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহ্‌লীল আদায় করার জন্য অতিরিক্ত বয়সের সুযোগ পেয়েছে এমন মু'মিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কেউ উত্তম নয়।–মিশকাত, নমব খ., হা. নং ৫০৬৩

ষাট বছরাধিক কাল হায়াত পেয়ে মৃত্যুবরণকারীর ওযর পেশের সুযোগ নেই

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির ওযরের অবকাশ রাখেন নাই যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বৎসরে পৌঁছে দিয়েছেন।–মিশকাত, নবম খ., হা. নং ৫০৪২

মৃত্যুর পর কার সাথে কি আচরণ করা হবে তা কেউ জানে না

উম্মে 'আলা (রা) (যেসব মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বাই'আত নিয়েছিলেন, তিনি তাদের একজন।) বলেন, যখন আনসাররা মুহাজিরদের বসবাসের জন্যে লটারী দেয়, তখন ওসমান ইবনে মযউন আমার ভাগে পড়ে। সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রুষা করি। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়ে যায়। অতঃপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়ে কাফন পরিয়ে দিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এলে আমি বললাম, হে আবু সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা তুমি কিভাবে জানলে? আমি বললাম, খোদার কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন, তার তো মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। আমি তার ভাল কামনা করি। খোদার কসম! আমি জানি না, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। অথচ আমি আল্লাহর রাসূল! উম্মে 'আলা বলেন, খোদার কসম! এরপর আমি আর কারো প্রশংসা করব না। উম্মে আলা বলেন, আমি স্বপ্নে ওসমানের জন্য এক প্রবহমান ঝর্ণা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললাম। তিনি বললেন, এটা তার আমল, তার জন্যে জারী থাকবে।"– বুখারী ৬ষ্ঠ খ., হা. নং ৬৫৩২, আধুনিক প্রকাশনী, খ. বুখারী, ৩য় খ., হা. নং ৩৬৩৯, আধুনিক প্রকাশনী অনূদিত

www.pathagar.com

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ

"প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবশেষে মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ প্রতিফল কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি যে সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ এ দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।"– আল ইমরান ৩ : ১৮৫

মৃতের ক্রন্দন ধ্বনি মানুষ ছাড়া সবাই শুনতে পায়

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎ কর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল। আর যদি সে সৎ কর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায়! হায়! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া তার এ ক্রন্দন ধ্বনি সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চীৎকার করে উঠত।"–বুখারী, ১ম খ., হা. নং ১২৮৯, আধুনিক প্রকাশনী

মৃত্যু শুধু একবার

"আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর, আর আমাদের শাস্তিও দেয়া হবে না।"–সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ৩৭ : ৫৮- ৫৯

একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই সম্পদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। বস্তুত আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারে না; আর যে আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন।–মিশকাত, নবম খ., হা. নং ৫০৪৩

মৃত্যুর পর ফেরেশতা আমল অনুসন্ধান করে, ওয়ারিশ অনুসন্ধান করে সম্পদ

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়ে বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন : (এই ব্যক্তি) পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা (ওয়ারিশগণ) বলে, সে কি রেখে গেছে?– মিশকাত, নবম খ., হা. নং ৪৯৯১

মৃত ব্যক্তিকে সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাত বা জাহান্নামে তার আবাসস্থল দেখানো হয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখ অথবা বেহেশতে তোমাদের জায়গা দেখান হবে। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হ'ল জান্নাত এবং দোযখী হওয়ার উপযুক্ত হলে দোযখে তার জায়গা দেখান হবে। তাকে বলা হবে, এ হলো তোমার

www.pathagar.com

(উপযুক্ত) জায়গা। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করে উঠাবেন এবং এ জায়গা দান করবেন।"–বুখারী, ১ম খ., হা. নং ১২৮৮, আধুনিক প্রকাশনী

মৃত্যু পথযাত্রী মুমিনদেরকে মালাকুল মাউত সালাম জানান

হযরত ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মালাকুত মাউত (আযরাইল আ) যখন আল্লাহর মকবুল বান্দাহদের কাছে আসেন তখন তাদেরকে সালাম করে তিনি বলেন :

অর্থ– তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর ওলী! ওঠ এবং (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) যে বাসস্থানকে বিলীন করে দিয়েছ তা পরিত্যাগ করে সেই আবাসস্থলের দিকে চল (ইবাদাতের মাধ্যমে) যাকে তুমি আবাদ করেছ।–শারহুচ্ছুদূর 'মরণে কে বা'দ কেয়া হোগা'-এর বঙ্গানুবাদ 'মরণের পর কি হবে'? পৃ. ৩৪

কিভাবে ফেরেশতা রূহ বের করেন?

"তাদেরকে বল, 'মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নেবে। পরে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।"–সূরা আস্-সাজদা ৩২ : ১১

মৃত্যুর সময় আল্লাহপাক বান্দাহর অতি নিকটবর্তী হন

"অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না।" সূরা আল্-ওয়াকিয়াহ ৫৬ : ৮৩-৮৫

মৃত্যুযন্ত্রণা

"মৃত্যুযন্ত্রণা ও কবর আযাবের চেয়ে মানুষের বড় মুছিবত আর নেই। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'মৃত্যুর বিকার (কষ্ট) সত্যভাবেই উপস্থিত হবে"।–সূরা ক্বাফ, ১৯ আয়াত

যদি বুদ্ধি থাকে তবে মৃত্যুকে স্মরণ করে এর প্রস্তুতির জন্যে সর্বদা চিন্তা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ভোগবিলাস বিনাশকারী মৃত্যুর চিন্তা অধিক পরিমাণে কর। আমরা মৃত্যুযন্ত্রণার কথা যেরূপ জানি, পশু-পাখি যদি সেরূপ জানতো তবে আমাদের কারও ভাগ্যে স্থূলকায় পশু-পাখি মাংস খাওয়া সম্ভব হতো না, অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়ে তারা মোটা তাজা হত না। তিনি হযরত আনাস (রা) কে বলেছেন– তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুর চিন্তা কর, এটা তোমাকে পরহেজগার বানাবে, তোমার গুনাহ মাফ হবে। যে ব্যক্তি পরকালের চিন্তা করে দৈনিক বিশ বার মৃতুর চিন্তা করে সে শহীদের দরজা লাভ করবে।

খলিফা হযরত ওমার ইবনে আবদুল আজীজ (র) বলেছেন, অধিক পরিমাণে মৃত্যুর চিন্তা করলে তোমাদের দুটি উপকার হবে :

www.pathagar.com

ক. যদি তুমি দরিদ্র থাক, তবে তোমার মনে শান্তি ও ধৈর্য আসবে।

খ. আর যদি ধন-সম্পদে ডুবে থাক, তবে ধন-সম্পদের অলীক মোহ দূর হবে।

হযরত ঈসা (আ) মানুষ দেখলেই বলতেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা আমার জন্যে দু'আ কর, যেন আল্লাহপাক আমার মৃতুযন্ত্রণা সহজ করেন মৃত্যুযন্ত্রণা যে কি ভীষণ ব্যাপার তা বুঝতে পেরে আমি ভয়ে জীবমৃত হয়ে আছি।

মৃত্যুযন্ত্রণা এমন ভয়ঙ্কর যে, হযরত (সা) পর্যন্ত মৃত্যুর সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদের (সা)-এর উপর মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করুন।

পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করতে একমাত্র শহীদই চাইবে

হযরত মাসরুক (রা) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম :

অর্থ : যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত ধারণা করিও না বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকট হতে রিয্ক (খাদ্য) পেয়ে থাকেন। উত্তরে ইবনু মাসউদ (রা) বললেন : আমরা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন : তাদের (অর্থাৎ, শহীদদের) রূহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখীর প্রতিকৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্যে আল্লাহর আরশের নিচে ফানুস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তারা জান্নাতে যথেচ্ছা বিচরণ করে (এবং জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করে) পরে আবার ঐ সমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর তাদের রব তাহাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করতঃ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন; তোমাদের কোন বস্তুর আকাজ্ক্ষা আছে কি? উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কি জিনেসেরই বা আকাংক্ষা করব? অথচ আমরা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় বিচরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, যখন তারা দেখে যে, বার বার তাদেরকে একই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলে, হে আমাদের পরওয়া রদেগার! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের রূহগুলোকে পুনরায় আমাদের দেহের ভেতরে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জিহাদ করে আবার শাহাদাত লাভ করতে পারি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন দেখেন যে, তাদের কোনো জিনিসের আকাজ্ক্ষা বা প্রয়োজন নাই, তখন তাদের সাথে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন।– মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫০৩

শাহাদাতের মাধ্যমে নরহন্তাও নিষ্পাপ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হাসবেন। একে অপরকে হত্যা করবে এবং হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন এই কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে যেয়ে শহীদ হয়েছে। পরে হত্যাকারীকে আল্লাহও তাওবার (অর্থাৎ, ঈমানের) তওফীক দিয়েছেন। অতঃপর সেও শাহাদাত বরণ করেছে।– মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫০৬

www.pathagar.com

শাহাদাত প্রত্যাশী বিছানায় মৃত্যুবরণ করেও শহীদের মর্যাদা পায়

হযরত সাহল বিন হোনাঈফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে, আল্লাহতা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।– মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫০৭

যালিমের মৃত্যুযন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক

"ঐ ব্যক্তির তুলনায় বড় যালেম আর কে হবে যে, আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা বলে যে, আমার উপর কোনো অহী নাযিল হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তার উপর কোনো অহীই নাযিল হয়নি; অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মুকাবিলায় বলে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাবে। হায়! তুমি যদি যালেমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে, 'দাও, বের করে তোমাদের জান-প্রাণ। আজ তোমাদেরকে সে সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেওয়া হবে, আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে যা তোমরা অকারণ প্রলাপ বকছিলে এবং তার আয়াতে মুকাবিলায় অহংকার বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে।" –সূরা আন'আম ৬ : ৯৩

শাহাদাত অন্বেষণকারী সর্বোত্তম ব্যক্তি

সেই হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তির জীবনই সকলের চেয়ে উত্তম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে) নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠের উপর আরোহণ করে বসে আছে। যখনই সে কোনো ভীতিপ্রদ শব্দ কিংবা কোনো সাহায্য প্রার্থীত ফরিয়াদ শুনতে পায় তৎক্ষণাতই সে দিকে ছুটে যায় এবং কায়মনে অন্বেষণ করতে থাকে হত্যা এবং মৃত্যুকে। (অর্থাৎ শত্রুকে নিপাত করার জন্যে ছুটে বেড়ায় এবং নিজে শহীদ হওয়ার জন্যে মৃত্যুকে তালাশ করে) ফলে এমন এমন স্থানে সে নিজেকে উপস্থিত করে দেয়, তার ধারণা মতে যেই স্থানে সেই মৃত্যু ও শাহাদাত হতে পারে। আর সেই ব্যক্তির জীবনও উত্তম, যে পর্বতের চূড়ায় নিজের এক ক্ষুদ্র বকরীপাল লয়ে অবস্থান করে অথবা কোনো সমভূমিতে বকরী চরায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যথাযথভাবে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং নিজের রবের ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে। এই ধরণের লোক মানুষের মধ্যে শুধু উত্তমরূপে জীবন যাপন করে।– মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৪৯৫

শাহাদাত প্রত্যাশীর কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা অতি তুচ্ছ ব্যাপার

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা) স্বীয় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথিমধ্যে প্রতিপক্ষের শত্রুদলের হাতে তিনি বন্দী হন। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে বলে। অন্যথায় জ্বলন্ত

www.pathagar.com

ফুটন্ত ও উত্তপ্ত কড়াইয়ের তেলে নিক্ষিপ্ত করার ভয় দেখায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা) তাদের এ প্রস্তাব ঘৃণাঘরে প্রত্যাখ্যান করে। খৃস্টধর্মের ঐসব পাপীষ্ঠগণ উত্তপ্ত কড়াইয়ে তেল গরম করে তাদের সবার সামনে একজন সাহাবীকে নিক্ষেপ করে ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীর থেকে হাড্ডি-মাংস আলাদা হয়ে যায়। হযরত ইবনে হুজাফাকে খৃস্টান বাদশা বললো, তুমি এখন খৃস্টান হয়ে যাও অন্যথা তোমাকেও এভাবে উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা) এবারও তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বাদশা তার রাজকর্মচারীকে হযরত ইবনে হুজাফা (রা) কে দেখিয়ে বলে–তাকে ঐ উত্তপ্ত কড়াইয়ের সামনে নিয়ে যাও, যদি সে ভয় পায় তবে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তাঁকে কড়াইয়ের নিকট নিয়ে যাওয়া মুহূর্তে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলে লোকেরা বললো, সে ভয় পেয়েছে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি জীবন হারাবার ভয়ে কাঁদছি না বরং কাঁদছি এজন্যে যে, আমার একটিমাত্র প্রাণ, যদি শরীরের পশম পরিমাণ অগণিত প্রাণ থাকতো-তবে আমি একটি একটি করে প্রতিটি প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দিতাম। আমার একটি প্রাণ কি মহান আল্লাহ তা'আলার সামনে নাজরানা পেশ করার যোগ্যতা রাখে! একথা শুনে বাদশা খুব আশ্চর্যবোধ করলো এবং এ কারণে তাঁকে ছেড়ে দিল।–উসদুল গাবাহ-১৪৩/৩, মাসিক আল জামিয়া, অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ১৭

শাহাদাতের মৃত্যু যন্ত্রণামুক্ত

"হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কাউকে পিপিলিকা দংশন করলে যতটুকু কষ্ট অনুভূত হয়, শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার সময় একজন শহীদ ঠিক ততটুকু কষ্ট অনুভব করে থাকেন।"–মিশকাত

জিহাদের সংকল্পবিহীন ব্যক্তির মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যুর সমতুল্য

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা জিহাদের নিয়্যত ও সংকল্প না রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হল এক প্রকারের মুনাফিকদের (মৃত্যুর সমতুল্য)।–মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫১২

জিহাদের চিহ্ন ব্যতীত মৃত্যুবরণ ত্রুটিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি (শরীরে) জিহাদের কোনো প্রকারের চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে), তখন সে ত্রুটিযুক্ত দ্বীন নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।– মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫৩২

www.pathagar.com

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর যে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করুক শহীদ হিসেবে গণ্য হবে

হযরত আবু মালেক আশ্‌আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) বের হয়, তারপর যদি সে মরে যায়, কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয়, অথবা সে ঘোড়া কিংবা উটের পৃষ্ঠ হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, কিংবা কোনো বিষাক্ত প্রাণী তাকে দংশন করে সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে মোটকথা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর যে কোনো অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করুক না কেন, সে শহীদ বলে পরিগণিত হবে এবং তার জন্যে জান্নাত অবধারিত।–মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫৩৭

আল্লাহর রাস্তায় একরাতের পাহারাদারি মৃত পাপীর জান্নাত লাভের জন্যে যথেষ্ট

হযরত ইবনে আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা পড়বার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন জানাযা (সম্মুখে) রাখা হল তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রতিবাদস্বরূপ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন না। কেননা, লোকটি বদ্‌কার, পাপী। এই কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমাদের কেউ এই লোকটিকে ইসলামের কোন কাজ করতে দেখেছ কি? তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি এক রাতে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামাজ পড়লেন এবং নিজের হাতেই তার উপর মাটি দিলেন। এই সময় তিনি উক্ত মৃত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য করে বললেন : তোমার সঙ্গী-সাথীদের ধারণা যে, তুমি দোযখী। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি বেহেশ্‌তী। অতঃপর তিনি উমর (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন : হে উমর! তোমাকে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে দ্বীন-ইসলাম-সম্পর্কে।–মিশকাত, ৭ম খ., হা. নং ৪৫৫৭

মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘবকারী আমলসমূহ

ক. "যাঁর মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে আল্লাহ পাক তার মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করবেন এবং তিনি বেহেশতে যাবেন।

১. দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার

২. মা-বাবার প্রতি সদ্ভাব এবং

৩. ক্রীত দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন।

খ. হযরত রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের সময় হযরত আযরাইল (আ) বলেছেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে, আমি তার রূহ সহজে কবজ করব।"

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর রূহের গন্তব্যস্থল

হযরত আবু বকর (রা)কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মানবদেহ থেকে যখন রূহ বের হয় তখন তা কোথায় যায়? তিনি বলেন মানবদেহের রূহ সাতটি স্থানে যায়।

১. নবী-রাসূলগণের রূহ-এর অবস্থান জান্নাতে আদন।

২. ওলামায়ে কিরামের রূহ-এর স্থান হলো জান্নাতুল ফিরদাউস

৩. নেককার মুমীনের রূহ ইল্লিয়্যিনে স্থান পায়।

৪. আল্লাহর রাহে শহীদদের রূহ বেহেশতে উড়তে থাকে এবং যে কোনো স্থানে যেতে পারে।

৫. গুনাহগার মুমীনদের রূহ আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে; জমীনেও নয় আসমানেও নয়– এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৬. মুমীনদের শিশু-সন্তানদের রূহ কস্তুরীর পাহাড়ারে থাকে।

৭.কাফিরদের রূহ সিজ্জীনে থাকে। তাদের দেহসহ কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আযাব দেওয়া হতে থাকে।

–তাফসীরে নূরুল কোরআন, ১৫খণ্ড, পৃ. ২৯২।

আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী এবং আমল ও তাওবার মাধ্যমে নিস্পাপ হওয়ার সুযোগ মৃত্যুর মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যায়

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

"আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথা বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তা হলে আমি সাদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়েও খবর রাখেন।"–সূরা আল্-মুনাফিকুন ৬৩ : ১০-১১

"যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পারিনি। কখনো নয়। এ তো একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"– সূরা আল-মু'মিনুন ২৩ : ৯৯-১০০

জীবনের অন্তিম আমলের গুরুত্ব

ক. "সাহল ইবনে সায়াদ আস্-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির প্রতি তাকালেন। লোকটি বিত্তশালী হিসেবে প্রভাবশালী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি (নবী সা) বলেন : যদি কেউ দোযখী লোক দেখতে চায়, তবে সে এর দিকে দেখুক। এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। আর সে তেমনি যুদ্ধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আহত হয়ে যায়। আর সে অতিশীঘ্র (যন্ত্রণার

www.pathagar.com

কারণে) মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তাই স্বীয় তরবারির অগ্রভাগ বক্ষে ধারণ করে সজোরে চাপ দেওয়ার ফলে বক্ষ ভেদ করে তা লোকটির পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে যায় (ফলে তার মৃত্যু হয়)। অতঃপর হুযুর (সা) বললেন, কোনো লোক এমন কাজ করে তা দেখে মানুষ সেটাকে জান্নাতীদের কাজ মনে করে; অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত; আর কেউ এমন কাজ করে যা দেখে মানুষ সেটাকে জাহান্নামীদের কর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করে, অথচ সে জান্নাতী। বস্তুত: অন্তিম অবস্থার উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল।"–বুখারী ৬খ., হা. ৬০৪৩, আধুনিক প্রকাশনী

খ. বুখারী, ৩য় খ., হা. নং ১২০, ১২১, আধুনিক প্রকাশনী অনূদিত

উপসংহার

এভাবে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত কুরআন হাদীসের সমুদয় তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়; অবস্থান্তর মাত্র। 'আলমে আরওয়াহ্ থেকে আলমে আরহাম ও 'আলমে আসবাব হয়ে 'আলমে বারযাখে রূহের যাত্রার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বা পরিক্রমার অংশ হচ্ছে মৃত্যু। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ায় অবস্থান ও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন এবং 'আমল করার সুযোগ হারিয়ে পৃথিবীতে সম্পাদিত কর্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে এক অনন্ত জীবনের প্রথম মঞ্জিলে প্রবেশ করে। এ মৃত্যুপরবর্তী জীবনে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। ঈমান, নেক আমল এবং সাদকায়ে জারিয়াই কবরে ও হাশরে, জান্নাতে ও জাহান্নামে তার একমাত্র সম্বল। তাই আমাদের উচিত অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে জাহান্নামমুখী কর্মকাণ্ড পরিহার করা এবং জান্নাতমুখী কর্মকাণ্ড যেমন : ছালাত কায়েম, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন, হজ্জ, রোযা, জিহাদ, দারিদ্র্য বিমোচন, মাতা-পিতার খিদমত, দুস্থের সেবা, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান, কুরআন চর্চা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অধিকহারে নিজে সম্পৃক্ত হই এবং অন্যকেও সম্পৃক্ত করি। মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর আযাব এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই এবং সর্বক্ষণ হকের উপর কায়েম থাকার চেষ্টা করি। আমাদের মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজনদের অনেকেই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা জানি না কবরে বা 'আলমে বারযাখে তাঁরা কি অবস্থায় আছেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করছেন। তাঁরা জান্নাতী কি জাহান্নামী তাও আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের উচিত তাঁদের কবর জিয়ারত করা, আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, নিজেরা নেক আমল করে মৃতদের জন্যে সাদকায়ে জারিয়ার অসীলা বনে যাওয়া এবং মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের সেবা ও খেদমত করে তাঁদের মরণোত্তর সেবা ও খেদমতে নিজেদেরকে সদা নিয়োজিত রাখা এবং এরূপ সার্বিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আদর্শ মৃত্যুর জন্যে সদাপ্রস্তুতি অব্যাহত রাখা। আল্লাহ আমাদের ঈমান ও আমলের হিফাজত করুন, নেক কাজ করার তাওফীক দিন এবং আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন এবং পৃথিবীর তামাম মুমিন মুমিনাকে ক্ষমা করুন।–আমীন! ■

www.pathagar.com

মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) কাদের এবং কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন ?

আবদুস শহীদ নাসিম

□

পারিবারিক ভোজসভা এবং সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের সমবেত করে আল্লাহ্ ও পরকালের ব্যাপারে লোকদের সতর্ক করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রকাশ্য দাওয়াতের যে সূচনা করেন, শত অপবাদ, প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় দৃঢ়তার সাথে তা অব্যাহত রাখেন। দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন গোটা মক্কা ও সমগ্র আরবের জনগণের মধ্যে।

তিন বছরের অপ্রকাশ্য দাওয়াতি কাজের পর থেকে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় তিনি আরো দশ বছর এই প্রকাশ্য দাওয়াতি কাজ করেন। এ সময় তিনি–

১. একেক ব্যক্তিকে টার্গেট করে দাওয়াত প্রদান করতেন।

২. বিশেষ বৈঠকাদিতে দাওয়াত প্রদান করতেন।

৩. হাটে বাজারে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে দাওয়াতি বক্তব্য প্রদান করতেন।

৪. কা'বার চত্বরে স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত হওয়া জনগণের উদ্দেশ্যে দাওয়াত প্রদান করতেন।

৫. ওকাজ, মাজান্না ও যিলমাজায সহ মক্কা এবং আরবের বিভিন্ন মেলায় গিয়ে গিয়ে দাওয়াতি বক্তব্য প্রদান করতেন।

৬. যেসব ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় আসতো তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করতেন।

৭. যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যারা মক্কায় আসতো, তাদের দাওয়াত প্রদান করতেন।

৮. উমরা করার জন্যে যারা মক্কায় আসতো, তাদের দাওয়াত প্রদান করতেন।

৯. আরবের কোনো অনুষ্ঠানাদিতে গিয়ে দাওয়াত প্রদান করতেন।

১০. উপজাতীয় লোকদের অনুষ্ঠানাদিতে গিয়ে দাওয়াত প্রদান করতেন।

১১. গোটা আরবের লোকেরা হজ্জের মওসুমে হজ্জ করার জন্যে মক্কায় আসতো। মিনায় তাঁবু ফেলে ক্যাম্প করে সেখানে তারা অবস্থান করতো। তিনি এসব হাজী ক্যাম্পে গিয়ে গিয়ে আরবের সমস্ত এলাকার লোকদের দাওয়াত প্রদান করতেন।[১]

www.pathagar.com

এ সময় উপরোক্ত পন্থাগুলো ছাড়াও আরো অন্যান্য পন্থায় তিনি দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন। এই দশ বছরের মধ্যে তিন বছর শে'বে আবু তালিবে অন্তরীণ ছিলেন, সে সময়ও তিনি দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন।[২]

এ সময়কার দাওয়াতি বক্তব্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়্যতের চতুর্থ সালে উপরে উল্লিখিত ব্যাপকতর ময়দানে প্রকাশ্য দাওয়াতি কাজ আরম্ভ করেন। এ সময় তাঁর দাওয়াতি বক্তব্য কী ছিলো?

হ্যাঁ, এ সময় তিনি দাওয়াত ব্যক্তিক পর্যায়ে দিয়ে থাকুন, কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে– সর্বাবস্থায় দাওয়াতি বক্তব্য হিসেবে তিনি মূলত সরাসরি কুরআন পেশ করতেন, কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দিতেন।

আর এটাই ছিলো দাওয়াতের সবচে' প্রভাবশালী ও কার্যকর পদ্ধতি। লোকেরা তাঁর কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়তো। কুরআনের অকাট্য যুক্তি, অনস্বীকার্য দলিল, বিবেকগ্রাহ্য উপমা-উদাহরণ আর মর্মস্পর্শী উপদেশ-নসিহত তাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিতো তীব্রভাবে আর তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতো চুম্বকের মতো।

কুরআন পেশ করা ছাড়াও তিনি নিজস্বভাবে হিকমত এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের বুঝাতেন।

কুরআনের ভিত্তিতে তাঁর এ সময়কার দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো :[৩]

১. তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান। এ সংক্রান্ত যুক্তি, দলিল ও উপমা উপস্থাপন। আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদত করার আহ্বান।

২. লোকেরা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব, মালিকানা, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও অধিকারে যাদেরকে অংশীদার ও সহযোগী মনে করতো যুক্তি, দলিল ও উপমার সাহায্যে তাদের অসারতা প্রমাণ করে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক না করার আহ্বান।

৩. তাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল নিযুক্ত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবন যাপনের জন্যে সর্বাংগীন কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা (হিদায়াত ও দ্বীনে হক) পাঠিয়েছেন। এই হিদায়াত ও দীন গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে জীবন যাপনের আহবান।

৪. মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তখন প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সেই বিচারে পৃথিবীতে যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা মুক্তি পাবে এবং তাদেরকে চিরসুখের চিরন্তন জান্নাতে বসবাস করতে দেয়া হবে। সেখানে কখনো আর মৃত্যু হবে না তাদের।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তারা সেখানে পাকড়াও হয়ে যাবে। কঠিন শাস্তি, ভয়াবহ আযাব ও চরম হতাশার দুঃখময় জাহান্নামে তাদের নিক্ষেপ করা হবে। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। সুতরাং হে মানুষ! তোমরা পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ আর চিরসুখের জান্নাত পাওয়ার জন্যে দুনিয়ার জীবনে এক আল্লাহর হুকুম মতো তাঁরই দাসত্বের জীবন যাপন করো।

৫. আমি পৃথিবীতে কোনো নতুন বা অভিনব নবী নই। আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বেও অসংখ্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষকে এই একই আহ্বান জানিয়েছেন। যারা নবীদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ প্রসংগে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিসমূহের ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

৬. নৈতিক অপরাধ ও অসৎ গুণাবলীর উল্লেখ করে সেগুলো বর্জন করার আহ্বান।

৭. উত্তম নৈতিক গুণাবলী ও মানবিক গুণাবলী উল্লেখ করে সেগুলো অর্জন ও চর্চা করার আহ্বান।

৮. আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আহ্বান এবং এজন্যে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অবলম্বনের আহ্বান।

৯. ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, গোপন দাওয়াতের তিন বছরকাল অতিক্রান্ত হবার পর তিনি মক্কায় দশ বছর দাওয়াতি কাজ করেন। এ সময় তিনি হাট বাজারে, বিভিন্ন মেলায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও দল উপদলের কাছে গিয়ে এই দাওয়াত প্রদান করতেন।

হে জনগণ, হে মানুষ সকল! তোমরা এ কথাটি মেনে নাও যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।' এই একটি মাত্র কথা মেনে নিলে তোমরা সফল হয়ে যাবে, এর দ্বারা গোটা আরবের শাসন-কর্তৃত্ব তোমরা লাভ করবে, অনারববাসী তোমাদের অনুগত হয়ে যাবে আর মৃত্যুর পর তোমরা অর্জন করবে জান্নাতের রাজত্ব। ■

তথ্যসূত্র :

১. ইবনে জরীর তাবারী; ইবসে সা'আদ; ইবসে আসীর; ইবনে হিশাম।

২. ইবনে জরীর তাবারি।

৩. এই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো সংগ্রহ করা হয়েছে স্বয়ং আল কুরআন থেকে। তাছাড়া ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, তাবকাতে ইবনে সা'আদ এবং সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থেও এ বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ হয়েছে।

www.pathagar.com

যুগসন্ধিক্ষণের অনন্ত রাহবার রাসূলুল্লাহ (সা)

আকরাম ফারুক

□

যে সময়টিতে রাসূলুল্লাহ (সা) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেটিকে যদি আমরা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, তা ছিল সার্বিক অর্থেই একটি যুগসন্ধিক্ষণ বা ক্রান্তিকাল। আর এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে তিনি তাঁর তেইশ বছরের নবুয়তী জীবনে যে অবদান রেখেছেন এবং সমাজের যে সার্বিক সংস্কার সাধন করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে এটাই দিবালোকের মত প্রতিভাত হয় যে, তিনি ছিলেন মানব সভ্যতার সেই দুর্বিষহ যুগসন্ধিক্ষণের বহু প্রতীক্ষিত অনন্ত রাহবার, সেই চিরস্মরণীয় ত্রাণকর্তা, যিনি ঠিক সেই সময়টিতে আগমন না করলে এবং তাঁর সম্পাদিত অবদান না রাখলে মানবজাতি ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেত। রাসূলাল্লাহ (সা) যখন আরবের বুকে আবির্ভূত হলেন, তখন গোটা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাই ছিল ঘোর তমসাচ্ছন্ন। বিশেষত আরবের সমাজ ব্যবস্থা একেবারেই রসাতলে গিয়েছিল। সেখানে গোত্রে গোত্রে চলতো ঘোরতর কোন্দল ও গৃহযুদ্ধ। শত শত বছর ধরে চলতো এক একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সমাজে শান্তি ও স্থিতির নাম-নিশানাও ছিল না। হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন থেকে শুরু করে নারী সন্ধানকে জ্যান্ত কবর দেয়া পর্যন্ত এমন কোন অনাচার ছিল না, যা সেই সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক প্রথায় রূপ ধারণ করেনি। শুধু যে নৈমিত্তিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল তাই নয়, এসব অনাচার নিয়ে গর্ববোধ করা হতো এবং কবিতার মাধ্যমে তা সাড়ম্বরে প্রচার করা হতো। পবিত্র কুরআনে জাহেলী বর্বরতার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াতে : "তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। অথচ তোমরা আগুনের একটি গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলে। সেখান থেকে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।" তোমরা আগুনের একটি গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল– এই একটি বাক্যই আরবের গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র এঁকে দিয়েছে। সর্বাত্মক নিরাপত্তাহীনতা সেই সমাজকে একটি সাক্ষাৎ নরকে পরিণত করেছিল। শুধু যে আভ্যন্তরীণ মারামারি,

www.pathagar.com

কাটাকাটি ও গৃহযুদ্ধের কারণেই তা নরকের রূপ ধারণ করেছিল তাই নয়, বরং সর্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল বিদেশী আগ্রাসনের কবলে পড়ে তাও সংঘটিত হবার উপক্রম হয়েছিল। ইয়ামানের খৃষ্টান শাসক আবরাহা তৎকালীন রোম সম্রাটের মদদে ও ইন্ধনে কা'বা শরীফকে ধ্বংস করার অভিযান চালিয়েছিল রাসূল (সা) এর জন্মের মাত্র ৫৫ দিন আগে। মহান আল্লাহ স্বীয় অপার অনুগ্রহে এবং ঐ ঘোরতর অসভ্য আরব জাতিকে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সভ্যতা শিক্ষা দানের উস্তাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে আবরাহার বাহিনীকে অলৌকিক উপায়ে ধ্বংস করে দিয়ে আগ্রাসনকে ব্যর্থ করে দিলেন। তা না হলে মহানবী (সা) সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে যে অতুলীয় অবদান রেখেছেন তার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রই হয়তো অবশিষ্ট থাকতো না। কেননা তিনি যদি রোম সাম্রাজ্যের দখলীকৃত উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করতেন এবং চোখ মেলেই দেখতেন তাঁর জন্মভূমি বিদেশী হানাদারের পদতলে পিষ্ট, তাহলে মক্কী জীবনের প্রথম তেরো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে যে চরিত্র গঠনের কাজ করেছেন, তা করতে পারতেন না। তাকে বরঞ্চ প্রথম দিন থেকেই দেশকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার লড়াই-এর ডাক দিতে হতো। এ জন্যই ইতিহাসে প্রথমবারের মত দেখা গেল, নবীর আবির্ভাবের আগেই নবীর মোজেযার আগমন ঘটতে। আবাবিল বাহিনী দিয়ে আবরাহার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা হলো রাসূল (সা) এর জন্মের আগে। অথচ পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটতো নবীর আবির্ভাবের পরে।

রাসূল (সা) বিশ্বের সবচেয়ে অনগ্রসর, সবচেয়ে অসভ্য ও নিরন্তর খুন-খারাবীতে লিপ্ত একটা পাষণ্ড মানব সমাজে আবির্ভূত হয়ে নবুয়ত লাভের আগেও একবার সমাজ বদলানোর চেষ্টা করেন। হিলফুল ফুযুল নামক সেবামূলক সংগঠন গড়ে তুলে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসনের চেষ্টা করেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও খুন-খারাবী বন্ধেরও প্রয়াস চালান। তাঁর সে চেষ্টায় সমাজ থেকে কোন বাধা না আসা সত্ত্বেও তা ফলবতী হয়নি। কেননা তিনি তখনো ওহির নির্ভুল জ্ঞান লাভ করেননি। অথচ চল্লিশ বছর বয়সে ওহি ও নবুয়ত প্রাপ্তির পর যে সংস্কারের চেষ্টা চালান, তা অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সফল হয়েছে।

এ সফলতার প্রধান কারণ ছিল তিনটি : প্রথমতঃ তিনি মানুষকে ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্ভুল বাণী কুরআনের শিক্ষা দিয়ে তাদের মন-মগজ ও চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ অন্যকে যা শিক্ষা দিতেন, প্রথমে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে দেখাতেন। তৃতীয়তঃ তিনি জীবনের বিভাজনে বিশ্বাস করতেন না এবং বিভাজনের সুযোগও রাখতেন না। কেননা তিনি প্রথম দিন থেকেই ঘোষণা করেন, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। একে গ্রহণ করলে পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং গোটা জীবনেই বাস্তবায়িত করতে হবে। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে আলাদা কেবল উপাসনালয়ে সীমাবদ্ধ জপ-তপ সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। ইসলাম মানুষকে যেমন আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের বিধান দেয়, তেমনি বিধান দেয় জনসেবার, সমাজ

www.pathagar.com

সংস্কারের, শাসক, বিচারক, আইন প্রণেতা ও নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালনেরও। তাই এই খোদায়ী ওহিলব্ধ বিধানের শিক্ষা দিয়ে রাসূল (সা) আরবের সেই বর্বর জাতিটাকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন সর্বকালের সেরা মানব সমাজরূপে। যে জাতি একসময় নিজের সন্তানকে পর্যন্ত জীবন্ত কবর দিত, তারাই হয়ে উঠলো মানুষের জীবন ও সম্পদের সর্বোত্তম রক্ষক। যে সমাজের লোকেরা পরস্ব অপহরণ ও লুটপাটে সিদ্ধহস্ত ছিল, তারাই এমন আমানতদাররূপে গড়ে উঠলো যে, তাদের একজন সুদূর ইরানের রাজপ্রাসাদ দখল করে বহুমূল্য রত্ন হস্তগত হওয়ার পর তা মদিনার খলিফার দরবারে অক্ষতভাবে পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত একটি মনযিলেও যাত্রাবিরতি করেননি। যে সমাজের লোকেরা একটি উট হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ১৪০ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েছে, সেই সমাজেই এত নির্মল চরিত্রের লোক আবির্ভূত হলো যে, তাদের একজন (হযরত আলী) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর চড়েও তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে শুধুমাত্র এইজন্য যে, ধরাশায়ী শত্রু তার মুখে থু থু দিয়ে তাকে উস্কে দিয়েছে এবং এরপর তাকে হত্যা করলে ব্যক্তিগত আক্রোশে হত্যার জন্য তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমাজের এই আমূল পরিবর্তন ঘটতে একটি প্রজন্মও অতিক্রম করতে হয়নি। বরং একই প্রজন্মের একই ব্যক্তি কাল ছিল মানবতার জঘন্য দুশমন, ঘৃণ্যতম লুটেরা ও নরঘাতক, আর আজ সে মানবতার মহান সেবক, রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্পদের একনিষ্ঠ রক্ষক ও আমানতদার। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ভরে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে মানব সমাজের ইসলামী বিবর্তন। এভাবেই চলবে যুগসন্ধিক্ষণের অনন্ত রাহবার মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) মোজেযারূপী নেতৃত্বে পরিচালিত অবিরত ধারার কল্যাণময় সমাজ বিপ্লব। ■

www.pathagar.com

বাঁধনের বাঁধন

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

□

হাসান মঞ্জিলের সামনে বিশাল সুপার মার্কেট হাসান প্লাজা। মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে হোটেল মারুফ এন্ড সুইট মিট। গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে বাঁধনের চোখে পড়ে, মিষ্টির পাহাড় জমছে দোকানে। অর্ধডজন কর্মচারী দ্রুতগতিতে জিলাপী, আমৃত্তি ও রসগোল্লা তৈরি করছে।

- ব্যাপার কি? এত মিষ্টি খাবে কারা? আমেরিকায় এক্সপোর্ট করবেন নাকি?

- জানেন না আপা আজ ১২ই রবিউল আউয়াল, মিলাদুন্নবী?

- তাই নাকি? তবে মিলাদুন্নবীর সাথে মিষ্টির কি সম্পর্ক?

মিলাদ মানেইতো মিষ্টি খাওয়া। নবীর জন্মদিন। ঘরে ঘরে মিলাদ আর মিষ্টি।

ইসলামী কোন দিবসের সাথে বাঁধনের পরিচয় নেই। ভার্সিটির সহপাঠীদের সাথে হল্লা করে কয়েকটি দিবস পালন করে। পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট, ইত্যাদি। পহেলা-বৈশাখের সাথে পান্তা ভাত, ভ্যালেন্টাইন ডের সাথে গোলাপ ফুলের সম্পর্ক সে ভালই বোঝে।

রুমে ঢুকে কাপড় চেঞ্জ করছে বাঁধন। খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে এক সুদর্শন যুবক।

- কে আপনি? রুমে ঢুকেছেন কেন?

- সরি আপা, ইচ্ছে করে ঢুকিনি। আমাকে পুলিশ তাড়া করেছে।

- What? Are you a criminal?

- জ্বি না আপা। বাইতুল মোকাররমে নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম।

- ফাইজলামীর আর জায়গা পান না? নামাজ পড়তে গেলে পুলিশে দাবড়ায়? পুলিশের পেট খারাপ হয়েছে?

- এখন আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারবো না। আগামীকাল পত্রিকায় ছবি দেখতে পাবেন, নিরীহ মুছল্লীদের পুলিশ কেমনে পিটাচ্ছে!

- এই ব্যাপার? পলিটিকাল ক্ল্যাশে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ায় পড়েছিলেন? যান, আজকের মত মাফ করে দিলাম।

www.pathagar.com

- না আপা, সাংঘাতিক ক্র্যাক-ডাউন হচ্ছে। নর্মাল হতে আরো সময় লাগবে।

- দেখছেন না, আমি কাপড় চেঞ্জ করছি? বের হন বলছি!

- এক কাজ করি আপা। মসজিদে ঢুকার আগেই পুলিশ একশন শুরু করে দিয়েছিল। তাই নামাজ পড়তে পারিনি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে চার রাকাত নামাজ পড়ি। আপনি ততক্ষণ চেঞ্জ করেন।

- সিরিয়াস নাছোড়বান্দা তো আপনি? জলদি করেন।

- আপা, আপনার ঘরে জায়নামাজ আছে?

- না, এ বাড়ির কেউ নামাজ পড়ে না। ফ্লোরেই পড়েন। ধোয়া আছে।

একটি ইসলামী সংগঠনের কর্মী শাহীন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে সংগঠন বর্ণাঢ্য সীরাত মিছিলের আয়োজন করেছিল। একটি ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের এই কর্মসূচি পণ্ড করে দেয়ার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করে। প্রচুর টাকা ও প্রভাব খাটিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে হাত করে নেয়।

দ্রাম্ দ্রাম্! কয়েকটি পটকার বিস্ফোরণ। উত্তেজিত মিছিলকারীদের মারমুখী আচরণ। তারপর পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ। বিশাল আয়োজন পণ্ড করে দেয়ার সহজ পদ্ধতি।

ইটের বৃষ্টি ও টিয়ার গ্যাসের ধুঁয়ার ভিতর দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল শাহীন। পল্টন মোড় পার হয়ে তোপখানা রোডের গলিতে হাসান মঞ্জিলে ঢুকে পড়েছিল সে।

কাপড় চেঞ্জ করে বাঁধন তাকায় যুবকের দিকে। নামাজ শেষ করে ধ্যানমগ্ন যুবক হাত তুলে দোয়া করছে,

- হে আল্লাহ, তুমি মজলুম ভাইদের সাহায্য কর। জালেমের জুলুম থেকে নিরীহ মুসলমানদের হেফাজত কর। মজলুমের বিপদে যারা সাহায্য করে তাদেরকে তুমি সাহায্য কর।

- এই যে সাহেব, আপনার নামাজ শেষ হয়েছে? হয়ে থাকলে এবার বিদায় হন।

- জ্বি আপা, মনে হয় এখন যেতে পারবো। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

যুবকটি চলে যাওয়ার পর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেয় বাঁধন। হঠাৎ নজর পড়ে, মেঝের উপর পড়ে আছে একটি পকেট নোট বুক। হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতেই হাত থেমে যায়। দ্রুত টেবিলে রেখে দেয় জিনিসটা। নোট বুক নয়, পকেট কুরআন শরীফ।

এ বাড়িতে কখনো কুরআন শরীফ দেখেনি বাঁধন। পিতা সেকুলার রাজনৈতিক দলের নেতা। ভাই উগ্র ছাত্র সংগঠনের আর্মড ক্যাডার। সামান্যতম ধর্মীয় শিক্ষাও বাঁধন পায়নি জীবনে। গান-বাজনা, নাটক-সিনেমার মাঝে বড় হয়েছে সে। পিতার কোমরে থাকে লাইসেন্স করা পিস্তল। ভাই এর কাছে অবৈধ স্টেনগান। দলীয় কোন্দলে দুইবার

www.pathagar.com

গুলিতে আহত হয়েছে ভাই। চলমান রাজনীতির প্রতি ভয়ানক ঘৃণা জন্মেছে বাঁধনের। ইদানীং ঘরে ঢুকলেই বাঁধনের নজর পড়ে ঐ জায়গাটায়, যেখানে যুবকটি নামাজ পড়েছিল। কুরআন শরীফখানা সে তার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিয়েছে সযতনে।

বাঁধনের বান্ধবী মিতুর আজ জন্মদিন। আমোদ-ফূর্তি চলবে গভীর রাত পর্যন্ত। এসবের প্রতি উৎসাহ কমে গেছে বাঁধনের। গত থার্টি ফার্স্ট নাইটে ভার্সিটি এলাকায় তাকে ভয়ানক নাজেহাল করেছে 'সোনার ছেলেরা'।

তবু যেতে হবে মিতুদের বাড়িতে। স্কুল লাইফ থেকে তাদের বন্ধুত্ব। কিন্তু বড়ই ভীতু এখন বাঁধন। গাড়িতে চড়লেই মনে হয়, এই বুঝি এক্সিডেন্ট হল। কোন অনুষ্ঠানে গেলেই মনে হয়, এই বুঝি বোমা ফুটলো। একসাথে একাধিক যুবক দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি থার্টি ফাস্ট নাইটের পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

ড্রাইভার গেটে গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। উপহার প্যাকেট নিয়ে উঠে বসে বাঁধন। গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারে কি যেন বাজিয়ে শুনছিল ড্রাইভার। বাঁধনকে দেখেই অফ করে দেয়। পিছনের সিটে গা এলিয়ে দেয় বাঁধন। গাড়ি ছুটে চলে বনানী অভিমুখে।

- ক্যাসেট বাজাতো। এত পথ চুপচাপ থাকতে বোরিং লাগছে।

- এই ক্যাসেট আপনার ভাল লাগবে না। আমি চেঞ্জ করে দেই।

- চেঞ্জ করার দরকার নেই। যেটা বাজাচ্ছিলি সেটাই বাজা। এটা এক সীরাত মাহফিলের হুজুরের বয়ান আপা। তয় হুজুরের গলাডা বেশ মিষ্টি।

- সুইচ অন কর। দেখি কেমন মিষ্টি।

ক্যাসেট অন করতেই ভেসে আসে সুরেলা কণ্ঠ–

- অসভ্য বর্বর এক জাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ উপহার দিয়েছিলেন আল্লাহর নবী। শান্তি ও প্রগতির নির্ভুল পথনির্দেশিকা একমাত্র তাঁর কাছেই আশা করা যায়। হত্যা, সন্ত্রাস, ছিনতাই, ধর্ষণ ইত্যাদি গজব থেকে বাঁচতে হলে নবীর আদর্শ অনুসরণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

কুরআনকে সম্মান করার একটি ঘটনা মনযোগ দিয়ে শোনে বাঁধন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক একবার কলকাতা থেকে ট্রেনে যশোর যাচ্ছিলেন। প্রয়োজনীয় মালামালের সাথে তার কুরআন শরীফটি কম্পার্টমেন্টে তোলা হয়নি বলে তিনি রাগ করে সেই ট্রেনে উঠেননি। পরের ট্রেনে তিনি যশোর পৌছেন। পরে জানা গেছে ট্রেনের সেই রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট এ তার আদর্শিক শত্রুরা টাইম বোম পেতে রেখেছিল। কয়েক স্টেশন যাওয়ার পরই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়।

ক্যাসেট শোনার সময় ভ্যানিটি ব্যাগটি বুকের সাথে চেপে ধরে বাঁধন। ঠিক তখনি ঘটে কাকতালীয় ঘটনা। মহাখালী রেল ক্রসিং-এর উপর জ্যামে পড়েছে গাড়ি। সামনে পিছনে লম্বা লাইন। হঠাৎ ট্রেন আসার সিগনাল। ছুটে আসছে আন্তনগর ট্রেন। তাদের

www.pathagar.com

গাড়ি রেল লাইনের উপর। সামনে পিছনে কোন দিকে সরার জায়গা নেই। সিগনাল ম্যান গেট নামিয়ে দিয়েছে দুই দিকে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ড্রাইভার সজোরে চাপ দেয় গিয়ারে। দুটো অটো রিক্সাকে ঠেলে একটু জায়গা করে নেয় রাস্তায়। গাড়ির পিছন অংশ স্লিপার থেকে মাত্র এক হাত দূরে। বাঁধনের কানের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনটি চলে যায়। ভূমিকম্পের মত কাঁপতে থাকে গাড়িটি। ড্রাইভার কম্পিত স্বরে বলে,

- আপামনি, আমার বুক কাঁপতাছে। আল্লা বাঁচাইছে। আজরাইল ঘাড়ের কাছ দিয়া চইলা গেছে। আর একটু পিছনে পড়লে খবর আছিল। এই ক্যাসেটের উছিলায় আল্লায় আজরাইল উইথড্র কইরা নিছে।

- তোরতো শুধু বুক কাঁপে। আমার হার্টফেল করার কথা। কিন্তু আজ আমার বুকে অনেক সাহস। তোর আছে ক্যাসেট। আমার কাছে আছে অরিজিনাল কুরআন।

- কন কি আপা, আপনি কুরআন শরীফ সাথে রাখেন? পড়তে পারেন?

- আমি আলেপ, বে, তে, ছেও পারি না। বাবায় শুধু সারেগামা পাদানিসা শিখিয়েছে। গাড়ি ঘুরা, বাড়িতে ফিরে চল।

- তাই ভালা আপামনি। এই অবস্থায় আমোদ-ফূর্তি ঠিক না। আল্লাবিল্লা করার সময় এখন।

- তুই বেশী কথা বলিস।

বাড়িতে গিয়ে বাঁধন উপহার প্যাকেট ও ভ্যানিটি ব্যাগ টেবিলে রেখে সেই জায়গায় তাকায়, যেখানে যুবকটি নামাজ পড়েছিল এবং কুরআন শরীফটি ফেলে গিয়েছিল। যুবকের মুনাজাতের কথাগুলো আবার মনে পড়ে তার–

- যারা মজলুমের বিপদে সাহায্য করে, তুমি তাদের সাহায্য কর। পাশের রুমে তার ভাই আড্ডা দিচ্ছে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কিছু শব্দ তার কানে আসে–

- খাইয়া ফালামু। ফাইরা ফালামু, লাশ ফালায়া দিমু।

বাঁধনের কানে বিষ ঢালতে থাকে কথাগুলো। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। আর ভাবে এটা কি কোন মুসলমানের বাড়ি? একটা জায়নামাজ নেই, কুরআন শরীফ নেই। এখানে আছে পিস্তল, স্টেনগান, বোমা, মদ।

ভাগ্যচক্রে একটা অচেনা লোক একদিন নামাজ পড়ে গেছে। একটা কুরআন শরীফ রেখে গেছে। এইটুকু ধর্মীয় শক্তি দিয়ে কতদূর চলা যাবে? আবার যেয়ে ভাই-এর দরজায় আড়ি পাতে বাঁধন। ভাই টেলিফোনে কাকে যেন ধমকাচ্ছে।

- বেশী বাইড়েন না হুজুর। এইডা মিলাদুন্নবীর দেশ। মিলাদ পড়বেন আর জিলাপী খাইবেন। সীরাতুন্নবী লইয়া ফালপাইরেন না। আবার রাস্তায় নামলে খবর আছে।

দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে পড়ে বাঁধন। ক্ষেপে যায় তার ভাই–

- এই, তুই এখানে কি চাস্? যা এখান থেকে। আমরা গোপনীয় আলাপ করতাছি।

www.pathagar.com

- যাচ্ছি, কাকে যেন টেলিফোনে ধমকাচ্ছিলে, তার নাম্বারটা একটু দাও।
- তুই কি করবি হুজুরের নাম্বার দিয়া?
- আমারও একটু ধমকানোর শখ অইছে।
- খুব ভালা কথা, মাইয়া মাইনসের ধমক খাইলে হুজুরের নেশা ছুটব।

কর্ডলেস টেলিফোন সেটটা নিয়ে নিজের রুমে চলে যায় বাঁধন। ডায়াল করতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে ধীর-স্থির কণ্ঠ--

- আসসালামু আলাইকুম। কে বলছেন?
- এতক্ষণ যিনি আপনাকে থ্রেট করছিলেন, আমি তার বোন।
- আপনিও থ্রেট করতে পারেন। আমাদের এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে।
- আমি অন্য কথা বলার জন্য ফোন করেছি। আপনাদের এক লোক আমাদের বাড়িতে একটা কুরআন শরীফ ফেলে গেছে। নিয়ে যেতে বলবেন।
- কি নাম তার? কোন এলাকায় থাকে?
- আর কোন তথ্য আমার জানা নেই। সীরাত মিছিলে হামলার সময় এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।
- ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে।

লনে পায়চারি করছেন হাসান সাহেব। মিনি গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে শাহীন। ঢুকেই মুখোমুখি হয় হাসান সাহেবের।

- আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।
- আমার নাম শাহীন। একটি বেসরকারী কলেজের লেক্‌চারার।
- তা এখানে কি চাই?
- মিলাদুন্নবীর দিন বাইতুল মোকাররম থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন ভুলে একটা কুরআন শরীফ ফেলে গেছি। নিতে এসেছি।
- আপনার সাহসতো কম না! আপনি জানেন, আমি আপনাদের দু'চোখে দেখতে পারি না?
- আগে জানতাম না, এখন জানলাম।
- তবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? জলদি ভাগেন! পিতার উত্তেজিত গলা শুনে বেরিয়ে আসে বাঁধন।
- আপনি এসেছেন? আসুন আমার সাথে।

মেয়েকে উদ্দেশ্য করে হাসান সাহেব বলেন,

- জিনিসটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় কর।
- উনি আমার মেহমান, আমি আসতে বলেছি।
- তুই জানিস না, এরা লাদেনের চেলা।
- এসব তোমাদের পলিটিক্যাল ওয়ার্ড আমি বুঝি না। আমি মেহমানকে সম্মান করতে জানি।

www.pathagar.com

শাহীনকে নিজের রুমে নিয়ে যায় বাঁধন। তাচ্ছিল্যের সাথে সেদিকে চেয়ে থাকে হাসান সাহেব। একদলা থুথু ছুড়ে রাগে গজরাতে থাকে।

- বলুন কি খাবেন?

- আপনার বাবার মুখরোচক কথা খেয়ে পেট ভরে গেছে। জিনিসটা দেন, তাড়াতাড়ি বিদায় হই।

- জোর গলায় মেহমান বলে আব্বার কাছ থেকে ডেকে এনেছি। একটু মেহমানদারী করতেই হবে। একটু বসুন। ঠাণ্ডা পানিতে ট্যাং গুলিয়ে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দেই।

- একটু তাড়াতাড়ি হাত চালান। আসরের সময় হয়ে গেছে।

- ভেরি গুড। ঐদিনের মত আজও এখানেই নামাজটা সেরে ফেলুন। আমার ঘরটা আর একটু নিরাপদ হোক।

- আমার নামাজে আপনার কোন লাভ হবে না। নামাজ সবার জন্য ফরজ।

- এ বাড়িতে কেউ নামাজ-রোজার ধার ধারে না। আপনি দুদিন নামাজ পড়ে গেলে আল্লাহর কাছে রেকর্ড হয়ে থাকবে। আল্লাহ নাকি সামান্য উছিলা পেলেই বড় বড় পাপ মাফ করে দেন?

- চমৎকার বলেছেন। সেই গল্পের মত, রোজা না রেখে এক পাপ করেছি ইফতারও না করে একেবারে বেঈমান হয়ে মরব নাকি?

- গল্পটা মোটেই গল্প না। একেবারে সত্য কথা। আমরাই প্রতিবছর রোজা না রেখে ডাটে ইফতার করি।

- কোন অসুবিধা নাই। চালিয়ে যান। তবে আমি আজ জামাত মিস করতে পারব না।

- এখানেই জামাত করুন।

- তিন জনের কমে জামাত হয় না।

- ঠিক আছে, আমাদের ড্রাইভার মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে। তাকে ডেকে নিয়ে আসি। আর আমিও এক পাশে দাঁড়িয়ে যাই। কোরাম হয়ে যাবে।

- এরকম অদ্ভুত জামাত জায়েজ কিনা, আমার জানা নেই। কোন মুফতিকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

- সেতো অনেক সময়ের ব্যাপার। আপাতত নামাজ পড়ে নেই। জায়েজ না হলে পরে আপনারটা কারেকশন করে নিয়েন।

- দারুণ বলেছেন। এবার যা করার তাড়াতাড়ি করেন।

- একটু দাঁড়ান। আমি অজুটা করে ড্রাইভারকে ডেকে আনি।

যুবকটির সাথে এতক্ষণ ধরে কি করছে মেয়ে, বুঝতে পারে হাসান সাহেব। তাই কোন রকম সংকেত ছাড়াই মেয়ের রুমে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই চক্ষু ছানাবড়া। যুবকের পিছে মাথায় ওড়না দিয়ে তার মেয়ে নামাজ পড়ছে। ড্রাইভার ব্যাটাও যোগ দিয়েছে দলে। তিনজনই এখন সিজদায়।

চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে মেয়েকে বাইরে নিয়ে আসে হাসান সাহেব। বাকী দুজন

www.pathagar.com

নামাজ বাদ দিয়ে হা করে চেয়ে থাকে।
- তুমি কি মানুষ, না জানোয়ার? নামাজ থেকে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছ?
- নামাজ পড়বি, ভালকথা। তাই বলে এই ব্যাটার পিছনে? তুই জানিস এরা কারা? এরা ৭১-এ ত্রিশ লাখ মানুষ হত্যা করেছে। তিন লক্ষ নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। এখন এরা রগ কাটে।
- এদের আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি। এরা কিচ্ছু করেনি। তোমাদের 'সোনার ছেলেরা' জাহাঙ্গির নগর ভার্সিটিতে সেঞ্চুরি করেছে। তোমার সোনার ছেলেরা ঢাকা ভার্সিটিতে আমাকে অর্ধ উলঙ্গ করেছে। আমি জানি, তোমার ছেলেরা বোমা বানায়, মানুষ মারে।
- এসব রাজনীতি তুই বুঝবি না। খামাখা হৈ চৈ করিস না।
- আমি কচি খুকি? এম এ পাস করে এখনো দুধ খাই? কিচ্ছু বুঝি না! তুমি মেট্রিক পাস করে দুনিয়ার সব বুঝো!
মেয়েকে আর ঘাটাতে চায় না হাসান সাহেব। হন হন করে নিজ ঘরে চলে যায়।
বাঁধন ঘরে গিয়ে দেখে ড্রাইভার চলে গেছে। শাহীন দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।
- আপনি এখনও আছেন? ভয়ে পালান নি?
- পালাতাম। তবে আপনার সাহস দেখে আমারও সাহস বেড়ে গেছে। যেভাবে আমার পক্ষ নিয়ে আপনার আব্বার সাথে ঝগড়া করেছেন, আমার সহকর্মীরাও এমন করে না। এখন তাহলে যাই।
- ঐ কুরআন শরীফটা কিছুদিন আমার সঙ্গী ছিল। বেশ সাহস যুগিয়েছে। আজ আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছি।
- তাহলে রেখে দেন। আমি আর একটা কিনে নেব।
- আমার চারদিকে শুধু দুর্ঘটনা। শুধুই বোমা গুলি দেখি। নিজকে খুবই অসহায় মনে হয়। আমার জন্য এমন একজন সঙ্গী ঠিক করে দেন যার বুকে ও পকেটে কুরআন শরীফ আছে। আপনি নিজে হলেও আপত্তি নেই।
- সর্বনাশ! সার্থক নাম আপনার। আমাকেও বেঁধে ফেলতে চান! কিন্তু আপনার বাপ-ভাইকে ঠেকাবেন কিভাবে?
- এরাই আমার নাম রেখেছে বাঁধন। ওদের আমি খুঁটির সাথে বাঁধবো।
- ঠিক আছে, আগে তাই করেন। দেখি কেমন বাপকা বেটি আপনি। আমাকে পরে বাঁইধেন। অনেক রকম বাঁধনের কথা শুনেছি। মায়ার বাঁধন, প্রেমের বাঁধন, স্নেহের বাঁধন। এবার দেখি, কেমন টাইট বাঁধনের বাঁধন!
- আসলে এ বাঁধন ইসলামের, কুরআনের ও সীরাতের । কিয়ামত পর্যন্ত লাইগা থাকবো।
হাসলো দুজনেই। ■

www.pathagar.com

ঝরা পাতার মতো ॥ আবদুল হাই শিকদার

ফুলের ভিতরে ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চায় ফুল।
কিন্তু গোলক মাথা ঝাঁকিয়ে নিচে ফেলে দেয় পুষ্প।
তারপর পুষ্প পুষ্প ধ্বনি শোনা যায়।
আদতে তা মেষের চামড়ায় মোড়া নেকড়ের সঙ্গীত।

পাখি-বোনের দিকে হাত বাড়ায় পাখি-ভাই।
আর গাছপালা ঝরিয়ে দেয় সব পাতা।
বন হরণের বেদনা জায়গা না পেয়ে মিলিয়ে যায়।
মৃত্তিকা পুড়িয়ে মারে বৃক্ষ,
নাকি বৃক্ষ দগ্ধীভূত হয় অনলে!
–এদিকে টেবিল সৌন্দর্যের মাংস ভুনার ভাপ ছড়ায়।
অনল বলে, মাঠ তুমি শেষ হয়ে যাও।

তসবির পাশে তারকা চিহ্নিত ফাইল,
প্রার্থীরা দাঁড়িয়ে থাকে,
আর জবাবদাতা চাপ দেয় এক্সিলেটরে,
অমনি নিভৃতি তচনচ করে উপরে উঠতে থাকে বাড়ি,
নাকি মাটির উপর ক্রন্দনমাখা মাটির মৃতদেহ?

মানুষ গালমন্দ করে শারমেয়দের
কিন্ত শারমেয়রা নিজেদের আওয়াজ বন্ধ করে
অবাক হয়ে শোনে মানুষের ঘেউ ঘেউ।

হে রাসূল,
আল্লাহর বান্দা আবদুল হাইয়ের
হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত,
কেবল মানুষের কামড়ের ক্ষতচিহ্ন।
–আর আমার হৃদয় খুঁজে বেড়ায় আরাম।

আমি পাখি আমি পাখি-বোন।
আমি বৃক্ষ আমি ঝরা পাতা
আমি ঝরা পাতার মতো
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা শুকিয়ে যাওয়া স্নায়ুতন্ত্র।

www.pathagar.com

হে রাসূল,
দৃষ্টিকে প্রসারিত করে মস্তকের সংখ্যাগুলি,
ওজন নেয়ার আগেই জানা যায়
এই মৃত্তিকার মালিকরা আপনার আগমনের আগের হেজাজ।

আর আমার দিশেহারা হৃদয়
ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া পালের মতো বাতাসবিহীন।
খুঁজে পেতে চায় আরাম–
কিন্তু দৃষ্টি মেলে রাখা এখন সত্যি কষ্টকর।

কবরে যাওয়ার আগে ক্রোধ ও ঘৃণাগুলি
কাউকে উইল করে দিয়ে যাব,
নাকি সাথে নিতে হবে?
এখন দেখি এও এক সমস্যা!
আমার হৃদয় খুঁজে পেতে চায় আরাম।

রাসূল আমার,
করুণা কর তুমি আমার অন্তহীন দুঃখে।

সুবচন ॥ আবদুল মুকীত চৌধুরী

১.
যাদের ঘরে ভ্রাতৃ-হনন-যজ্ঞ নিধন চলে
হিংসা-প্রতিহিংসা যাদের ডুবায় রসাতলে
তাদের জন্য শুভ সুদিন কিংবা উত্তরণ
মিথ্যে অভয়বাণীর পিছে স্বপ্নের গুঞ্জন।

২.
ধর্মতত্ত্বে কেতা দুরস্ত সূক্ষ্ম ভাষ্যে সেরা
আত্মঘাতী সংঘাতে দেয় ঠেলে 'বুযুর্গেরা'
উম্মাটাকে ভেঙে চুরে করে 'এক শ'খান'.
এমন 'নায়েব' করে গায়েব সুন্না'র সন্ধান।

৩.
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা শিকেয় তুলে
শতক-পিঠে সওয়ার হবার খায়েশ বুকে দোলে

www.pathagar.com

হেসে খেলে বিশ্ববিজয়-অঙ্কটা যে ভুল
ছিন্নমূলের বিধিলিপি জেনো এ বিলকুল।

৪.
যোগ-বিয়োগের কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাস্য গতি
ঘুম-পাড়ানোর 'ধর্ম কথা'য় ডুবালো দুর্মতি
ধ্বংসমুখর বিশ্বে মহামৌন ব্রতীর দল
জিহাদবিহীন সময় পেরোয় কেমন সুশীতল!

৫.
বুদ্ধিবাদী দাস্যবৃত্তি কেনা-বেচার মাল
অনেক মূল্যে বিকোয় এবং পারলে ধরে হাল
ডুববে সমাজ, ভেসে ওঠার স্বপ্ন যে অলীক
স্বল্প ক'জন হলেও তারা ডুবিয়ে দেবে ঠিক।

৬.
শির ঝুঁকানো তাবেদারের মহল সারি সারি
দেশ জাতি আর রাষ্ট্র তাদের মসনদেরই দ্বারী
দাস্য সূত্রে কেনা এদের বিচিত্র রাজপাট
এদের জন্য জাতি এখন 'গো-ছাগলের হাট'।

৭.
প্রতিক্রিয়ার পাষাণ-প্রাচীর ঃ নিঃস্ব সর্বহারা
ভাঙার গানের মিছিল কোথায়, ভাঙবে কারা কারা?
এরাই যে নিরানব্বই– এ হিসেব কে রাখে
মুক্তি দিতে বেরিয়ে আসে কোথায় লাখে লাখে?

৮.
এমন হাজার বাধার প্রাচীর ভাঙাটাই কাজ
উপড়ে ফেলা হয় কিসিমের 'যেমন খুশি' সাজ
জাতির বুকে চেপে যে সব কঠিন জগদ্দল
ছুড়ে ফেলে দাঁড়া এবং সংগ্রামেই চল।

www.pathagar.com

শুধু তোমার জন্য হে রাসূল ॥ আবদুল হালীম খাঁ

তোমার মতো অসীম সুন্দর নিয়ে
কবিতা লেখার উপযোগী শব্দ কোনো ভাষাই আমি
পাই না খুঁজে। আর সুন্দরতমের যে সব উপমা
নিয়ে কবিরা গঠন করেন
সত্যি বলতে কি তার একটিও তোমার উপযোগী নয়।
হে রাসূল
পুরনো সাদামাটা শব্দ উপমা তোমার অপরূপ
পায়ের কাছে ধরতে আমার ভীষণ লজ্জা করে।
সব উপমাই সীমাবদ্ধ
সব উপমায়ই আছে অন্তত একটা ফুটো
যা তোমার জন্য প্রয়োগ করতে পারি না
যেমন চাঁদে কলঙ্ক আছে
ফুলে আছে কীট
অথচ পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই
যে তোমার এক কণা ত্রুটি ধরতে পারে।
কত কবিই তো তোমায় নিয়ে কবিতা লিখেছেন
কতভাবে এঁকেছেন তোমার রূপ আর গুণের ছবি!
কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ দেখেছেন কে
তোমার সম্পূর্ণ বলেছেন কে?
আমার মন বলে প্রাণ বলে
তোমার সম্পূর্ণ আজো কেউ বলতে পারেনি
কোনো দিন পারবেও না
কেমনে বলবে? তুমিযে সীমার অধিক
কবির কল্পনার অধিক অপরূপ।
তুমি যত ব্যক্ত নিরূপম তার চেয়ে অধিক অব্যক্ত
তুমি যত উক্ত অপরূপ তার চেয়ে অধিক অনুক্ত
অপরূপ সুন্দর।

হে রাসূল
তুমিই তো বিশ্ব কাব্যের তুলনাহীন পরিপূর্ণ
এক নিটোল কবিতা, মণি মুক্তার মতো শব্দ ছন্দে

www.pathagar.com

বুক ভরে আছো
প্রাণ ভরে আছো
আছো চোখের তারায় দেহের শিরায়
রক্তের কণায় কণায়। তোমাকে বর্ণমালায়
সাজাবার বৃথা চেষ্টা করবো না আর।
তুমি আছো বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর
মানুষে মানুষে এতো ভালোবাসাবাসি
এই শীত গ্রীষ্ম
এই আলো আঁধার
জীবন মৃত্যু
মিলন বিরহ
হাসি কান্না
সবই ভালো লাগে
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!

মানবতার শেষ মোহরের ছবি ॥ মাহবুবুল হক

চতুর্দশী এক যামিনীতে বসে একান্ত ধ্যানে
চাঁদ আর কা'বাকে দেখছিলাম।
একবার মনে হচ্ছিল চাঁদ সুন্দর
আর একবার কা'বা।
চাঁদ কা'বা হয়ে যাচ্ছিল
কা'বা হচ্ছিল চাঁদ।
কালো চাঁদ আর সমুজ্জ্বল কা'বা
আবার সমুজ্জ্বল চাঁদ, কালো কা'বা।
আমি কোন তুল্যমূল্য করতে পারছিলাম না।
বার বার কথা ভেসে আসে
তিনি বলেছিলেন : রাসূলের চেহারা ছিল
চাঁদের মতো।
জাবেরইতো বলেছেন:
'তিনি চাঁদের চেয়েও সুন্দর'
কা'বওতো বলেছেন :

www.pathagar.com

'তিনি ছিলেন এক টুকরো চাঁদ।'
আবু কোবায়ের বলেছেন
'চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম'
আনন্দ আর ভালবাসা মিলিয়ে
আবু বকর বলেছেন 'চতুর্দশী চাঁদ
লুকোচুরি খেলে যেন অন্ধকারে'
জানি না কেন যে, ওমর আওড়াতেন
'মানুষ যদি না হতেন এই আল্লাহর প্রিয়জন
চতুর্দশী রাত তিনি করতেন তবে রওশন।'
আমি কা'বার প্রান্তরে বসে
চাঁদ, কা'বা আর রাসূলের প্রতিচ্ছবি
অনুভবে অবলোকন করেছিলাম।
এক দণ্ড, দু'দণ্ড, তিন দণ্ড
আমার চোখের সামনে বারবার ঝলসে উঠছিলো
চাঁদের কলংকহীন গোলাকার
মানবতার শেষ মোহরের ছবি।

হেরার স্বর্গীয় জ্যোতি ॥ তমসুর হোসেন

এক রাখাল বালক মরুর দিগন্তে ছুঁয়ে দিতো চোখের নীল
স্বচ্ছ মায়াবী চোখে ফুটতো মরূদ্যান, দ্বিপ্রহরে রোদের তিল
কি করে রাখাল হয় নবী, নিখুঁত সত্যের নিশানবরদার
আবু জাহলের দিল কেঁপে ওঠে কাটে পরদা অমানিশার।

আমেনার যে শিশু কংকর কণা দিয়ে মরুপথে করতো খেলা
এতিম বলে যাঁরে সবাই করতো প্রচুর অনাদর অবহেলা
সেই হলো আলামীন, আস্‌সাদিক, হেরার স্বর্গীয় জ্যোতি
প্রেমে তাঁর হলো উন্মনা পুণ্যাত্মা খাদিজা কোবরা গুণবতী।

ওমরের দৃপ্ততেজ, খালিদের অজেয় বলবীর্য, খোলা তলোয়ার
হামজার বাহুবল, ওসমান-সিদ্দিকের ধন জ্ঞানের সমাহার
কিশোর আলীর চাতুর্য, হানজালার ভক্তির প্লাবন
সবকিছু পাখি হয়ে এসে ছোঁয় শ্রেষ্ঠ তাঁর পবিত্র চরণ।

www.pathagar.com

চন্দ্র বিখণ্ড হয়, ভেংগে পড়ে রোম পারস্যের অভিজাত অহমিকা
লাত-মানাতের বোতপূজার সমারোহ হয় বিবর্ণ ফিকা
লা-শরীক খোদার রাজত্ব কায়েম হয় আবারো খানে কাবায়
শয়তানির সালতানাত পৃথিবীর বুক থেকে তৃণসম উড়ে যায়।

আজো সেই কথা জ্ঞানীদের বিস্ময়, বিজ্ঞানের আলোচনা
কি এই অহী যার জ্যোতি সমুজ্জ্বল, সুগভীর উন্মাদনা
গ্রহ-গ্রহান্তরে, তারকা-নক্ষত্রে, নীহারিকা, সিদরাত মুনতাহে
সবখানে রাজত্ব করে মানুষ, খোদার অপার অনুগ্রহে।

রাসূলের অনুসারী ॥ মসউদ-উশ-শহীদ

তোমাদের আছে হিসেব-নিকেশ
আছে ভালো আর মন্দ
আমার রয়েছে ঈমানের আলো
নেই কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

তোমরা নিয়েছো সৌভাগ্যের
সুবাসিত সব ফুল
আমি রাসূলের অনুসারী শুধু
কোথাও খুঁজিনা ভুল।

মুহাম্মদ (সা) ॥ মুর্শিদ-উল-আলম

সৌহার্দের পরশ-পাথর বুঝি মানুষের মাঝে
প্রমুদিত স্বপ্নের স্বর্ণালী আশা জানায় স্বাগত
সামুদ্রিক ব্যাপ্তি নিয়ে মত্ত হতে জীবনের ভাঁজে
যেখানে জ্ঞানের জ্যোতি বিকিরিত হয় ক্রমাগত।

ফুলেল প্রেমের মোহে যে আত্মা আল্লাকে ভালোবাসে
নিজেকে বিলায় মহাসত্য-ধ্যানে, পার করে রাত

www.pathagar.com

জিঘাংসুর রক্তচক্ষু দূরে ঠেলে দিয়ে অনায়াসে
মানবতার বিকাশে গড়ে নিত্য সাম্যের প্রভাত।

অলৌকিক শক্তি যার ঠোঁটে, সে কী মধুমাখা মুখ!
বাক্যের বৃষ্টিতে করে হৃদয়ের কপটতা ম্লান
বর্ণবাদের বিভেদ ঘুচিয়ে ফিরিয়ে আনে সুখ
আনন্দের স্রোতে ভেসে যায় পৃথিবীর যত গ্লান।

বিশ্বাসের স্বর্ণরেণু যে চিত্তে গড়েছে বাসস্থান
চতুর্দিকে তাঁর প্রজ্বলিত আলোকের অবস্থান।

তোমাকেই মনে পড়ে ॥ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আসমানের পরতে পরতে যে উদার প্রেম
বেদনাহীন উচ্ছ্বাস বাতাসের ব্যস্ত শরীরে
পাখির চিৎকারে মেঘের সমবেদনার অশ্রু
সব শেষ হয়ে গেলে
সাগরের বুকে উঠে আসে জগদ্দল পাথর
এবং কোন নপুংস স্বৈরাচার–
পৃথিবীর নরম শরীরে হায়েনার ছোবল
ছিঁড়ে ফ্যালে তাবৎ পোশাক
পশুত্বের উন্মত্ততা চলে নগ্ন কাঁচা মাংসের বুকে
নক্ষত্রের চোখ ফেটে বয়ে চলে রক্তের নহর
খেই হারিয়ে ফ্যালে জিন্দেগানীর আবহ; সুরেলা বাঁশি
কান্নায় ভেঙে পড়ে আজানের ছন্দদোলা মিহি বাতাস
বাগদাদের মতো ক্ষতবিক্ষত হয় শব্দ ষোড়শী
স্বপ্নে ভাসে বদরের বিজয়ী প্রান্তর
উড়ে আসে ইতিহাসের সোনালী পাতা
তখন শুধু তোমাকেই মনে পড়ে ॥

www.pathagar.com

ও নবীগো ॥ মানসুর মুজাম্মিল

তুমি হলে বিশাল পাহাড়
উদার তোমার বুক
তুমি ছড়াও ফুলের মতো
সুগন্ধী সেই সুখ।

তুমি হলে অসীম আকাশ
স্নেহ প্রীতির লোক
তুমি হলে আলোর খনি
শান্তিদায়ী চোখ।

তুমি হলে মহাসাগর
মিষ্টি পানির দিশা
তুমিই পারো দিয়ে দিতে
পুলসেরাতের ভিসা।

মহীয়ান আলামীন ॥ নূরুজ্জামান ফিরোজ

অবশেষে এলেন তিনি
নূর নবী হযরত,
মরু আরবে বর্ষিত হল
আল্লাহ্‌র রহ্‌মত।

তিনি এসেই দূর করলেন
সকল জাহেলিয়াত,
গোমরাহা পেলো হেদায়েত বাণী
এবং খুলুসিয়াত।

কিশোর বয়সেই উপাধি পেলেন
মহীয়ান আলামীন,
যাঁর কাছে গোটা দুনিয়াবাসীর
আছে অনেক ঋণ।

www.pathagar.com

তিনি এসেই দূর করলেন যত
শির্‌ক আর বিদায়াত
তাঁর দাওয়াতেই কুফর সমাজ
পেয়েছে হিদায়াত।

বিশ্বের সব জ্ঞানী গুণীজন
অ-কবি এবং কবি
তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব
রাসূল এবং নবী।

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল ॥ আলতাফ হোসাইন রানা

রাতের আঁধার কেটে কেটে যখন
ভোরের সূর্য উঠলো,
আলো ঝলমলে পৃথিবী তখন
গোলাপ হয়ে যেন ফুটলো।

ফুলের বাগানে হাজারো কলির
সুবাসিত ছড়ানো ফুল,
রাত-দিন কেবল তোমারই গুণাবলীর
রাসূল আমার প্রিয় রাসূল।

সারা জাহানের মুসলিম তরে
ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার মাঝে,
আকাশ ও জমিনে খোদার পরে
একটি নামই আজ বাজে।

যার পরশে আঁধার দূরীভূত হলো
নতুন পথ পেলো মানবকুল,
পৃথিবীর আঁধার আলোকিত করে এলো
রাসূল আমার প্রিয় রাসূল ॥

www.pathagar.com

হে রাসূল (সা) ॥ হেলাল আনওয়ার

আঁধার রাতে চাঁদের আলো জ্বালিয়ে দিলে হে রাসূল
বিশ্বসভা উঠলো মেতে জাগলো আবার মানবকুল।
শিশির দানা ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে গরম বালুর পর
শান্ত বাতাস শান্তি বিলায় আরবীয়দের প্রতি ঘর।
নিঠুর সমাজ আবার যেন দয়ার বানে উঠলো ভেসে
লা-শরীকের দাওয়াত পেয়ে অন্ধকারে উঠলো হেসে।
মরুর বুকে উট চলেছে আজকে স্বাধীন মুক্ত সব
আরবজাহান সিক্ত শোভায় তুলছে যেন নতুন রব।
কে এসেছে বিশ্ব মাঝে চাঁদের আলো যায় হেরে
স্বপ্ন সখার হাত ধরে তাই ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে।
মরুর বুকে আরব সাগর পাঠিয়ে দিল হিমেল বায়
তপ্ত বালুর উটগুলো আজ কি অজানার সুবাস পায়!
সেই সুবাসে উঠলো নেয়ে নিঠুর জাতি আরবগণ
খুঁজতে থাকে ধরার মাঝে সেই মানবের সারাক্ষণ।
সেই যে নবী একলা গুহায় ডাকেন সদা মহান রব
মাফ করে দাও হে দয়াময় পাপী তাপী মানব সব।
আমার নবী বিশ্বনবী দয়ার নবী হে রাসূল
পাপ সাগরে যাচ্ছে ডুবে বাঁচাও তোমার উম্মতকুল।
তোমার আলো জ্বালিয়ে আবার বিশ্ব করো আলোকময়
আবার যেন করতে পারি তোমার দ্বীনের পূর্ণজয়।

একটি নূর ॥ নিজাম সিদ্দিকী

উদ্ভাসিত আলোকে ছড়ানো এ কোন্ নূর
আলো ছড়ায় অন্ধকারে?
কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত
মারামারি-কাটাকাটি এ সাধারণ বিষয়
আর নারীর মর্যাদা?
বাজি ধরে স্ত্রীকেও দিতে পারত তারা ...
এমনকি এক আইয়্যামে জাহেলিয়াত যখন মরুর প্রান্তরে

www.pathagar.com

তখনি একটি নূর আলোকে উদ্ভাসিত হল
কে? কে সে?
অন্ধকার জীবনে আলো ছড়িয়ে
সুখী সুন্দর একটি রাষ্ট্র গঠন করল
মাত্র তেইশ বছরে।
যেখানে জন্ম হয়েছিল
আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলীর
সুখসাগর সৃষ্টি হয়েছিল তপ্ত মরুতে
হে রাসূল!
সে সুখ আজ কোথায়?
আমি খুঁজে পাই না কেন?
আমাকে কিসে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়
তোমার দেখানো পথ থেকে।

যাঁর তুলনা ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল

জাহেলিয়াতের সব চ্যালেঞ্জ
উপেক্ষা করে চলছি
সব কিছুকেই হার মানিয়েছি
বুকের গভীরে আগ্নেয়গিরির
লাভা জ্বলছে
অথচ এই লাভাকে নির্বাপণে সবার
জন্য এসেছিলেন
একজন মানুষ
যিনি শান্তির বারতা নিয়ে
একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন।
যিনি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে
ডেকেছিলেন।
যিনি ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক
যিনি ছিলেন সফল বিজ্ঞানী

www.pathagar.com

যিনি ছিলেন সফল শিক্ষক
যিনি ছিলেন সফল কবি।
যিনি ছিলেন সফল আমানতদার
যিনি ছিলেন সফল ঐতিহাসিক
যিনি ছিলেন সফল জ্ঞানের ভাণ্ডার
যাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

ওহুদের রক্তাক্ত পথ ॥ জুলফিকার হায়দার

আজ কবিতার পংক্তি দিয়ে দুঃখ ঘুচবে না,
অলস জিকিরের প্রশ্বাসে শুকিয়ে যাবে না মোটেই
ক্রোধের বেয়োনেটে বিদ্ধ শিশুর দগদগে ক্ষত।
ইথার উত্তপ্ত করা বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের ভাষা
কর্ম হয়ে দাঁড়াবে না আর অসহায় নারীর ইজ্জতের সামনে,
তোমার অশ্রুভেজা কোমল মমতা মাখানো হাত
সইতে পারবে না কোন যুদ্ধাহত এতিমের মগজের উত্তাপ।

মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের পাশেই ঐতো ইতিহাসের সোনালী হেযায।
ঐতো রক্তের জমজম–লোহিত সাগর
ঐতো ইয়াসরিবের বাগান ছুঁয়ে সিরিয়ার বিনীত কাফেলা
কিংবা নাজ্জাসীর দরবারে খাড়া সত্যের নকীব, জাফর।

শুঁকে দেখো ও মাটিতে কাদের পায়ের সুবাস।
আজ আবার প্রয়োজন মরীচিকা পিষে চলা উদ্ধত বেদুইন
আর প্রতিটি জনপদের দোরগোড়ায় খালিদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
আজ পৃথিবীর প্রতিটি কারবালায় বিশ্বাসীর জায়নামাজ
প্রতিটি কাশ্মীরই তোমার কবিতার খাতা
শত্রুর ধমনী চিরে দিয়ে লেখো নতুন বিপ্লবের গান
ওহুদের রক্তাক্ত উপত্যকা বেয়ে যে পথ দেখিয়ে গেছেন নবী মুহাম্মদ
ও পথেই তোমার চূড়ান্ত মঞ্জিল।

www.pathagar.com

কুয়াশা ফিকে ॥ সিরাজ মুহাম্মদ

কি এক আবেগে আপ্লুত ছিল
তোমার সকল সাথী,
প্রতিটি শব্দকে ভেবে নিত তারা
আঁধারে আলোর বাতি।।

সেই সে আলোকে ধারণ করে
করেছে বিশ্ব জয়,
আজো যার আলো ছড়িয়ে আছে
পৃথিবীর সর্বময়।

দীনহীন সব বেদুইন আরব
পেয়েছে সুখের ছোঁয়া,
তরতাজা জ্ঞাতি টগবগে ঘোড়া
তবু সম্মুখে ধোঁয়া।

কেন এই ধোঁয়া পেরেশান জাতি
মনজিল কত দূর,
ফাঁকে ফাঁকে দেখি কুয়াশা ফিকে
দিগন্তে আলো নূর।

যুবা যত জোয়ান জাতির
জেগে ওঠ সেই নূরে,
প্রস্তুতি নাও নিজেকে সাজাও
পৃথিবী যাবেই ঘুরে।

নাত-ই-রাসূল (সা) ॥ সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিঞা

মরুর দেশে ফুটেছে ফুল
খবর নিলে আয়,
জগৎবাসী ফুলের গন্ধ
পাওয়ার আশায়।

www.pathagar.com

সে ফুল আবদুল্লার ঘরে
বারই রবিউল আউয়াল 'পরে
মা আমিনার উদরে
ফুটেছে ধরায়।
খাতেমুন্নাবিইন সে ফুল
শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী –মোহাম্মদ রাসূল।
আল্লার দোস্ত শান্তি দূত
এলো দুনিয়ায়।
নবীগণের নবী তিনি
দু'জাহানের বাদশাহ্ তিনি
পাপীগণের ভরসা নবী
কয় তারামিঞায়।

আলোকিত মহামহীম ॥ সোহ্‌রাব আসাদ

ঘোর শ্রাবণের কৃষ্ণামানিশার পর্দা ছিঁড়ে
লাখো চাঁদের জ্যোতি নিয়ে তোমার শুভাগমন হে দীপ্তি মহামহীম।
আরব-বেদুইন শিশুর অস্ফুট কলহাস্যেও তাই
সে কী সুরের মূর্ছনা...।
টেম্‌স থেকে টাইগ্রিসের শীতল জলরাশিতে খেলে যায় আনন্দের হিল্লোল-
নির্নিমেষ বাঁক নেয় স্রোতস্বিনী।
সমুদ্রের নীল ছাপিয়ে আসে ফেনিল বুদ্বুদের অফুরান ঢেউয়ের দোলা
ইঙ্গ-আফ্রো, অস্ট্রেলেশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে
সাড়ম্বর শোর ওঠে আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান!

বনানীর প্রান্ত ছুঁয়ে পাখিদের গুঞ্জরিত শব্দের তুলিতে অবিরাম
এঁকে যায় নয়নাভিরাম দৃশ্যপট।
বুনো শালিকদের নরম প্রার্থনার অবোধ্য মর্মধ্বনি-
তোমার প্রেমময় স্পর্শে বাঙময় হয়ে ওঠে সহসা।
পয়োধির ছন্দময় ঢেউ ভেঙ্গে ছিটকে পড়া
আলোর মিছিলে আন্দোলিত হয় মাছেদের শীতল শরীর।

www.pathagar.com

তোমার পূত অস্তিত্বের খিলান থেকে বিচ্ছুরিত গোলাপেরা
হেসে ওঠে ব্যাবিলনের মায়াবী উদ্যান জুড়ে।
চোখের তারায় নেচে যায় প্রভাতের শিউলিঝরা বাতাস।
বিহঙ্গকুলের আকাশ ছোঁয়া মালার সারি দীর্ঘতর ছায়া ফেলে মৃত্তিকার সবুজ চাদরে!
জিবরীলের ডানায় নেমে আসে জ্যোস্নামেদুর মেশকের ঘাম।
তারপর...
ফুল-পাখি-স্রোতস্বিনী, ফলবতী আনারবৃক্ষ আর
নক্ষত্রচারীদের কোরাস কণ্ঠে গীত হয় কী দারুণ আলেখ্যকথা।
পৃথিবী আবার ফল-পুষ্পভারে সেজদাবনত হয়।
ঝরনারা একটানা চলার বেগে নৈসর্গিক সুর তোলে–
বালাগাল উলা বিকামালিহী...
হে প্রেমাস্পদ নূরে মুজাস্‌সাম তোমার জন্য তাই
লাখো দরূদ– সাল্লাল্লাহু আলাইকাস সালাম।

তোমার ভালবাসা ॥ রুকনুজ্জামান কাজল

হঠাৎ বেভুল চৈতন্যে জেগে ওঠে তোমার নাম
আমার সমস্ত অস্তিত্বে উদ্দীপনার জোয়ার আসে
আঁধার কেটে যায়–
দু'চোখ ভরে তোমার সৌন্দর্য অবলোকন করি
তারপর
হৃদয়ে মাতম জাগে, জাগে আদিগন্ত ব্যাকুলতা
অন্তরে বিপুল অস্থিরতার বিস্তার ঘটে;
জানি না এ অস্থিরতা কিসের–
সেকি দুঃখ না আনন্দ!
সহসা আঁখি পল্লবে গড়িয়ে পড়ে
দু'ফোঁটা অশ্রু। জানি না এ কিসের অশ্রু!
হয়তো তোমার সান্নিধ্য না পাওয়ার বেদনা
হয়তো তোমার প্রতি প্রেমের অভিব্যক্তি হে রাসূল!
হয়তো তোমার জন্য এটাই আমার ভালবাসা।

www.pathagar.com

রাসূল তোমার কাছে ফরিয়াদ ॥ বান্দা হাফিজ

তোমার আশির্বাদ খেয়ে এই আমরা যারা হৃষ্টপুষ্ট করেছি শরীর
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ নই
তোমার করুণ কাকুতি দিয়ে শাপমুক্ত জীবন করেছো যাদের
সেই আমরা উচ্চারণ করি না তোমার নাম
তুমি অভিশাপ দিও না- ফিরিয়ে নিও না মুখ- পতনোন্মুখ এই আমাদের থেকে
হাজারো পঙ্কিলতার মাঝে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তোমার সেই সীমাহীন শুভ্রতা
হারিয়ে ফেলেছি বিশ্বাস– পরিচ্ছন্ন ক্ষমা পাবার
হে রাসূল! অনুতপ্ত আমাদের রক্ষায় তোমার দ্বিতীয় উচ্চারণ হোক :
এদের শুভ্র করো প্রভু
ঠাণ্ডা করো এদের তাপিত হৃদয়।

পথের পথিক ভোলা ॥ গোলাম নবী পান্না

আঁধার যখন সখ্যতা পায় মত্ত হতে খেলায়,
সেই সে আঁধার ঘিরে যদি মিশি কালোর মেলায়।
তখন আলোর পরশ পেতে হাতছানি দেয় মন,
অপেক্ষাতে কাটে প্রহর উচাটন এক ক্ষণ।
কারণ আমি পথ ভুলে হই পথের পথিক ভোলা,
উলুবুলু মনে কেবল হাজার রকম দোলা।
দোলাতো নয় যন্ত্রণার এক আড়াল করা দুখ,
কালো যেনো খাচ্ছে গিলে আলোর যতো মুখ।
তখনও যে আলোর মানুষ খুঁজি আশে পাশে,
ভান করা জনসংখ্যা তবু দাঁত দেখিয়ে হাসে।
এমন সময় আলোর পথের নিশান বাকী,
রাসূলুল্লাহ প্রিয় তাই, তাঁকেই ডেকে থাকি।

www.pathagar.com

না'তে মুস্তাফা (সা) ॥ আবুল হোসাইন মাহমুদ

রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন
খাতেমু আন্‌নাবিয়্যীন–
তোমার নূরের আলোয়
মনের আঁধার সরালাম
আমি ধন্য হলাম বুকে নিয়ে
তোমার মধুর নাম ॥

ছিল না মান মাটির দেহের
শুধুই মূল্যহীন
মাখলুকাতের সেরা হলাম
নিয়ে তোমার ঋণ।
তোমার পরশ পেয়ে সুখে
কাটছে দিবা-যাম ॥

দিন ছিল না রাত ছিল না ছিল দুখের কাল
হাজার রকম কষ্ট ছিল, ছিল যে জঞ্জাল।

আমি সুখের নাগাল পেয়ে গেছি
কুরআন হাতে পেয়ে
আনলে তুমি সব মানুষের
মুক্তিরই গান গেয়ে।
বিশ্ববাসী তাইতো তোমায়
জানায় লাখ সালাম।

প্রতীক্ষা ও প্রাপ্তি ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস

নিস্তব্ধ শীতের রাত, হঠাৎ বৃষ্টি,
ঘুম ভেঙ্গে যায় অনাবিল এক স্পর্শে,
আমাকে ডেকে নেয় কাছে
কানে কানে বলে, খুলে দাও মনের দুয়ার
দেখবে পর্দায় অপরূপ অসীম প্রতিচ্ছবি তার।

www.pathagar.com

আমি ছুটে যাই, হাতছানির দিকে,
দৃষ্টি স্থির হয়, মায়াবী এক পর্দায়,
প্রতীক্ষায় থাকি সেই আদি-অনন্তের
অবশেষে প্রতীক্ষার পাষাণ গলে যায়
শিশির নুয়ে বলে আমি ঝরে পড়ছি
রাত বলে আমার কাছে দেবার মত সময় নেই
জুঁই-চাপা আর কামিনী। তাবৎ খুশবু ঢেলে দেয়
জোনাকি বলে আমাদের ক্ষীণ আলো প্রায় ম্লান
ঝিঁঝিঁ পোকা ঐ নামে ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত।

আলো বলে আমি আর আঁধারে লুকোতে পারছিলা
পাখি বলে গেয়ে ওঠার সময় হল, ঐ মধু নাম
তখনই মনের অন্তহীন আঙিনায়
স্বরূপে উদ্ভাসিত, ঝলমলে হীরার রশ্মি।

সুবহে সাদেক ভেসে উঠলো পূর্ব দিগন্তে
শিশিরসিক্ত বাতাস স্পর্শে বলে গেল,
মাশরিক হতে মাগরিব, শীমাল হতে জুনুব
সব সৃষ্টিতেই সে শিল্পীর তুলি বিরাজমান।
অমানিশার প্রহর গুনছ যার প্রতীক্ষায়
সে তো মিশে আছে তোমার রক্তকণিকায়
বিস্ময়ের ঘোর কেটে, দৃষ্টি চলে যায়,
দিক-দিগন্তের ঐ সীমাহীন সীমানায়।

স্বপ্ন আদর ॥ ইসমাইল হোসেন সৌরভ

আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় শুধু
কান পেতে আছি,
শ্রাবণের ধারা কলকল সুরে
মনের দরজা খুলে একান্ত অন্তরে
আসবে যেদিন তোমার রহম
বেহেশতী বার্তা বহন করে
বসবে আমার খুব কাছাকাছি।

www.pathagar.com

আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় শুধু
পথ চেয়ে আছি,
দখিনা হাওয়ার হিমেল পরশ
আমি তোমায় দেবো,
আসবে কি?
জানো,
তুমিহীন লেখার টেবিল অবশ অবশ।

আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় শুধু
বসে আছি,
আমার কবিতার প্রতিটি পাতা
পূত পবিত্র মনের মিম্বার
আমি সেথায় দাঁড়াবো তোমায় নিয়ে
স্বরচিত কবিতার আসর
বিনিময়ে আমায় দিও স্বপ্ন আদর!

রাসূল স্মরণে ॥ উম্মে হানি পারভিন

মহানবী (সা) আলাইহিস সাল্লাম
সর্বদা করি আমি তোমার গুণগান।

আরব দেশেতে তুমি করিলে জন্মগ্রহণ
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান খোদা তোমায় করিল প্রদান।

প্রথমে সালাম করি তোমাকে হে নবী
সর্বস্থানে তুমি দ্বীনের আলো করিলে প্রচার।

তুমি এক খোদা ছাড়া কাউকে করোনি ভয়
তাইতো সারা পৃথিবী তোমার কথা কয়।

www.pathagar.com

সফল প্রেম ॥ মাহফুজুর রহমান চৌধুরী

নবীর প্রেমে গড়াগড়ি
নবীর প্রেমে কান্নাকাটি
আমরা কি ভাই একটুখানি
নবীর পথে চলতে পারি!

নবীর প্রেমে বুলির ঝুড়ি
নবীর প্রেমে শ্লোগান-মিছিল
আমরা কি ভাই একটুখানি
নবীর সুন্নাত মানতে পারি!

নবীর প্রেমে গান গাই
নবীর প্রেমে লিখন লিখি
আমরা কি ভাই নবীর প্রেমে
জীবনটাকে গড়তে পারি!

নবীর প্রেমে খরচ করি
নবীর প্রেমে দেয়াল লিখি
আমরা কি ভাই একটুখানি
নবীর সমাজ গড়তে পারি!

www.pathagar.com

রাসূল (সা) যুগে আরবী কবিতার ধারা ও প্রকৃতি

ড. আবদুল জলীল

□

শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক কা'বা গৃহ মক্কায় থাকার কারণে জাহিলী যুগে মক্কা ছিল তুনলাতুলকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থল। গোত্রে গোত্রে কলহ ও হানাহানি এখানে ছিল না বললেই চলে- যা গ্রামীণ যাযাবরদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই জাহিলী যুগে এখানে কবিতারও তেমন প্রসার ঘটেনি। কারণ তৎকারে কবিতা ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুপ্রেরণাদায়ক মন্ত্রবিশেষ। কবির কবিতায় থাকত স্বীয় গোত্রের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস- তা শুনে বীরের হৃদয় টগবগ করে উঠত, ফলে দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা অন্য গোত্র ও প্রতিপক্ষের ওপর। আবার প্রতিপক্ষীয় গোত্রের নিন্দাবাদ ও কুৎসা থাকত তাতে, যার ফলে তারা অপমানবোধ করত এবং ক্ষিপ্ত হত কবির গোত্রের ওপর। তাই তাদের পক্ষ থেকেও আসত এর প্রতিউত্তর। কিন্তু মক্কায় এই বিরোধ না থাকায় কবিতারও প্রসার ছিল না।

রাসূল (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর দা'ওয়াতের ফলে কিছু লোক তাদের পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হল। আর কিছু লোক তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিক ধর্মে অটল রইল। এমনিভাবে সৃষ্টি হল দুটি দলের। রাসূল (সা) ও নব্য মুসলমানদের দা'ওয়াতের ফলে তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় পৌত্তলিক দলের লোকদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফলে মুসলিমগণ পরিণত হলেন তাদের প্রতিপক্ষে। তাই তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানগণ প্রথমত হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসূল (সা) ও মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করেন। শত্রুপক্ষ নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং সেখানে মুসলমানদের অকল্পনীয় মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মক্কার পৌত্তলিকগণ ক্রোধের প্রচণ্ডতায় ফুঁসে ওঠে এবং আর কিছু না পেয়ে কাব্যবাণ নিক্ষেপ করে মনের আক্রোস মিটাবার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। প্রকৃতিগতভাবে প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা আরব তথা মক্কাবাসীর হৃদয়ে এবার কবিতার তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূল (সা) ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করতে এগিয়ে আসেন মক্কার প্রতিভাবান একদল কবি। আবূ

www.pathagar.com

সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবনুস-যিবা'রা, দিরার ইবনুল খাত্তাব, 'আমর ইবনুল 'আস, আবূ 'আয্যা আল জুমাহী, আর হারিছ ইবন হিশাম, হুবায়রা ইবন ওয়াহাব আল-মাখযূমী, মুসাফি' ইবন 'আবদ মানাফ ও আবূ উসামা মু'আবিয়া ইবন যুহায়র প্রমুখের নাম তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের রচিত নিন্দাবাদমূলক কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাদের বাক্যবাণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং নতুন দীনের দাওয়াত পৌছাবার জন্য মদীনার মুসলমানদের পক্ষ থেকে বুক টান করে এগিয়ে আসেন হাসসান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) প্রমুখ কবিবর্গ। এভাবেই তৎকালীন আরবের দু'টি ধারায় কবিতা রচিত হতে থাকে। একটি মক্কার ধারায়, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মূর্তির পক্ষাবলম্বন করে যার প্রতি তারা বিশ্বাস এনেছিল। তারা সর্বশক্তি দিয়ে নতুন দীনের বিরোধিতা করে, যে দীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন রাসূল করীম (সা)। এ দলের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তিনজন কবি: আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা ও মু'আবিয়া ইবন যুহায়র। আর অপরটি হল মদীনার ধারায়, যারা রাসূল (সা)-এর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মক্কার কবিদের রচিত কবিতার উত্তর দেন এবং নতুন দীনের দাওয়াত দেন। এদের মধ্যেও তিনজন বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারা হলেন : হাসসান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)। উভয় পক্ষই ইসলাম সম্পর্কে বাদানুবাদমূলক কবিতা রচনার প্রয়াস পায়।

মক্কার কবিদের পেছনে আর একদল কবি এসে অবস্থান নেয়। তন্মধ্যে য়াহূদী কবি কা'ব ইবন আশরাফ এবং অন্যান্য গোত্রের কবিদের একটি দলও ছিল, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। যথা উমায়্যা ইবন আবিস-সালত- যে দীন-ই-হানীফ এর অনুসন্ধানে ছিল কিন্তু রাসূল (সা)-এর প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণ করত।

মদীনার কবিগণের কবিতার শৈল্পিক ধারা ছিল মক্কার কবিগণ থেকে ভিন্ন। তাদের কেউ কেউ কুরায়শদের নিন্দাবাদ করত প্রাচীন জাহিলী যুগের মর্ম ও বিষয়বস্তু দ্বারা। আর কেউ কেউ নিন্দাবাদ করত নবতর ইসলামী মর্ম ও বিষয়বস্তু দ্বারা। যেমন আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী বলেন, হাসসান ইবন ছাবিত ও কা'ব ইবন মালিক তাদেরকে বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রীতিনীতি নিয়ে কবিতা রচনা করে লজ্জা দিতেন, যেমনটি করা হত জাহিলী যুগে। আর 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) তাদেরকে লজ্জা দিতেন কুফরী নিয়ে; তাদেরকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করতেন এবং জানিয়ে দিতেন যে, কুফরীর চেয়ে তাদের মধ্যে আর কোন খারাপ ও ঘৃণার বস্তু নেই। সে সময়ে কাফির কুরায়শদের কাছে হাসসান ও কা'ব (রা)-এর কবিতা বড় কষ্টদায়ক বলে মনে হত। তাঁদের কবিতায়ই তারা বেশী মর্মাহত হত। আর ইবন রাওয়াহার কবিতা নিতান্ত মামুলী ও হাল্কা ধরনের

www.pathagar.com

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বলে মনে হত, যাকে তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিতনা। পরবর্তী কালে যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলামকে ভালভাবে বুঝল, তখন 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কবিতাই তাদেরকে বেশী কষ্ট দিত। পূর্বের কৃত কর্মের জন্য তারা বেশী লজ্জা ও বেদনা অনুভব করত।

মোটকথা মদীনার কবিদের সুস্পষ্ট দু'টি ধারা ও দিক ছিল, একটি হল জাহিলী ধারা, যার ধারক-বাহক ও প্রবর্তক ছিলেন হাসসান ইবন ছাবিত ও কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)। তাঁরা কুরায়শদের নিন্দাবাদ করতেন জাহিলী যুগের স্টাইলে, যাতে তারা কষ্ট পেত ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এই জাহিলী স্টাইল তাদের জন্য মোটেই পীড়াদায়ক ছিল না। কারণ ইসলাম তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। অপরটি ছিল ইসলামী ধারা, যার ধারক-বাহক ও প্রবর্তক ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা), যিনি কুরায়শদের নিন্দাবাদ করতেন তাদের কুফর ও শিরক, মূর্তি পূজা এবং সত্য ও নতুন দীনের আহ্বানে সাড়া না দেয়া নিয়ে। এ নিন্দাবাদ কুরায়শদেরকে জাহিলী অবস্থায় তথা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মোটেও কষ্ট দিত না। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পর এটাই তাদের জন্য সর্বাধিক পীড়াদায়ক হয়ে দেখ দেয়।

কবিতার এ ধারা চলতে থাকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলে আরববাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং একে একে সকলেই তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। এমনকি ইসলামবিরোধী ভূমিকায় জোরে শোরে নেমেছিল যে কবিকুল, তারাও সকলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই মক্কা-মদীনার মধ্যে কাব্যিক যে দ্বন্দ্ব এতকাল ধরে চলে আসছিল স্বভাবতই সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ইসলাম, মুসলমান ও রাসূল (সা)- কে ব্যঙ্গ করে তারা যে ধারায় কবিতা রচনা করে আসছিল তা পরিত্যাগ করে তারা রাসূল (সা) ও মদীনার সাহাবী কবিকুলের পাশে এসে দাঁড়ান। ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামের প্রবর্তক রাসূল (সা)-কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন এবং দীনের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচারে রত হন। এমনিভাবে মক্কা বিজয়পূর্ব দু'টি শৈল্পিক ধারা এক ধারায় লীন হয়ে যায় এবং সম্মিলিত ধারায় ইসলামের খিদমতে রচিত ও নিবেদিত হতে থাকে তাদের কবিতা। এ ছাড়া মক্কার কবিকুল বিগত জীবনে ইসলামের বিরোধিতা করে যে অপরাধ করেছিল, রাসূল (সা)-এর কাছে সে অপরাধ ও অন্যায়ের ক্ষমা চেয়েও তারা কবিতা রচনা করা শুরু করেন। তাদের সে সব কবিতাও ছিল পুরো ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত।

মক্কায় থাকাকালে তার জাহেলী ও মুশরেকী জীবনে ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে তিনি যে কবিতা রচনা করেন এ কবিতায় তা থেকে সুস্পষ্টরূপে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর থেকে সকল কবির কবিতা একই ধারায় রচিত হতে থাকে। নতুন দীনের প্রচার-প্রসার, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং তার প্রতি দা'ওয়াত দেয়াই

www.pathagar.com

ছিল তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর প্রসঙ্গক্রমেই মক্কার কবিগণ এর পাশাপাশি তাদের বিগত জীবনের অপরাধ এবং ইসলাম ও রাসূল (সা) সম্পর্কে তাদের ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কবিতা রচনা করতে থাকেন। এদের সকলের কবিতাই যে ইসলামী ভাবধারায় আপ্লুত ছিল তা বলাই বাহুল্য। এমনিভাবে চলতে থাকে কবিতা রচনার ধারা।

রাসূল (সা) ইনতিকাল করলে অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় কবিকুলও বেদনাহত হন,তাঁর শোকে কেঁদে বুক ভাসান এবং রচনা করেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও ব্যথাভরা শোক গাথা। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী কবিগণ যেমনি ভাবে এ শোক গাথা রচনায় অংশ নেন, মক্কা বিজয় পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার কবিগণও অদ্রূপ তাতে অংশ নেন। কোনক্রমেই তারা পিছিয়ে থাকেননি এ শোকগাথা রচনা থেকে। তাই তো আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ যিনি অত্যন্ত দরাজ কণ্ঠে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন রাসূল (সা) ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে– তিনিই রাসূল (সা)-এর ইনতিকালে মর্মস্পর্শী কবিতা তথা হৃদয়বিদারক শোকগাঁথা রচনা করেন।

রাসূল (সা) যুগের আরবী কবিতা তার শব্দ চয়ন ও প্রয়োগ, বাক্য গঠন ও বর্ণনাভঙ্গি, আর্থিক ও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

শাব্দিক বৈশিষ্ট্য : এ সময়কার কবিতা জাহিলী যুগের কবিতার তুলনায় শাব্দিক দিক থেকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। বস্তুত জাহিলী যুগের কবিতার শব্দসম্ভার এতই কঠিন যে, তার মর্ম বুঝতে আরবী অভিধানের প্রয়োজন অবশ্যাম্ভাবী। শানদারা আযদী (মৃ. ৫১০ খৃ.)-র দস্যুবৃত্তির বর্ণনা, ইমরুউল কায়েস (খৃ. ৫৪০ খৃ.)-এর ঘোড়ার বর্ণনা, আনতারা ইবন শাদ্দাদ (মৃ. ৬১০ খৃ.)-এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা প্রভৃতি এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু রাসূল (সা) যুগের কবিতার শব্দসম্ভার খুবই ঝরঝরে ও প্রাঞ্জল। অত্যন্ত সহজ সরল শব্দ দিয়ে রচিত হয়েছে এ যুগের কাব্যের ভিত।

এ যুগের কবিতায় সহজ সরল ও প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহারের কারণ হল, এতে অধিকাংশই ইসলাম, হিদায়ত, কুরআন ও তার ফযীলত, রাসূল (সা) ও তাঁর পরিচালিত জিহাদ, সে জিহাদে মুসলিমদের বীরত্ব, বিপথগামী লোকদের নিন্দাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এসব বিষয় আলোচনার জন্য কঠিন ও অপরিচিত শব্দের প্রয়োজন হয়েছে। আর এসব বিষয় আলোচনার জন্য কঠিন ও অপরিচিত শব্দের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে এতে বেদুইন জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেনি। অর্থাৎ তাদের ভ্রমণ ও উষ্ট্রীয় বিবরণ, হিংস্র-জংলী জীব জানোয়ার ও তাদের শিকার প্রভৃতি বিষয়ে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। এসব বিষয়কে বাঙ্ময় ও হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলতে কঠিন ও অপরিচিত শব্দের প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্যগত বৈশিষ্ট্য

এ যুগের কবিতায় আমরা সর্বপ্রথম যে ধারা ও পদ্ধতি বা স্টাইল লক্ষ্য করি, তা হল বর্ণনা ভঙ্গির সাবলীলতা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর কারণ হল, কুরআন কারীমের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা এ যুগের কবিতা প্রভাবিত হয়েছে। আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনাভঙ্গি হল, এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে মানুষকে আহ্বান করা, যা তারা সহজে বুঝতে পারে। বর্ণনাভঙ্গির এ সাবলীলতা সরাসরি কুরআন কারীম থেকে শব্দ চয়নের ফলেও সূচিত হয়েছে। হাসসান বিন সাবিত (মৃ. ৬৭৪ খৃ.), নাবিগা আন জাদী (মৃ. ৬৮৪ খৃ.), নুমান ইবনে বাশীর প্রমুখের কবিতা এর জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে টিকে রয়েছে।

বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

রাসূল (সা)-এর আগমন এবং মানব জাতির দিগদর্শন আল-কুরআনুল কারীম নাযিলের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়। আর তা এ যুগের কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয় বরং এ মূল্যবোধ আরবী কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ প্রভাবের ফলে আরবী কবিতায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন :

ক. কিছু ধারা, যা জাহিলী যুগ থেকে চলে আসছিল– বর্জিত হয়। যথা : অশ্লীল গীতি, মদ জুয়ার বর্ণনা, অশোভন নিন্দাবাদ, মিথ্যা প্রশংসা তথা চাটুকারিতা, শিকারের বর্ণনা প্রভৃতি।

খ. কিছু ধারা পূর্বের ন্যায়ই অবশিষ্ট থাকে তবে তা ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত হয়ে তদনুযায়ী রচিত হতে থাকে। যথা : ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত কবিতা, যুদ্ধ ও বীরত্বগাথা, গৌরবগাথা, শোকগাথা, প্রশংসা বা স্তুতি গাথা, নিন্দাবাদমূলক কবিতা, জ্ঞান ও নীতিকথা বিষয়ক কবিতা, গীতিকাব্য প্রভৃতি।

গ. কিছু নতুন ধারা আরবী কাব্যে সংযোজিত হয় যা ইতিপূর্বে ছিল না। যথা : ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তের কবিতা, সমালোচনা ও ভর্ৎসনামূলক কবিতা (নাকায়েদ), যুদ্ধ ও বিজয়ের বীরত্বগাথামূলক গীতিকাব্য প্রভৃতি।

রাসূল (সা) যুগের আরবী কাব্যে একদিকে যেমন পূতপবিত্র নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির সারকথা বিবৃত হয়েছে এবং কল্পনার ফানুস উড়ানোর পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকচ্ছটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি গড়ে উঠেছে শক্তিশালী জাহেলী ধারার বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কুরআনী স্টাইল, যার আদলে রচিত হয়েছে পরবর্তী কালের কবিতা। ■

www.pathagar.com

ছোটদের সাথে মহানবীর (সা) আচরণ

ড. মুহাম্মদ আবদুল হক

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সেরা মানুষ। গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্যই তিনি মডেল, অনুপম আদর্শ নমুনা। তাঁর ৬৩ বছরের জীবন এক সীমাহীন সমুদ্রের মত। যতই আলোচনা করা হোক অথবা যত বিষয়ে বিন্যস্ত করে লেখা হোক তাঁর জীবনচর্চার সীমা বা চাহিদা পূরণ হবে না।

তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যে যারা নিজেদেরকে গঠন করেছেন তাঁর অনুপম মডেলের অনুকরণে তারা হচ্ছেন : সাহাবী বা সাথীবৃন্দ (রা)। ইতিহাসে-সমাজে মানুষের জন্য তাঁরা তারকাস্বরূপ।

আলকুরআনে বলা হয়েছে :"তোমাদের জন্য উত্তম মডেল হচ্ছে : আল্লাহর রাসূল (সা)।"

হাদীসে বলা হয়েছে : "আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন আকাশের তারকাস্বরূপ।"

আজকের কিশোর ও বালক-বালিকাদের সম্মুখে মহানবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন ও চরিত্র তুলে ধরার প্রয়োজন অতীতের চেয়ে অনেক বেশী।

শিশু-কিশোর বা বালক-বালিকাদের সাথে মহানবী (সা) এর আচরণ ও সম্পর্কের চর্চা ও অনুশীলন আমাদের সমাজে খুবই কম। ইসলামের চর্চাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এ দিকটি অবহেলিত। এমনকি মসজিদেও শিশু-কিশোরদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়।

মহানবী (সা) বলেছেন : "যারা আমাদের ছোটদেরকে আদর করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।" আমরা ছোটদের থেকে সম্মান পেতে চাই কিন্তু ছোটদের আদর-স্নেহ দিতে ভুলে যাই।

মহানবী (সা) ছোটদেরকে প্রথমে সালাম দিতেন আর আমরা ছোটদের সালাম পেতে চাই, দিতে চাই না।

মসজিদে ছোটদেরকে ডেকে তাঁর পাশে দাঁড় করাতেন। আমরা মসজিদে বালকদেরকে দূর দূর করে পিছনের দিকে পাঠিয়ে দেই। নামায শুরু হওয়ার পরেও পিছনে পাঠানোর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এমনকি নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত বালকদেরকে পিছনে পাঠানো চলতে থাকে।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) এর উপর ঈমান এনে প্রথম মুসলমান হয়েছেন পৃথিবীর সেরা নারী খাদীজা (রা)। তারপর বালক আলী (রা)।

বালকদের প্রতি মহানবী (সা)-এর আচরণ ছিল স্নেহের-মধুর ও মানবিক। তাই মক্কা জীবনের চরম প্রতিকূল ও বৈরী পরিবেশেও বালকরা ইসলাম গ্রহণ করে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বালক সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুখ্যাত আবু জাহল একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে ধরে প্রহার করে। ইবনে মাসউদ (রা) আবু জাহলের হাত থেকে ছুটে তার গালে একটি চড় মেরে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আবু জাহল মুসলমান বালক ইবনে মাসউদের হাতে প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বালক ইবনে মাসউদই হচ্ছে প্রথম মুসলমান যে প্রথম মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফের তথা তাদের নেতা আবু জাহলের গায়ে আঘাত করতে সক্ষম হয়। বদরের রণাঙ্গনে এই বালক ইবনে মাসউদই আবু জাহলের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন।

মহানবী (সা) ছোটদের সাথে ওদের মত করেই কথা বলতেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্মিলিতভাবে বের হলেও পথে ছেলে মেয়েদের সাথে দেখা হলে তাদের সাথে স্নেহসুলভ আলাপ করতেন। শিশুদেরকে কোলে তুলে নিতেন। শিশুদের কষ্ট হতে পারে এমন কাজ থেকে তিনি বিরত থাকতেন। একবার তিনি একটি ছোট ছেলের সাথে কথা বলার জন্য হাঁটু মাটিতে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। মহানবী (সা) এর চারিত্রিক যে কয়েকটি দিক তৎকালীন আরব সমাজে জনপ্রিয়তা ও বহুল পরিচিতি লাভ করে তার অন্যতম হচ্ছে ছোটদের প্রতি মহানবীর স্নেহ ও মানবিক অনুপম আচরণ।

মহানবী (সা) এর দাওয়াতকে বড়রা বিবেচনা করেছে বুদ্ধি বিবেক দিয়ে। কিন্তু ছোটরা বিবেচনা করেছে মহানবীর আমল ও মানবিক দিক দিয়ে।

মহানবী ছোটদেরকে যেভাবে ভালবাসতেন ছোটরাও তাঁকে অধিক ভালবাসতো। ছোটদের সাথে তিনি খেলাধুলাও করেছেন। একবার এক সাহাবী রাসূল (সা) এর ছোটদের প্রতি এতটা অধিক সম্পর্ককে তাঁর বক্তিত্ব ও পদের পরিপন্থী মনে করে তাঁকে এ বিষয়ে বারণ করতে চাইলেন। মহানবীর প্রতি সম্মানবোধের কারণে সাহাবী একটু ঘুরিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন : "রাসূল, আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে আছে। তবে কিন্তু আমরা তাদেরকে এতটা আদর করি না।"

সাহাবী যে পদ্ধতিতেই উপস্থাপন করুন না কেন, মহানবী (সা) সাহাবীর বক্তব্য ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে কি বুঝাতে চাচ্ছেন। মহানবী কঠোর অথচ সুন্দরভাবে তার জবাব দিলেন, "কোন ব্যক্তির অন্তর থেকে যদি আল্লাহ্ তায়ালা স্নেহ-মায়া-মমতা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তার ব্যাপারে আমার কোন মন্তব্য নেই।" সাহাবী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন।

মহানবীর ছোটদের প্রতি ভালবাসার খবর মদীনায় পৌঁছেছিল হিজরতের পূর্বেই। তাই

www.pathagar.com

তিনি যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে একদল বালক-বালিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সাহাবীগণ সকলেই মহানবীকে ভালবাসতেন জীবনের বিনিময়েও। কিন্তু ছোটদের ভালবাসার ছিল ভিন্ন চিত্র। আবু জাহলকে বদর যুদ্ধে ধরাশায়ী করেছে কোন বয়স্ক মুসলমান নয়। বরং মুয়ায ও মুয়াব্বেয নামক দুই সহোদর বালক। মহানবীর প্রতি ঈমান ও ভালবাসা তাদেরকে উজ্জীবিত করেছে মহানবীর প্রধান শত্রু– যার হাতে মহানবী শারীরিকভাবেও নির্যাতিত হয়েছেন সেই আবু জাহলকে হত্যা করার জন্য।

মহানবীর আদরের বালক মুয়ায এবং তার ভাই মুয়াব্বেয যখন শুনেছে মহানবীর প্রতি আবু জাহলের নির্যাতনের কথা, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কখনো যদি আল্লাহ সুযোগ দেন তা হলে তারা আবু জাহলকে হত্যা করবে। দুই ভাই যৌথভাবে নয়, এককভাবেই দু জনকেই আবু জাহলকে হত্যার প্রত্যয় ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে দু ভাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ঘোষণা করে। এ জন্য তারা দুটো ছুরি সংগ্রহ করে প্রস্তুত করেও রেখেছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে সাহাবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের সময় যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, হঠাৎ করে আমি দেখতে পেলাম আমার দু পাশে দুটি বালক। রণাঙ্গনে এভাবে আমার অবস্থানে আমি কিছুটা বিচলিত ছিলাম। কিছুক্ষণ পর একটি বালক আমার নিকটে এসে অপর বালকটিকে আড়াল করে বললো : চাচা! আবু জাহল কে? আমি বললাম : আবু জাহলকে তোমার কেন প্রয়োজন? সে বললো, আমি শুনেছি আবু জাহল আমাদের নবীকে কষ্ট দিয়েছে, নির্যাতন করেছে, তাই তাকে দেখা মাত্রই আমি হত্যা করবো। আমি তাকে বললাম : ঠিক আছে যখন আমি রণাঙ্গনে আবু জাহলকে দেখবো তখন তোমাকে দেখিয়ে দেব। একটু পরেই অপর বালকটিও এসে একই পদ্ধতিতে আমাকে প্রশ্ন করলো। আমিও তাকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলাম। এক সময় আবু জাহল আমার দৃষ্টিতে এল। আমি বালকদ্বয়কে ইশারা করে দেখালাম, দূরে ঐ দিকে ঘোড়ার উপর সুপুরুষ গৌরবর্ণের ব্যক্তিই আবু জাহল। বালকদ্বয় বাজপাখির ন্যায় দ্রুত গিয়ে তাকে আঘাত করলো। যেহেতু তারা ছিল ছোট, আবু জাহলের গায়ে সরাসরি আঘাত করার সুযোগ ছিল না বিধায় প্রথমেই তারা ঘোড়ার হাঁটুতে আঘাত করে ঘোড়াকে ধরাশায়ী করে ফেললো। ততক্ষণে আবু জাহলও পড়ে গেল। তারা দ্রুতগতিতে আবু জাহলকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেললো। আবু জাহল ধরাশায়ী হলো। আঘাতের পর আঘাত করে তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত মনে করে আবার দ্রুত স্থান ত্যাগ করে নিজ স্থানে ফিরে এলো। বালকদ্বয়ের পিতার নাম ছিল আফরা। যুদ্ধ শেষে মহানবীর স্নেহধন্য অপর কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এসে দেখলেন আবু জাহল তখনো বেঁচে আছে। ইবনে মাসউদ (রা) তার বুকে বসলেন। আবু জাহল

www.pathagar.com

চোখ খুলে প্রশ্ন করলো কে? উত্তর দিলেন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তোমার খবর কি? আবু জাহল বললো : "দুঃখ আমার, মদীনার কৃষকের দুটি ছেলে আমার এ অবস্থা করেছে, কোন বীর পুরুষ আমাকে ধরাশায়ী করেনি।" ইবনে মাসউদ তার মস্তক দেহ থেকে কেটে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তখন আবু জাহল বললো : গর্দানের গোড়া থেকে কাটবি, তাহলে আমার মাথাটি নেতার মতই বড় দেখাবে। আবু জাহলের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মহানবী (সা)-এর দরবারে গিয়ে আবু জাহলের সাথে তার কথোপকথনের বর্ণনা দিলে মহানবী বললেন : সব নবীর জন্যই কোন না কোন ফেরাউন ছিল। তবে আমার ফেরাউন হলো সবচেয়ে বড়। নবী মূসা (আ)-এর ফেরাউন মৃত্যু আসন্ন দেখে বলেছিল আমি মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনলাম, আর আমার ফেরাউন আবু জাহল মৃত্যুর প্রাক্কালে মাথা বড় করে নেতার মত কেটে তাকে হত্যা করার অনুরোধ করেছে।

রাসূল (সা)-এর স্নেহধন্যে প্রথম যে দাস বা গোলাম মুসলমান হয়েছেন তিনি মহানবীর ঘরের ক্রীতদাস হযরত যায়েদ (রা)। তিনিও ছিলেন বালক।

যায়েদ (রা)-এর পিতা ও চাচা দূর ইয়েমেন থেকে তাদের হারানো ছেলেকে মক্কায় এসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, যায়েদ যদি তার পিতা ও চাচার সাথে মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায় আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেয়া যাবে না। যায়েদকে তার মায়ের করুণ স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শত অনুরোধ করেও রাজি করানো যায়নি। তার কথা ছিল : মাকে বলবেন, আমি ভাল আছি। আমি যে সোনার মানুষ পেয়েছি তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। রাসূলের ঘরে জীবনের বিলাসিতার উপকরণ ছিল না তবুও বালক যায়েদকে পিতা মাতা থেকে যে বিষয়টি অধিক আকৃষ্ট করেছে তা হচ্ছে মহানবী (সা) এর অকৃত্রিম আদর-স্নেহ। এ বালকই হচ্ছেন একমাত্র মুসলমান যার নাম আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিশোর অনাথ সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) যিনি জীবনের সবকিছু খুঁজে পেয়েছেন মহানবীর আদর-ভালবাসায়। যুবক হয়েও রাসূল (সা) এর নিকটেই পড়ে থাকতেন। মসজিদের বারান্দায় রাত কাটাতেন। মহানবী খেলে আবু হুরায়রাও খেতেন। যেদিন মহানবী উপোস করতেন সেদিন আবু হুরায়রাও না খেয়ে থাকতেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল আবদুর রহমান। একদিন মহানবী দেখলেন আবদুর রহমান বিড়াল ছানা অর্থাৎ হুরায়রা নিয়ে খেলা করছেন। তিনি আদর করে ডাকলেন, 'হে বিড়াল ছানার বাপ! (আবু হুরায়রা) কি করছ?' তখন থেকেই কেউ যখন তার নাম জিজ্ঞেস করতো তিনি বলতেন, আবু হুরায়রা। যারা তাকে আবদুর রহমান বলে ডাকতো তিনি তাদেরকে সংশোধন করে দিয়ে মহানবীর আদুরে নাম আবু হুরায়রা বলে দিতেন। এভাবেই রাসূলের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বিখ্যাত হাদীসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবী হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পবিত্র মদীনার গভর্নর হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মহানবীর আরেক প্রিয় বালক আনাস। আট বছরের দিকে তার মা তাকে মহানবী (সা) এর খেদমতে পেশ করেন। মহানবীর ইন্তেকাল পর্যন্ত এ বালক যুবকে পরিণত হয়েও মহানবীর খেদমতে দশ বছর হাসিমুখে ব্যয় করেছেন। পরিণত বয়সে হযরত আনাস (রা) মহানবীর সান্নিধ্যের ও স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতিচারণ করে বলেছেন : 'আমি এমন গুরুজনের সাথে দশটি বছর কাটিয়েছি যিনি দশ বছরে একবারও আমাকে ধমক দিয়ে বলেননি, "তুমি এ কাজটি কেন করেছ? অথবা কেন করনি?' ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালবাসার এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাবে না।

শিশুদেরকে মহানবী চুমু খেতেন। নিজের নাকের সাথে শিশুদের নাক লাগাতেন। আপন নাতি হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হোসাইন (রা) এর সাথে তাঁদের একজনের মত হয়ে খেলা করতেন। শিশুদেরকে কোলে নিয়ে মহল্লায় ঘুরেছেন। কখনো শিশুকে কোলে রেখে নামায পড়েছেন। তাঁর নামাযে শিশুদের আচরণ বাধা ছিল না। একবার ইমায়ের নামের একটি শিশুর একটি ছোট্ট পাখির পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার যখন শিশুটির সাথে মহানবী (সা) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনি তাকে বিভিন্ন কথার সাথে শিশুর পাখির ভাঙ্গাডানা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন।

এত আদরের পরেও কোন অন্যায় আচরণ দেখলে মহানবী শিশুদেরকে তা থেকে বারণ করতেন। একবার হযরত হাসান (রা) সরকারী গুদামের একটি খেজুর মুখে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) ছি, ছি, বলে হাসানকে মুখ থেকে তা ফেলে দিতে বলেন। যদিও আদব শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজ সন্তানদেরকে তিনি প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি কখনও কোন শিশুকে প্রহার করেননি। ■

www.pathagar.com

মহানবীর (সা) পারিবারিক জীবন

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

□

মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো পরিবার। পরিবারের ক্ষুদ্রতম আকার হলো স্বামী-স্ত্রী বা একজন পুরুষ ও একজন নারীর সম্মিলিত বৈবাহিক জীবন আর বৃহৎ সংস্করণ হলো স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, নাতি-নাতনী ইত্যাদি সমন্বিত। দুনিয়ার তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি-কৃষ্টির মূল উৎসও পরিবারকে ভিত্তি করে। তাই পরিবারস্থ সকলের পারস্পরিক সুস্থ ও সমন্বিত আন্তরিক সম্পর্কের উপর সুস্থ ও কল্যাণময় মানব জীবন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভরশীল। সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্য স্বাভাবিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও সমতাপূর্ণ সদাচরণ একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ "তাঁর (আল্লাহর) কুদরতেই নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া, যাতে করে তোমরা তার নিকট গিয়ে প্রশান্তি পেতে পার আর তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভালবাসা ও কামনার সম্পর্ক।" (সূরা আর রূম, আয়াত-২১)

আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ 'আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণশীল হতে, তার মা তাকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দু'বছর ধরে তাকে স্তন্য দান করে তারপর স্তন্য দান বন্ধ করেছে। আমি উপদেশ দিয়েছি এ মর্মে যে, আমার প্রতি এবং অতঃপর তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করো। আর আমার দিকেই (তোমাদের সকলকে) ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লোকমান, আয়াত-১৪)।

মানব-সৃষ্টির আদিতেও ছিলেন মাত্র একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক (হযরত আদম ও মা হাওয়া) তাঁদের থেকে ক্রমান্বয়ে বিশাল মানব সমাজের উৎপত্তি। স্বামী-স্ত্রী কিছুদিনের মধ্যেই পরিণত হয় পিতা-মাতায় এবং তাদের প্রেম ও কামনার ফসলস্বরূপ জন্ম নেয় সন্তান-সন্ততির। অতএব, স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি মানবজাতির ক্রমবিকাশের ধারায় এ তিন চিরন্তন মৌলিক স্তরের মূল ভিত্তি হলো

www.pathagar.com

পরিবার। এ তিনটি মৌলিক স্তরের পারস্পরিক সুস্থ সম্পর্কের উপরই সুষ্ঠু সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। এখানে উপরোক্ত দুটি আয়াতে এ সম্পর্কের ব্যাপারেই মৌলিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহানবীর (সা) জীবনে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। বক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ সন্তান, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা। যদিও তাঁর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন, তবু মাতা-পিতা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ও নির্দেশনা চির অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে গণ্য।

মহানবীর (সা) বয়স যখন ছয় বছর (মতান্তরে সাত বছর)[১] তখন মা আমিনা উম্মে আয়মানসহ শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মদীনায় যান। সেখানে মহানবীর (সা) পরদাদীর (আবদুল মুত্তালিবের মা) মাতৃকুল বনী আদি বিন নাজ্জারের সাথে দেখা করেন এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। মদীনায় পিতা আবদুল্লাহ্ কোথায় কীভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যান এবং তাঁর কোথায় কবর হয় ইত্যাদি বালক মুহাম্মাদ গভীর মনোযোগ ও ভাবাবেগের সাথে অবলোকন করেন। শিশুকালে এ দেখা তাঁর স্মৃতিপটে চির অম্লান থাকে এবং তিনি যখন হিযরতের পর মদীনায় গমন করেন তখন তিনি সে সকল স্থান চিনতে পারেন এবং সেখানকার সকল স্মৃতি স্মরণ করে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন।

শৈশবে মদীনায় আব্বার কবর দেখে আম্মার সাথে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে আবওয়া নামক স্থানে এসে মা আমিনা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। বালক মুহম্মাদ উম্মে আয়মানের সাথে মক্কায় পৌছেন। উমরায়ে হুদাইবিয়ার সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবওয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর মায়ের কবর যথাযথ চিনতে পারেন, সেখানে ক্ষণিক যাত্রাবিরতি করে কবর যিয়ারত করেন এবং কবরের স্থানটি ঠিকঠাক করে গভীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত সাহাবাগণও কেঁদে ফেলেন। এ কান্নার ব্যাপারে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি তো কান্না করতে নিষেধ করেছেন', তখন তিনি সহজভাবে উত্তর দিলেন : 'তাঁর (মায়ের) দয়া, স্নেহ, মমতার কথা স্মরণ হওয়াতে আমি কেঁদে ফেললাম।' মহানবীর (সা) মায়ের কবর পরিদর্শন ও মাতৃস্নেহের স্মরণে কান্নার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী এবং তাবকাতে ইবনে সা'দে হযরত বুরায়দাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাগণ এ হাদীসমূহ বর্ণনা করেছেন।[২]

এসব ঘটনা থেকে মাতা-পিতার প্রতি মহানবীর (সা) গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও হৃদয়ানুভূতির

www.pathagar.com

পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহানবীর (সা) আরো কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য :

এক. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আল্ আ'স (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "বড় বড় গুনাহের মধ্যে একটি হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, দ্বিতীয় পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তৃতীয় বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা এবং চতুর্থ মিথ্যা শপথ নেয়া।" (বুখারী শরীফ)

দুই. উক্ত একই সাহাবা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা) বলেন : "কারো পিতা-মাতাকে গালি-গালাজ করা বড় ধরনের গুনাহ্।" উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ কি তার আপন পিতামাতাকে গালি-গালাজ করতে পারে?" তিনি বললেন, "হাঁ যদি কেউ অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তাহলে তার প্রতিশোধ হিসেবে সেও এর পিতাকে গালি দেবে, যদি কেউ অন্যের মাতাকে গালি দেয়, তাহলে তার পরিবর্তে সেও এর মাতাকে গালি দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

তিন. হযরত আবু উমাইদ মালিক ইবনে রুবিয়া আল-সায়েদী (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত ছিলাম; এমন সময় বনি সালামা গোত্রের এক বক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার মাতাপিতার মৃত্যুর পরে তাঁদের কল্যাণের জন্য এখন আমার কি কোন কিছু করণীয় আছে?" মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : "হাঁ, তাঁদের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর নিকট তাঁদের মাগফিরাত কামনা করা, তাঁদের কৃত ওয়াদা ও আরুদ্ধ কাজ সম্পন্ন করা, ঋণ পরিশোধ করা এবং তাঁদের রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।" (আবু দাউদ শরীফ)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলাম ও তার মহানবী যে সমতা ও ইনসাফপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ মানবিক আদর্শ স্থাপন করেছেন তা সর্বকালের মানুষের জন্য চির অনুসরণীয় অভ্রান্ত দিগ-দর্শন। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের বহুসংখ্যক আয়াতের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি উল্লিখিত হলো :

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন (সৃষ্টি করেন)।" (সূরা নিসা, আয়াত-১)

আল্লাহ বলেন :

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম-২১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরো বলেন :

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এ ন্যায়ভিত্তিক মানবিক আদর্শের সুস্পষ্ট ও যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছিল মহানবীর বাস্তব জীবনে। এ সম্পর্কিত বহুসংখ্যক ঘটনা ও হাদীস থেকে নিম্নে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হলো।

মহানবী (সা) যখন পঁচিশ বছরের যুবক তখন তিনি চল্লিশ বছর বয়স্ক বিদূষী বিধবা হযরত খাদীজার (রা) সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হযরত খাদীজা যখন ইন্তিকাল করেন তখন মহানবীর (সা) বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তাঁদের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক অফুরন্ত শ্রদ্ধাবোধে পরিপূর্ণ। এ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনে তাঁদের মধ্যে কোন বিষয়ে সামান্যতম মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাটি বা অসন্তুষ্টির এতটুকু ঘটনাও সংঘটিত হয়নি। সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে এটা এক অনন্য অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, আন্তরিক প্রেম ও সহানুভূতি, সুখে-দুঃখে, বিপদ-বালামসীবতে পরস্পরকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরার ক্ষেত্রে তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল চির অনুসরণীয় আদর্শ। হযরত খাদীজার (রা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকালে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হযরত খাদীজার (রা) ইন্তিকালের পরও দু'বছর পর্যন্ত মহানবী (স) দ্বিতীয় কোন বিয়ে করেননি। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে, নবুওতের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে এবং বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার তাগিদে তিনি কয়েকজন নারীকে পর পর স্ত্রী হিসাবে বরণ করে নেন এবং তাঁদের সাথেও যে সুবিচারপূর্ণ, শান্তিময় দাম্পত্য-জীবন যাপন করেন সেটাও ছিল আদর্শ দাম্পত্য জীবনের আর এক বিস্ময়কর নযীর। এ পর্যায়ে মহানবীর (সা) পবিত্র মুখ নিঃসৃত কতিপয় অমর বাণী :

এক. "সর্বোত্তম সম্পদ হলো আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মু'মিনা স্ত্রী যে আল্লাহর পথে স্বামীকে সাহায্য করে।" (তিরমিযী শরীফ)

দুই. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সদয় হলাম আমি আমার স্ত্রীদের প্রতি।" (তিরমিযী শরীফ)

তিন. সাইয়্যিদিনা আয়িশা (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে ও সদয় মনোভাব প্রদর্শন করে।" (তিরমিযী শরীফ)

www.pathagar.com

চার. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় খরচ, দাস-মুক্তির জন্য খরচ, গরীবদের দান-খয়রাত করা আর নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করা— এর মধ্যে শেষোক্ত খাতে খরচ আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম।" (মুসলিম শরীফ)

পাঁচ. তিবরানী জাবের (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "মানুষের আমলের দাঁড়িপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।" ■

তথ্যসূত্র :

১. ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশামের মতে ছয় বছর এবং ইবনে হাযম ও ইবনুল কাইয়েমের মতে সাত বছর।

২. দ্রষ্টব্য 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তৃতীয় খণ্ড/মওলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃ. ৭৭-৭৮)।

মাসিক পৃথিবী পড়ুন

এতে থাকে—

- আল কুরআনের ভাবানুবাদ
- আল হাদীসের অনুবাদ
- আল ফিকহ (মাসলা মাসায়েলের সমাধান)
- চিন্তাধারা (ইসলামের ওপর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ)
- জীবন কথা (সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনী)
- ইসলামী দুনিয়া
- আন্তর্জাতিক বিষয়
- অর্থনীতি
- স্বাস্থ্য কথা
- পুষ্টি বিজ্ঞান
- প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

---- যোগাযোগের ঠিকানা ----

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭, ই-মেইল : bic@accesstel.net

www.pathagar.com

নবীগৃহে একদিন

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

□

মাকসুদ, আসসালামু আলাইকুম। আমার স্বপ্ন ও সাধনার ঘরে বসে আমি তোমাকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার স্বপ্ন সফল করেছেন। মসজিদে হারামের চত্বরে বসে আমি তোমাকে আমার প্রীতি জানাচ্ছি। মোহসিনা মাহমুদা ফেরদৌস, মোহসিনা মাহবুবা ফেরদৌস ও মোহসিনা মাহদিয়া ফেরদৌসসহ তোমার কথা যখন স্মরণ করছি, তোমাদের স্মৃতি ও চেহারাগুলি যখন আমার সামনে ভাসছে, আমার সামনে তখন কা'বা শরীফের মুলতাজিম ও মাকামে ইবরাহিমের আলোর ঝলকানী। আমি কল্পনায় দেখছি, তুমি মাকসুদ, তোমার তিন কন্যা মাহমুদা, মাহবুবা ও মাহদিয়াকে সাথে নিয়ে আমার হাত ধরে কা'বা শরীফে তাওয়াফ করছো, মুলতাজিমে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে আমাদের নাজাত ও কল্যাণের জন্য মুনাজাত করছো। আমার চোখের সামনে এখন হাজরে আসওয়াদ ঝলমল করছে। মাকামে ইবরাহিমে হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পায়ের চিহ্ন যেমনি স্পষ্ট ও গভীর, আল্লাহর নির্দেশে নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে হযরত ইবরাহিম কর্তৃক কুরবানী করতে উদ্যত হবার স্মৃতিও এ মুহূর্তে আমার সামনে তেমনি উজ্জ্বল। আল্লাহ ইবরাহিম ও হাজেরার মতোই তোমাকে ও আমাকে নিজেদের সন্তান আল্লাহর রাহে কোরবানী করার মতো মানসিক শক্তি ও তাকওয়া দান করুন। মাকসুদ, আজকের রাত সাতাশে রমজানের রাত। দুপুরে এসে প্রবেশ করেছি কা'বার চত্বরে। জোহর ও আছর আদায় করেছি। বিশ লাখের বেশী রোজাদার মানুষের সাথে একত্রে ইফতার করেছি। তারপর সালাতুল মাগরিব আদায় করেছি। এরপর এশা ও তারাবী পড়েছি। রাত দশটা পর্যন্ত এই ছিল রুটিন।

আমি তোমাকে ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ সালে অর্থাৎ ২৩ রমজানের উমরাহ পালনের কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণাকরেছি। আমি সাধারণত ইসমাঈল গেট দিয়ে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছি এবং তার বরাবর আযান খানার নিচে বা তার অদূরে অবস্থান করেছি। ১৩ই ফেব্রুয়ারী টয়লেট ও অযু সেরে এসকেলেটরে উপরে উঠার সময় একটি ছেলে আমার দিকে তার ভিজা হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো : বাংলাদেশী?

www.pathagar.com

আমি হাঁ সূচক জবাব দেয়ার সাথে সাথে সে বললো, আপনার পাঞ্জাবীর কাজ দেখেই আমি অনুমান করেছিলাম। বাংলাদেশীরা ছাড়া সাধারণত এ ধরনের পাঞ্জাবী কেউ পরেন না। সাইফুল কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করার একটি গেটে এসকেলেটরে দায়িত্ব পালন করে। সে জানালো যে পঞ্চাশ ষাটজন বাংলাদেশী কা'বা শরীফে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। সাইফুলের বাসা ঢাকার মিরপুরে। সে আমাকে ফাহাদ গেট দিয়ে ভিতরে তাদের অফিসে নিয়ে গেল। তারপর তাদের নিজস্ব কক্ষে। কয়েকজন কর্মী তখন ভাত খাচ্ছিল। আমি তাদের সাথে কা'বা ঘরের এক আন্ডারগ্রাউন্ড প্রকোষ্ঠে বসে দুম্বার গোশত দিয়ে ভাত খেলাম।

বাংলাদেশীরা আমাকে পেয়ে খুবই খুশী হলো। তারা কয়েকজন ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে সম্মত হলো এবং আমার মক্কা অবস্থানকালে এবং বিশেষত কাবা শরীফে অবস্থানকালে নানাভাবে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিল। তারা বললো, কা'বা শরীফে যদিও অতিরিক্ত কাপড়-চোপরে বা খাবার নিয়ে ঢুকার অনুমতি নেই, কিন্তু আমি চাইলে তারা আমার জন্য বালিশ বিছানা থেকে শুরু করে আমি যা যা নিতে চাই তার ব্যবস্থা করে দেবে। আমি তাদের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ দিলাম, তবে আল্লাহর ঘরের মেহমান হিসাবে এখানে তাদের এ ধরনের বাড়তি সুযোগের অফার গ্রহণ না করার ব্যাপারে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম। তারা কা'বা শরীফের আন্ডারগ্রাউন্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আমাকে ঘুরিয়ে দেখালো। এরপর আমি তারাবী ও কেয়াসুল লাইল-এর বিরতির মধ্যে 'মকতুব মক্কা আল মোকাররমা' বা মক্কা মোকাররমা লাইব্রেরীতে গেলাম। এই লাইব্রেরীর গুরুত্ব আসলে লাইব্রেরী হিসাবে নয়। এই ভবনের স্থানটিই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বাড়ি। এবং এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। গভীর আবেগ ও এক অনির্বচনীয় অনুভূতি নিয়ে আমি সেই ঐতিহাসিক গৃহে প্রবেশ করলাম। আমার সাথে জামালউদ্দীন। ভিতরে কয়েকজন লোক গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করছিলেন। আমি ঘুরে ঘুরে বইয়ের শেলফ্গুলি দেখলাম। প্রায় সবই আরবী বই। কিছু কিছু ইংরেজী বই রয়েছে। ভবনটির দোতলায়ও লাইব্রেরী এবং কর্মকর্তাদের বসার ঘর রয়েছে। আমি নিচ তলায় পাঠকক্ষে এক পাশে এক বেঞ্চিতে অনেক সময় ধরে নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলাম।

চারপাশের লোকজনের অস্তিত্ব ভুলে আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম আজ হতে প্রায় সোয়া চৌদ্দশ' বছর আগের কথা। আমেনার কোলে এই ঘরেই শিশু ইসলাম দোল খাচ্ছেন। এই ঘর এক অলৌকিক নূরের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে আলোক-প্রভায় আলোকিত হবার জন্য এই ঘরের বাইরের সমুদয় অন্ধকার পৃথিবী উন্মুখ-উদ্বেল অপেক্ষার প্রহর গুনছে। শিশু মুহাম্মাদ (সা) এই ঘর থেকেই হালিমার ঘরে যাচ্ছেন। হালিমার ঘর থেকে ফিরে এসে এই ঘর থেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সা) চাচার সাথে সিরিয়ায় ব্যবসা করতে যাচ্ছেন। এখান থেকে বেরিয়ে এসে সপ্তদশ-বর্ষীয় যুবক

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সা) হিলফুল ফুজুল গঠন করে আরবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মক্কার বুকে আল আমিন নামে পরিচিত মুহাম্মাদ (সা) এই ঘর থেকে বেরিয়ে কা'বা ঘরে যাচ্ছেন এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের কর্তৃত্ব নিয়ে সৃষ্ট সংঘাত ইত্যাদি নিয়ে ভাবনায় কতক্ষণ চলে গেল জানি না। লাইব্রেরীয়ান তার আসন ছেড়ে আমার কাছে আসলেন এবং আরবী ভাষায় জানতে চাইলেন আমার কোন প্রয়োজন তিনি পূরণ করতে পারেন কি না। আমি নিজে আরবী বলতে না পারলেও তার কথা মোটামুটি বুঝার মতো একটা অবস্থা আমার সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাকে বললাম : 'ক্যান ইউ স্পীক ইংলিশ।' লাইব্রেরীয়ান 'ইয়েস' বলে সম্মতি জানাতেই আমি তাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। ভদ্রলোককে আমি নিজে একজন লেখক বলে পরিচয় দিয়ে আমার প্রতি তার আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে আকারে-ইঙ্গিতে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করলেন ঠিকই, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তার যে দৌড় তা দিয়ে বেশীদূর এগুতে পারলেন না। তিনি আমাকে কনফার্ম করলেন যে, এই বাড়িটি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের। কিন্তু ভাষাজ্ঞানের অভাবে আমরা পরস্পর বেশীদূর এগুতে পারলাম না। তার কাছে জানতে চাইলাম, এই বাড়ির ওপর কোন লিখিত তথ্য কোথাও আছে কি না। অন্য অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনের মতোই এই বাড়িটির প্রতিও কর্তৃপক্ষ যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ায় আমার মনে ব্যথা লাগছিল। কিন্তু তারা বললেন, এগুলির প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান বিদআত। মুসলমানদের আবেগ আর অনুভূতির সাথে জড়িত এ ধরনের নিদর্শনগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিতকরণকে আমি বিদআত বলে তাচ্ছিল্য করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘর মৌলদুন্নবী-নবীর জন্মগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতেই লক্ষ্য করলাম, এই ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু লোক দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছেন। নবীগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে কা'বার দিকে মুখ ফিরালাম। নবীর জন্মগৃহটি ছিল একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আবার উপরের দিকে উঠতে হয়। মাঝখানে আবু জাহেলের বাড়ি। সেই বাড়িটি এখন একটি দ্বিতল টয়লেট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বাড়িতে আমিও টয়লেটের কাজ সেরে হারাম শরীফের বাইরের বিস্তীর্ণ খোলা চত্বর অতিক্রম করে ইসমাঈল গেট দিয়ে আমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। ■

www.pathagar.com

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা)

আসাদ বিন হাফিজ

□

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি সুন্নাহ। রাসূলের জীবন ও হাদীস থেকে এ ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় মুমিনদের দায়িত্ব হচ্ছে তার যথার্থ অনুসরণ।

কবি পরিবারে নবীর আগমন

কবি ও কবিতার জন্য ভুবনখ্যাত এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাসূল (সা)। দু' একটি খণ্ড কবিতা ছাড়া তিনি যদিও কোন কবিতা রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর আম্মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন যুগধর্মের দাবীতে একজন স্বভাব কবি। রাসূল (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি যে মর্সিয়া বা শোকগাথা গেয়ে রোনাজারি করেছিলেন তা ইতিহাসখ্যাত। রাসূল (সা)-এর জন্মের আগে বিবি আমেনা জগৎখ্যাত এক শিশুর জন্মের বিষয়ে প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হতেন। এ ভাবাবেগেও তিনি বেশ কিছু খণ্ড কবিতা রচনা করেন। তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিবেরও কবিখ্যাতি ছিল সুবিদিত। অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল এক কবি পরিবারে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই রাসূলে খোদার (সা) মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর একটি অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিলো প্রকৃতিগতভাবে একজন আরব হবার কারণে। এ ছাড়া ভাষার গতি ও লাবণ্যের প্রতি তাঁর একটি স্বভাবসুলভ কৌতূহলও ছিলো। একবার হযরত ওমর (রা) রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি আমাদের মধ্যে বড় হলেন, অথচ কথা বলেন এতো সুন্দর ভাষায়!' অন্যান্য সাহাবীরাও তাঁর সুমধুর বাচনভঙ্গির প্রশংসা করতেন। উত্তরে তিনি বলতেন, 'এতো আমার অধিকার, কারণ কুরআন তো আরবী মুবীন ভাষায় আমার নিকটেই নাযিল হয়েছে।' এভাবেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে সাহিত্যের এক সৌরভময় ভুবনে প্রেরণ করেছিলেন।

কাব্যচর্চার সাধারণ হুকুম

রাসূলে করীম (সা) নিজে সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন এবং কবিতা শুনতে ভালাবাসতেন এতটুকতেই তাঁর কাব্যপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিলনা। অন্যদেরও তিনি কবিতার প্রতি আগ্রহী

www.pathagar.com

করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যে দুটো মনোরম আভরণে বিশ্বাসীকে আল্লাহ্ সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি।' আরো বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানে কথা।' সাহাবীদেরকে তিনি কবিতা চর্চার তাগিদ দিতেন। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় তিনি সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও, তাহলে তাদের কথা মিষ্টি ও সুরেলা হবে।' এভাবেই মহানবী (সা) সাহাবীদেরকে কাব্য চর্চায় উৎসাহী করে তোলেন।

কাব্য চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা

রাসূল (সা)-এর উৎসাহে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের যাদের কাব্যচর্চার যোগ্যতা ছিল তারা প্রায় সকলেই কাব্যচর্চা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি হাসসান বিন সাবিত (রা), লবীদ বিন রাবিয়াহ (রা), কা'ব ইবনে যোহায়র (রা), আবদুল্লা বিন রাওয়াহা (রা), কা'ব বিন মালিক (রা), আব্বাস বিন মিরদাস (রা), যুহায়র বিন জুনাব (রা), সুহায়ম (রা), আন নাবিগা ওরফে আবু লায়লা (রা) প্রমুখ। মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবীনন্দিনী ফাতেমাতুয যোহরা (রা), হযরত খানসা (রা), কবি নাবিখাজাদী (রা) প্রমুখ। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার তিনজনই তৎকালীন আরবের প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। এরা হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারুক (রা) ও হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা)।

অশ্লীলতা বর্জনের নির্দেশ

কবিতার শ্লীল অশ্লীলতার বিষয়ে রাসূল (সা) সবসময় সচেতন ছিলেন। এ প্রসংগে ইমাম মুসলিম সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর (রা) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মদীনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত আরজ নামক এক পল্লীর মধ্য দিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এসে পড়লো এক কবি। সে তার কবিতা পাঠ করে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'এ শয়তানটাকে ধরো, তোমাদের কারোর পেট (এমন) কবিতায় ভরে থাকার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো।' উল্লেখ্য, এ কবির কবিতা ছিল অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ।

জাহেলী যুগের প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কায়েসের কবিতা সম্পর্কে রাসূলে খোদার (সা) মন্তব্যও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ইমরাউল কায়েস ছিলেন অশ্লীলতার দীক্ষাগুরু। কিন্তু 'বর্ণনার পরিপাট্য, উপমা গ্রহণের রীতি ও প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা' তাঁর কবিতাকে করেছিল মোহময় ও আকর্ষণীয়। রাসূলে করীম (সা) তার কবিতা সম্পর্কে 'নিশ্চয় তার ভাষায় আছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্য-কর্মে আছে বর্ণনার পরিপাট্য' বলে মন্তব্য করার পরও তার কবিতাকে অশ্লীলতার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা)-এর দরবারে একবার কবিদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ইমরাউল কায়েসের প্রসঙ্গ এলে মহানবী (সা) বললেন, দুনিয়ায় তিনি খ্যাতনামা হলেও আখিরাতে তার নাম নেবার

www.pathagar.com

কেউ থাকবে না। কবিদের যে বাহিনী জাহান্নামের দিকে যাবে সে থাকবে তার পতাকাবাহী।

অশ্লীলতা বর্জনের ব্যাপারে সাহাবী কবিদের প্রতি আল্লাহর নবীর কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পরেও যে অশ্লীল কবিতা ছাড়তে পারলো না, সে যেনো তার জিভটাই নষ্ট করে ফেললো।' অন্যত্র বলেছেন, 'কারো পেট বা হৃদয়ে যদি পুঁজ জমে পচে যায়, তবে সেই পেট বা হৃদয় অশ্লীল বা মন্দ কবিতার চেয়ে উত্তম।' আরো বলেছেন, 'অশ্লীল কবিতা দিয়ে তোমাদের দেহ মন ভর্তি করার চেয়ে রক্ত পুঁজ দিয়ে পরিপূর্ণ করা অনেক ভালো।'

বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে কবিদেরকে সহযোগিতা করা

একবার হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) কে লক্ষ্য রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি আবুবকরের কাছে যাও। মুশরিকদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের কালো অধ্যায় তিনি তোমাকে আনুপূর্বিক বলতে পারবেন। গুনে গুনে বংশের নানাদিক তোমাকে দেখাতে পারবেন। আর তুমিও সে আলোকে নিন্দাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হবে। যাও, তোমার সাথে জিব্রীল রয়েছেন।'

অন্যা বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি হাস্‌সানকে বললেন, ' যাও, আবুবকরের কাছে যাও। তিনি ওদের বংশের সব খবর রাখেন। হাস্‌সান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে এলেন তাঁর কাছ থেকে। এবার মহানবী (সা) পথ নির্দেশনা দিলেন, ওমুক নারী সম্পর্কে কিছু বলো না। ওমুক সম্পর্কে বলতে পার। যখন হাস্‌সানের কবিতা কুরাইশদের দু'কান ছিদ্র করে দিতে চাইলো, তারা প্রত্যেকে তারস্বরে চিৎকার শুরু করলো। বলতে থাকলো, একি, এসব আবু বকর ছাড়া আর তো কেউ জানতো না।'

কবিদেরকে খেতাব প্রদান

হাদীস শরীফের বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কবিদেরকে খেতাব প্রদান ও সভাকবি করার রেওয়াজ মহানবী (সা)-এর আমলেও ছিল। রাসূলে মকবুল (সা) তাঁর প্রিয় সাহাবী কবিদের মধ্য থেকে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা)-কে তাঁর সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলা হাতে 'শায়েরুর রাসুল' বা 'রাসূলের কবি'।

কবিদের জন্য দোয়া করা

ঈমানদার কবিরা যেন উত্তম কবিতা রচনা করতে পারেন সেজন্য মহানবী (সা) কবিদের নাম ধরে ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। তিনি এ দোয়া করতেন উচ্চস্বরে, যেন অন্যান্য সাহাবীরাও শুনতে পান। অধিকাংশ সময় তিনি এ দোয়া করতেন কবিদের সম্মুখে, যেন কবিরা অধিক আস্থাশীল, দায়িত্ববান এবং সৃজনশীলতায় আরো যত্নবান হওয়ার প্রেরণা পায়। কবি হাস্‌সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে রাসূলে

www.pathagar.com

খোদা (সা) তাঁর জন্যে এ বলে দোয়া করতেন : 'হে আল্লাহ, রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তুমি তাকে সাহায্য করো।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, শায়েরুর রাসূল কবি হাসসান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে কবিকে উৎসাহিত করার জন্য কখনো কখনো মহানবী (সা) সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'হাসসানের জিভ যতদিন রাসূলের পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে, ততদিন তার সাথে জিব্রীল থাকবেন।'

কবিদের পুরস্কৃত করা

০ একবার মিশরের রোমক সম্রাট দুই অপরূপা সুন্দরীকে রাসূল (সা) এর কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠালেন। কবি সাহাবী হাস্‌সান বিন সাবিতের প্রতি রাসুল (সা)-এর ভালোবাসা এতোটাই প্রবল ছিল যে, এর মধ্য থেকে শিরী একজনকে তিনি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা)-এর সংগে বিয়ে দিয়ে দেন।

০ কবি কা'ব ইবনে যুহায়র ছিলেন প্রসিদ্ধ 'সাবা মুয়াল্লাকা'র (ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক) অন্যতম কবি যুহায়র-এর সুযোগ্য সন্তান। কা'ব (রা) পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুতার জন্য তাঁর প্রতিভা, ওজস্বিতা ও উত্তরাধিকার ছিল এমনি এক মারাত্মক ব্যাপার যে মক্কা বিজয়ের পর যে দশজন কুখ্যাত কাফিরের প্রাণদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল, যুহায়রের পুত্র কা'ব ছিলেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তখনও তিনি ইরাকে অবস্থান করে আল্লাহর নবী (সা) ও ইসলামের বিপক্ষে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। কিছু দিন পর আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোবিপ্লব সাধন করায় তিনি ছদ্মবেশে মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল (সা)-এর দরবারে পেশ করলে মহানবী (সা) খুশি হয়ে নিজের গায়ের চাদর খুলে কবিকে তা উপহার হিসাবে প্রদান করেন।

০ 'কাসিদাতুল বুরদাহ'-এর রচয়িতা সাঈদ বিন হাসান বুসীরী (জন্ম ১২১২ খৃঃ), মিসরের বুসীর নিবাসী বার্বার জাতীয় একজন কবি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে নিরাময়ের আশায় তিনি 'কাসিদাতুল বুরদাহ' কবিতা রচনা শুরু করলেন। 'বানাত সুআদ'-এর মত কিছু কালজয়ী পংক্তি রচনা করবেন এবং রাসূলে পাক (সা)-এর রওজায় তা পাঠ করবেন-এইরূপ ইচ্ছা ছিল কবির। প্রগাঢ় প্রেমোন্মাদনায় কাসিদা রচনা সমাপ্ত হলে স্বপ্নে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্নাবস্থায় রাসূল (সা) কবিকে আপন চাদর পরিয়ে দিয়েছিলেন। [যেভাবে হযরত কা'ব (রা) চাদর উপহার পেয়েছিলেন] এবং সকালে জেগে উঠে কবি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখতে পান।'

কবিদেরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক সুবিধা প্রধান

একবার হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমত মহানবী (সা) ভাগ করে দিচ্ছিলেন। কবি আব্বাস বিন মিরদাসকে দিলেন চারটি বলিষ্ঠ উট। এতে তাঁর মন ভরলো না। কবিতার মাধ্যমে

www.pathagar.com

অনুযোগের স্বরে তিনি বললেন:

'কোন দিনও বধ্যভূমিও কেল্লা সব-ঘাড় ভাংতে পারেনি কো মিরদাসের

আমিও কভু পিছে ছিলাম তেমন তো নয়

আজকে যদি হইগো নীচু উঠাবে ফের সে লোক কোথায়?'

কবিতা শুনে মহানবী (সা) বললেন, 'ওরে, কেউ কি কবির মুখ বন্ধ করতে পার? হযরত আবুবকর (রা) তাকে নিয়ে গেলেন। বেছে বেছে একশ উট নিয়ে যেতে দিলেন তাকে। কবি খুশীতে ডগমগ হয়ে গেলেন।

কবিদেরকে অর্থ সাহায্য করা

ভাবের রাজ্যে বিচরণের কারণে স্বাভাবিকভাৱেই লেখক ও কবিরা বিষয় বুদ্ধিতে থাকে অপটু। আবার আত্মসম্মানবোধ টনটনে থাকার কারণে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারেনা। ফলে দেখা যায় সভ্যতার বাগান বানায় যে কবিরা, মানুষের মনে সুখের প্লাবন আনে যে কবিরা তাদের ভাগ্যে জোটে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকাতর জীবন। এ দুর্দশা লাঘবে মহানবী (সা) যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, যে চূড়ান্ত কথা বলেছেন, তারচে চূড়ান্ত কোন কথা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন বলতে পারবে বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন, 'কবিদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।'

সন্তানের কাছে পিতা-মাতার যে মূল্য, সভ্যতার কাছে কবির মূল্য তেমনি। পিতা-মাতার কাছে ঋণী সন্তান, কবির কাছে ঋণী জাতি। এ বাণীর মাধ্যমে মহানবী চেয়েছেন জাতি যেন সে ঋণ পরিশোধ করে।

কবিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান

রাসূল (রা) কবিদের উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। তিনি কবিদের যে অতুলীয় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা ছিল উপমারহিত। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মসজিদে নববীর ভেতরে শুধুমাত্র কবিতা পাঠ করার জন্য মহানবী (সা) একটি আলাদা মিম্বার (মঞ্চ) তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) সাহাবীদের কবিতা পাঠ করে শোনাতেন।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, 'মহানবী (সা) মসজিদে হাস্‌সানের জন্য উঁচু মিম্বার তৈরী করিয়ে নেন। তার ওপরে চড়ে হাস্‌সান নবীজীর গৌরবগাথা এবং মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন।'

কবিদেরকে এভাবে সম্মানিত করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কেবলমাত্র মহানবীই পেরেছিলেন মসজিদে নববীতে নিয়মিত কবিতার আসর বসাতে, খোদ নবীর ঘরে কবিতা পাঠের জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরী করে দিতে-আজকের কবিরা যেমনটি কল্পনাও করতে পারে না। বস্তুতঃ নবীর ঘর মসজিদে নববীতে খোদ মহানবী (সা) কর্তৃক

www.pathagar.com

কেবলমাত্র কবিতা পাঠের জন্য নির্ধারিত একটি একক ও আলাদা মঞ্চ স্থাপন কবিদের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে কবিদের জন্য এরচে অধিক কোন সম্মান প্রদর্শন সম্ভব নয়।

কবিতার বিনিময়ে গণীমতের অংশ লাভ

কাব্য চর্চাই কবিদের জন্য জিহাদ। জিহাদে জয় লাভের পর মুজাহিদগণের মধ্যে মালে গণীমত ভাগ করে দেয়া হতো। মুজাহিদগণ ছাড়া এ মালে গণীমত আর কেউ পেতেননা। যুদ্ধে অংশ না নিলে যদি গণীমতের মালের অংশ পাওয়া না যায় তবে কবিরা মালে গণীমত পাবেন কেমন করে? আবার কাব্যচর্চা যদি জিহাদ হয় তবে কবিরা মালে গণীমত পাবেন না কেন? সাহাবীদের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিলে মহানবী (সা) কবিদেরকে মালে গণীমতের হিস্যা প্রদানের নির্দেশ দেন। এভাবেই কাব্যচর্চা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে কবিরা যুদ্ধে অংশ না নিয়েও রাসূলের (সা) নির্দেশে গণীমতের মালের অংশ পেতেন।

কবিতা রচনার বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ

মহানবী (সা) অনেককে জীবিতাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কবিতা লেখার পুরস্কার হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতা শুনে রাসুল (সা) ঘোষণা দিয়েছিলেন; 'হে হাস্‌সান, আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।'

আজকে যারা ইসলামী সাহিত্যের চর্চা করছেন তাদের এ কথা গভীরভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহিত্য চর্চা কোন তুচ্ছ কাজ নয়, বরং সভ্যতা বিনির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্ তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। এ কাজের জন্য যে মেধা ও যোগ্যতা দরকার আল্লাহই তা তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া এ বিশেষ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না হলে তার জন্য তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরার নামকরণ আশশোয়ারা 'কবিরা' রেখে কবিদেরকে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন সেখানে কাব্যচর্চা তথা সাহিত্য সাধনাকে গৌণ ভাবার কোন অবকাশ নেই।

অপরদিকে রাসূলে করীম (সা) সাহিত্য চর্চার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। মহানবী (সা)ই আমাদের জীবনাদর্শ। তিনি যা করেছেন, করতে বলেছেন বা করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন তা-ই সুন্নাহ। সাহিত্যের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি এ ব্যাপারে যা করেছেন বা করতে বলেছেন তার যথাযথ অনুসরণ করার মধ্যেই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত। আজ যেটি সবচে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে খণ্ডিত ইসলাম নয়, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর এ অনুসরণ কেবল কথার মধ্যে না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করা। ■

www.pathagar.com

নবী করীম (সা)-এর কতিপয় পছন্দ-অপছন্দ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

□

মানুষের এটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যে, সে তার প্রিয়ভাজন কিংবা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অভ্যাস ও স্বভাবকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। যে জন্য সে শরঈ কিংবা আইনগতভাবে বাধ্য নয়। এটি ঘটে কেবল ভালোবাসার খাতিরে। আর ভালোবাসার এ ব্যাপারটি নীরবেই ঘটে যায়। তখন ভালোবাসার ব্যক্তিটির ইচ্ছে-মর্জি, পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরণ, চলন-বলন প্রভৃতির অনুসন্ধানে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেগুলো আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

যেহেতু একজন মুসলিমের প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং ভালোবাসার পাত্র হচ্ছেন নবী করীম (সা)। এমনকি স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশী। তাই তাঁর পোশাক-আশাক, চলন-বলন, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ও তিনি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। জানতে চান তাঁর ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে। সেই লক্ষ্যে সহীহ্ হাদীসের আলোকে কতিপয় দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নবী করীম (সা) এর মাথার চুল ছিলো খুব ঘন ও কালো, কাঁধ অবধি লম্বা। তিনি মাথায় প্রচুর পরিমাণে তেল ব্যবহার করতেন এবং নিয়মিত চুল-দাড়ি আঁচড়াতেন। সকল কাজ তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতেন। রাতে ঘুমোবার আগে চোখে সুরমা লাগাতেন। প্রথমে ডান চোখে তিনবার, তারপর বাম চোখে তিনবার।

তিনি সাদা কাপড়ের পোশাক পরিচ্ছদ-পছন্দ করতেন। বলতেন "তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করো। কারণ সাদা কাপড়-ই উত্তম। আর মৃতকেও সাদা কাপড়ে কাফন দিয়ো।" অবশ্য তিনি রঙিন পোশাকও ব্যবহার করতেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কালো পাগড়ি পরেছিলেন। পাগড়ির প্রান্তদ্বয় দু'কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। সর্বদা জামা পরতে পছন্দ করতেন। যার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা থাকতো। কব্জির দিকের অংশ কপ হাতার মতো ছিলো। লুঙ্গি বা পাজামা পায়ের গোড়ালীর গিটের নিচে ঝুলিয়ে পরতে নিষেধ করতেন। বলতেন 'অহংকার প্রকাশের জন্য যে ব্যক্তি পরিধানের কাপড় পায়ের গোড়ালীর গিটের নিচে ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।' তিনি কখনও রেশমী কাপড় ব্যবহার করেননি এবং পুরুষদেরকে রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

যে কোন ধরনের সুগন্ধি ছিলো তাঁর প্রিয়। উপহার হিসেবে কেউ তাকে আতর পাঠালে

www.pathagar.com

তিনি তা গ্রহণ করতেন।

ধীরে ধীরে কথা বলা ছিলো তাঁর অভ্যাস। কেউ তাঁর কথা শুনতে চাইলে তিনি শুনতে পারতেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি দু'বার তিনবার বলতেন। যেন লোকজন তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে।

তিনি মুচকি হাসতেন। মাঝে মাঝে হাসির সময় তাঁর দাঁত দেখা যেত কিন্তু সেই হাসিতে কোনো শব্দ হতো না।

অনেক সময় রসিকতাও করতেন। অবশ্য সেই রসিকতা কাউকে হেয় করার জন্য ছিলো না কিংবা তা কারও মনে কষ্টের কারণও হতো না। তা ছিলো সেরেফ হাসি-কৌতুক।

অনেক সময় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা), তুরফা, লবিদ বিন রাবিআ সহ অন্যান্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে তিনি সব সময় সংযম ও অল্পে তুষ্টির নীতি অবলম্বন করতেন। যখন যা সামনে আসতো তাই তিনি খেয়ে নিতেন। কখনও কোনো খাদ্যের সমালোচনা করতেন না। দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া দাওয়া করতেন। খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিতেন। খাওয়ার সময় কেউ উপস্থিত থাকলে তাকে সাথে নিয়েই তিনি খেতেন। অল্প পরিমাণ খাদ্য মুখে নিতেন এবং ভালোভাবে তা চিবিয়ে খেতেন। বেশীর ভাগ সময় খাওয়ার কাজে তিন আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। খাওয়ার শেষে আঙ্গুলে লেগে থাকা খাদ্য-কণাগুলো ভালো করে চেটে নিতেন। কোনো কিছুতে ঠেস্ দিয়ে বসে পানাহার করতেন না।

একাধারে অনেকদিন বাড়িতে কিছু রান্না করা হতো না, সেই সময়গুলো তিনি খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। এমন কখনও হয়নি যে, একই দিনে দু'বেলা তিনি গোশত রুটি খেয়েছেন। সব সময় বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করতেন এবং প্লেটের সামনের দিক থেকে খেতেন। খাওয়া শেষে হাত চেটে নেয়ার পর ধুয়ে ফেলতেন। যখন সামনে থেকে দস্তরখান উঠিয়ে নেয়া হতো, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করতেন।

পানীয়ের মধ্যে তিনি বেশী পছন্দ করতেন ঠাণ্ডা পানি। গ্লাস কিংবা বাটি ডান হাতে ধরে পান করতেন। তরল জিনিস পান করার সময় তিনবার বিরতি দিয়ে শ্বাস নিতেন। এক শ্বাসে তা পান করতেন না। সর্বদা বসে পান করতেন। দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করতেন। তাঁর নিকট কোনো ঠাণ্ডা পানীয় হাজির করলে তিনি অত্যধিক খুশী হতেন এবং সানন্দে তা পান করতেন। পান করার পর মুখ থেকে গ্লাস বা বাটি সরানোর সাথে সাথে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে পানাহার করা তিনি পছন্দ করতেন না। এরূপ করতে নিষেধ করতেন।

খাদ্য হিসেবে তিনি সিরকা, যাইতুন তেল, মধু, লাউ, গোশত, তরমুজ, ক্ষীরা বা শসা, আধাপাকা খেজুর, যবের রুটি, সারীদ প্রভৃতি খুব পছন্দ করতেন। কাঁচা পেয়াজ বা রসুন তো তিনি পছন্দ করতেনই না বরং বলতেন– 'যে ব্যক্তি কাঁচা পেয়াজ বা রসুন খাবে সে যেন মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা ছাড়া মসজিদে না আসে।'

তিনি মুরগী ও মাছ খেয়েছেন, কিন্তু কম। মিহি আটা রুটি তিনি কখনও খাননি। সর্বদা

www.pathagar.com

মোটা আটার রুটি খেতেন। পেটপুরে খাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। এজন্য কখনও তিনি ঢেকুর দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। মধু এবং দুধের মিশ্রণে তৈরী হারীরার প্রশংসা কল্পে তিনি বলেছেন– 'এ খাদ্যটি অসুখের প্রতিষেধক স্বরূপ।' একবার দেখলেন এক ব্যক্তি খাওয়ার জন্য দুটো খেজুর এক সাথে মুখে পুরছেন, তিনি এরূপ করতে তাকে নিষেধ করলেন। ভুনা গোশত তিনি খুব পছন্দ করতেন। একবার একটি খরগোশের রান ভুনা করে তার সামনে হাজির করা হলো। তিনি গ্রহণ করলেন কিন্তু তা থেকে নিজে কিছুই খেলেন না। ক্ষীর বা পায়েস রান্নার সময় পাতিলের তলায় হাল্কাভাবে যেটুকু লেগে যায় সেই অংশটুকু খেতে খুব পছন্দ করতেন। রুটি খাওয়ার মত কোনো তরকারী না পেলে, সিরকা কিংবা খেজুর দিয়েই তিনি খেয়ে নিতেন এবং বলতেন– 'যে বাড়িতে সিরকা থাকে সেই বাড়ি তরকারীশূন্য নয়।'

একবার তিনি বললেন– মধু, দুধ ও ঘি একত্রে মিলিয়ে তার ভেতর রুটি ভিজিয়ে খাওয়া আমার ভীষণ পছন্দ। এক সাহাবা তাঁর এ প্রিয় খাবার এনে সামনে হাজির করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'কী ধরনের পাত্রে ঘি রাখা হয়েছিলো?' বলা হলো– 'গুই সাপের চামড়ায় তৈরী পাত্রে।' বললেন– 'এগুলো নিয়ে যাও।'

ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাতে ঘুমুতে নিষেধ করতেন। বলতেন– এতে দ্রুত বার্ধক্য চলে আসে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তিনি কাইলুলা (বিছানায় শুয়ে একটু আরাম) করতেন।

একবার সাহাবাদের মজলিসে তাদের পছন্দের খাবার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। সবাই যার যার পছন্দের খাবারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন–'আমার পছন্দ ছাগলের সেই দুধ যা অনেকক্ষণ চুলায় জ্বাল করার পর গাঢ় হয়ে লালবর্ণ ধারণ করে, তারপর তাতে কিছু মধু ঢেলে মিষ্টি করে রুটি ভিজিয়ে খাওয়া। তখন এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একটি বড়ো পেয়ালায় পছন্দের সেই খানা নিয়ে এসে তার সামনে রাখলেন, তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং সকলে মিলে খেলেন।

নবী করীম (সা) বেশীরভাগ সময় ইবাদাত ও আল্লাহর যিকিরে কাটাতেন। নামায ছিলো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। প্রত্যেক নামাযের সময় তিনি নতুন করে ওযু করে নিতেন। আবার অনেক সময় এক ওযু দিয়েই একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করতেন। ফরয নামায তিনি মসজিদে এবং সুন্নাত ও নফল (যা তাঁর কাছে নফল হিসেবে পরিগণিত ছিলো) তিনি বাড়িতে পড়তেন। কারণ এসব নামায তিনি বাড়িতে পড়াটাই বেশী পছন্দ করতেন। নামাযের সময় হওয়ার ব্যাপারে এবং ফরয নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করার ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। এজন্য অন্যদেরকেও তিনি তাকিদ দিতেন। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে তিনি সকল নামায আদায় করতেন এবং তিনি নিজেই ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন। সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে একবার তিনি কাতারের দিকে দেখতেন তারপর নামায শুরু করতেন। নামায শেষে তিনি কিছুক্ষণ জায়নামাযের উপর বসতেন। বিশেষ করে ফজর নামাযের পর তিনি লোকদের দিকে ফিরে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

ফজরের নামাযে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সূরা পড়তেন। অবশ্য নামাযে তিনি মধ্যম স্বরে থেমে

www.pathagar.com

থেমে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ফজরের নামাযে কখনও সূরা আল মু'মিনূন, আবার কখনও সূরা ক্বাফ এবং অনেক সময় সূরা আল লাইল পাঠ করতেন। জুমআর দিন ফজর নামাযে তিনি সূরা আদ দাহ্‌র পড়তেন। যোহ্‌র ও আসরের নামাযে তিনি বড়ো কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন না। মাগরিবের সময় সূরা মুরসালাত এবং সূরা তূর বা এ জাতীয় সূরা পড়তেন। অনেক সময় সূরা আল কাফিরূন এবং সূরা ইখলাসও পড়তেন। ইশার নামাযে তিনি সূরা আত ত্বীনও পড়েছেন। জামায়াতে নামায পড়ানোর সময় বড়ো সূরা তিলাওয়াত না করার জন্য সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিতেন। একবার তিনি মুয়াজ (রা)-কে বলেছিলেন– 'নামাযে বড়ো সূরা পড়ে লোকদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ো না। নামাযকে তাদের জন্য অস্বস্তির কারণ বানিয়ো না।' তিনি আরো বলতেন– 'ইশার নামাযে সূরা আশ শামস্, সূরা আর লাইল, সূরা আল আ'লা– এ জাতীয় সূরাগুলো পড়া উচিৎ।' একবার তিনি সফরে এক মনজিলে থামলেন এবং (নামাযে) সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করলেন।

ইশার নামাযের পর তিনি ঘুমুতে যেতেন। রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠে পড়তেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল হতেন। অনেক সময় সারারাত ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। কখনও কখনও তিনি নামাযে এতো দীর্ঘ কিয়াম করতেন, তাঁর পা-মুবারক ফুলে যেত।

কেউ দাওয়াত দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। সকলের দাওয়াতেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন। রোযা থাকলে তিনি দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতেন না।

সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে সাহাবাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে কেউ তাকে আপ্যায়ন করতে চাইলে তিনি নিরাশ করতেন না।

কারো অসুস্থতার সংবাদ পেলে তিনি নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে তিনি উপস্থিত হয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন।

ছোট বড়ো সকলকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। প্রত্যেকেই মনে করতেন, হয়তো আমার চেয়ে তিনি আর কাউকে বেশী ভালোবাসেন না। ■

তথ্যসূত্র :

১. সহীহ্ আল বুখারী - মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রহ)
২. সহীহ্ মুসলিম - মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ)
৩. জামি আত তিরমিযী - মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী
৪. শামায়িলুন নবী - মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী
৫. সুনানু আবু দাউদ - আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ আছ (রহ)
৬. আখলাকুন নবী - সংকলন ও সম্পাদনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, বাংলাদেশ
৭. মাসিক যিকরা ডাইজেস্ট।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন ও বিশ্বনবী (সা)

শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ

□

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বটাকে একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করা আর মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অধীনে New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন চলছে। গ্লোবালাইজেশন পরিকল্পনা অর্থ আর প্রযুক্তিতেই সীমিত থাকবে এমনটি আশা করা কঠিন। অবশ্য বস্তুগত জগতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে অর্থ আর প্রযুক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ফ্যাক্টর যা আর্থ-সামাজিক প্রভাব বলয় সৃষ্টির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র বা সমাজ দর্শনের ভাবকাঠামো। শুধু দার্শনিক ভাব কাঠামোই নয়, কৌশলগত কুটচালে প্রত্যক্ষভাবে পরনির্ভর এবং প্রকারান্তরে নিগৃহীত হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ও স্বাধীন রাষ্ট্রিক অস্তিত্বের অবকাঠামো। কারণ, অনিবার্যভাবেই প্রতিটি সবল রাষ্ট্র নিজেরেদর স্বার্থের অনুকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে স্বার্থের ক্রীড়নক বানাবে। বিভিন্ন ভাবে আগ্রাসনের শিকার হবে। তথ্য আগ্রাসন আর অর্থনৈতিক আগ্রাসন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনে রূপ নেবে। প্রত্যক্ষ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা আর না হয় উপনিবেশ– এই হবে বাস্তবতা। আর এটি ত্বরান্বিত, দীর্ঘস্থায়ী বা স্থিতিশীল হবে যখন এ গ্লোবালাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয় প্রভাবক উপাদান যা জাতীয় মূল্যবোধ বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম দর্শন থেকে প্রভাবিত করণের মাধ্যমে পাল্টে দেয় জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি– ধারণা ও জ্ঞান। সর্বোপরি সামগ্রিক লাইফ স্টাইল।

বর্তমান বিশ্বায়নবাদীরা পুঁজিবাদী। মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে এরা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। পুঁজিবাদী সমাজে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিতে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় পুঁজি ও যোগ্যতার অনুপাতে ধনিক শ্রেণী আরো ধনী হতে থাকে। স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগকারী ক্রমশ দেউলিয়া হতে থাকে আর পুঁজিহীন শ্রমিক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতেই থাকে। পুঁজিবাদ ভোগবাদী শোষকতন্ত্র। পুঁজিপতিরা রাষ্ট্র ও সরকারে প্রভাবশালী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমে উৎপাদন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ও বাজার একচেটিয়াভাব রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয় যার বণ্টনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির হাতেই থাকে। উৎপাদন ও বাজারে প্রতিযোগিতার অভাবে শিল্পে মন্দা, ব্যাহত উৎপাদন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধির ঘাটতি এবং সর্বোপরি বাক স্বাধীনতা-ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব ও চাকরের মত জীবন ইত্যাদি কারণে ব্যাপক গণরোষের মুখে সমাজতন্ত্র একটা ব্যর্থ ও অচল মতবাদ হিসেবে আত্মাহুতি দেয়। মার্ক্সবাদের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বায়ন করা। কিন্তু কার্যত সমাজতন্ত্র একটি রাষ্ট্রেও সফল হয়নি। চীন, উত্তর কোরিয়া বা কিউবায় বর্তমানে যা আছে তা সমাজতান্ত্রিক শাসন লেভেলে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজতন্ত্র যেমন একটা আবেগবাদী বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ তেমনি এক ধরনের বুদ্ধিবাদী বস্তুবাদ। বিশ্বায়নবাদী পুঁজিবাদীরা খুবই সতর্ক হিসেবী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পক। সমাজতন্ত্রীরা যেমন চেয়েছিল বিশ্বকে এককেন্দ্রিক করে রাষ্ট্রীয় সীমানা মুছে দিতে, পুঁজিবাদীরাও বিশ্বায়নের মাধ্যমে মূলত একক World state-ই গঠন করতে চান। তবে তা সমাজতন্ত্রের মত ঝুঁকিপূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল আবেগী পথে নয়। বরং কূট-কৌশলের পরোক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই লক্ষ্য অর্জনে তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে অনুমিত হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিরা সমাজ ও রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে প্রভাবশালী ও নিয়ন্ত্রক হওয়ায় গণবিপ্লবের আশংকা সচরাচর থাকে না। পুঁজিবাদের ধারকেরা পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীকে স্ব স্ব স্থানে বহাল রেখে গণবিপ্লবের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকায়ন করতে চান। এ লক্ষ্য অর্জনে তারা তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে মিডিয়াকে প্রধান কার্যকর অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে। রেডিও-টিভি-ভিডিও, সিনেমা, নাটক, সংগীত, সংবাদপত্র, স্যাটেলাইট, বিজ্ঞাপন, মডেলিং, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, মেলা, জন্মনিরোধক, ড্রাগ, ভায়াগ্রা, ব্লুফিল্ম, মানব ক্লোনিং, বিতর্ক-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, এনজিও ইত্যাদির সহযোগিতায় পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক বন্ধন লোপ, অনৈতিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, অশ্লীলতা, অবাধ ও অস্বাভাবিক যৌনাচার—লিভিং টুগেদার, হোমো সেক্স ইত্যাদির প্রচার, প্রসার ও চর্চার মাধ্যমে শুভকামী ঐতিহ্যিক ও শাশ্বত মূল্যবোধ ধ্বংসে লিপ্ত হয়। যেখানে এসবের দ্বারা সাফল্যের সম্ভাবনা কম, অনিশ্চিত কিম্বা সুদূর সেখানে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রীড়নক জাতিসংঘের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন এবং ইরান, সিরিয়ায় আগ্রাসনের পাঁয়তারা এরই বাস্তবতা।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী শক্তি অপ্রতিরোধ্য। কম্যুনিজমের পতনের পর পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যদিও একটা আদর্শিক প্রতিপক্ষ আছে। আর তা হল ইসলাম বা মুসলমান। তাদের ভাষায় 'মোহামেডানিজম' বা মুহাম্মাদের আদর্শ। মার্ক্স-লেনিন-মাও এখন আর তাদের ভীতির কারণ নয়, তাদের ভীতি এখন একমাত্র মুহাম্মাদ (সা)। মুসলমানদের উত্থান– সেটা গাদ্দাফী, খামেনী, সাদ্দাম বা লাদেন যেভাবেই হোক তারা একে হুমকি মনে করে। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং বিশ্বজয়ী ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শক্তি মোটেও অজ্ঞ নয়। সুপ্ত শক্তি যেভাবে জেগে উঠছে, যদি তা অব্যাহত থাকে, ঐক্যবদ্ধ হয় তবে একে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে এ প্রতীতি তাদের আছে বলেই মুক্তবাজার অর্থনীতি, উত্তরাধুনিকতা ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ইত্যাকার অভিধায় বিশ্ব বাজার, সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতি ও বিশ্ব রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে চায়। নিজেদের মত করে বিশ্বায়ন সম্পন্ন করতে চায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজিবাদ কি বিশ্বায়নের দাবী করতে পারে? পুঁজিবাদ ভোগবাদী। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির বিনিয়োগ ও বিকাশে এটা সন্দেহাতীত ভাবেই একটা শোষণতন্ত্র। স্বল্প পুঁজিধারী কিম্বা পুঁজিহীন শ্রমিক শ্রেণীর পুঁজি বা শ্রমকে এটি লুণ্ঠন করে বিত্ত বা পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলে। অসম ভোগের রাজত্ব কায়েম করে। ধনী আর গরীবের সীমাহীন পার্থক্য সূচিত হয়। আবার, পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র একাকার। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূলোৎপাটন, ধর্মকে গীর্জা-বন্দি করা, অশ্লীলতাকে উস্কে দেয়া, পারিবারিক ও ঐতিহ্যিক বন্ধন বিলোপ করা, লিভিং টুগেদার, ফাইভ স্টার হোটেলে, শোবিজ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয়, আন্তর্জাতিক বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপক আধুনিকায়ন, মাফিয়া চক্র সৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা, তথ্য প্রযুক্তির নামে তথ্য সন্ত্রাস, আগ্রাসন, সন্ত্রাস দমনের নামে সামরিক আগ্রাসন ইত্যাদি মানবতা ও সভ্যতা বিরোধী অভিশাপের ধারক ও জনক হচ্ছে পুঁজিবাদ। এ ছাড়া পুঁজিবাদ সর্বোতভাবেই একটি সুবিধাবাদী মতবাদ। এর কোন সংবদ্ধ রূপ নেই। তাই, কোন বিবেচনাতেই পুঁজিবাদ কিংবা পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিশ্বায়নের অধিকার বা দাবী স্বীকৃত হতে পারে না। বিশ্ববাসীদের জন্য কোনভাবেই এটি শুভকামী নয়।

একমাত্র ইসলামই হচ্ছে বিশ্বায়নের যোগ্য, দাবীদার ও প্রকৃত আদর্শ। সর্বপ্রথম বিশ্বায়নের দাবী ও আওয়াজ তুলেছিলেন মুহাম্মাদ (সা)– ইসলামের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বনবী হিসেবে সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। যুক্তি-প্রমাণ ও কর্মতৎপরতা দিয়ে তিনি তাঁর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসলাম অনুসারে, এ বিশ্বের পরিকল্পক, স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এক পরম সত্তা আল্লাহ। মানুষকে তিনি তাঁরই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে সীমিত স্বাধীনতা ও শক্তিসহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্য থেকে একেকজন 'বিশেষ প্রতিনিধি' বেছে নিয়ে তাঁকে যোগ্য করে গড়ে তুলে তাঁর মাধ্যমে সর্বসাধারণকে

www.pathagar.com

প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিগত দিকনির্দেশনা ও কৌশল দিয়েছেন এবং সেই দিকনির্দেশনা সম্বলিত জীবনাদর্শ সেই বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে মানুষের সমাজে বাস্তবায়িত করেছেন। যুগে যুগে যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন, আল্লাহর মনোনীত এসব মহামানবরা হলেন নবী বা রাসূল। মুহাম্মাদ (সা) হলেন সর্বশেষ রাসূল। তিনি বিশ্বনবী। অন্য সবাই ছিলেন জাতি, জনপদ বা আঞ্চলিক পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এরাঁ সবাই তাঁদের অনুসারী জাতির কাছে সর্বশেষ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিশ্বনবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বৈশিষ্ট্য, লক্ষণাদি সময়কালের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। (ব্যাপক বিকৃতি ও পরিবর্তনের পরও হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী সব প্রায় সমস্ত ধর্মের শাস্ত্র গুলোতে মুহাম্মাদ (সা) এর আগমন সম্পর্কিত লক্ষণ-প্রমাণ এখনও বর্তমান আছে)।

বিশ্ব প্রকৃতির বিবর্তন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় নবীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিবর্তন ও সভ্যতা বিকাশের পূর্ণতার পর্বে আবির্ভূত হন পূর্ণতম ও শেষনবী মুহাম্মাদ (সা)। এর জন্য তাঁর আনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ, কালোত্তীর্ণ ও বিশ্বজনীন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটিই একমাত্র অনুসরণীয় ও আনুগত্যের বিধান হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ও প্রদত্ত। এর উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটির আলোকে সমসাময়িক ও অনাগতকালের যে কোন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ বা ইজমা-কিয়াস তথা বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা যাবে। এ জন্যই ইসলাম কোন স্থবির মতাদর্শ বা ধর্মের নাম নয় বরং প্রকৃত অর্থে শুভকামী প্রগতিশীল জীবনাদর্শ। কালিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতি-প্রবণতাকে যথার্থভাবে ধারণ করার যোগ্যতা ইসলামের আছে।

ইসলাম নিছক ভাবগত দর্শনে জীবন-বিমুখ নয়, কিম্বা নয় নিরেট বস্তুবাদী বরং বস্তুগতভাবে সমন্বিত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ একটি প্রকৃত জীবনবাদী জীবনাদর্শ। প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস একটি ভারসাম্যময় জীবন ব্যবস্থা। এ জন্যই ইসলাম একপেশে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করে না। পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয়করণ বা বিরাষ্ট্রীয়করণ ইসলামে সমর্থিত নয়। সুনিয়ন্ত্রিত পুঁজির বিনিয়োগ ও বিকাশে ব্যক্তি উদ্যোগকে ইসলাম যেমন উৎসাহ প্রদান করে, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে। তেমনি আবার তা বিধিবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া, সরকার ও ব্যক্তি উদ্যোগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এমনকি উৎপাদনে শ্রমের ভিত্তিতে শ্রমিকের মালিকানাও স্বীকৃত। শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা ও পারিশ্রমিক আদায়ে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য।

ইসলাম এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের ইন্দ্রিয়-জাগতিক জৈবিক চাহিদাকে যেমন অস্বীকার করে না

www.pathagar.com

তেমনি আবার অনিয়ন্ত্রিত ভোগ-বিলাসের অনুমতি দেয় না। বস্তুগত প্রবণতা নৈতিকতায় সুসমন্বিত। ইসলাম স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। একপেশে নয়। এজন্য অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি, বস্তু ও ভাব এবং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যথার্থ সমন্বয়ে সক্ষম। নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইসলামে স্বীকৃত কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাকে ইসলাম প্রতিরোধ করে। জুলুম-শোষণ-আগ্রাসনের সুযোগ ইসলামে নেই। জাতি, জনপদ, ভূ-খণ্ড, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-ঐতিহ্য ইত্যাদির স্বকীয়তায় শ্রদ্ধাশীল। পরধর্ম সহিষ্ণু এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাছাড়া, ইসলাম এমন একটি এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে হাতের নখ কাটা থেকে শুরু করে বিশ্ব ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ পর্যন্ত নির্দেশনা আছে, যা অন্য কোন ধর্ম বা মানব রচিত মতবাদে নেই। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলাম ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক যুগোপযোগী বিধান দিতে সক্ষম।

ইসলাম এমন ধর্ম যা সর্বাধুনিক এবং এমন উদার যে, নিজেকে কোন নতুন ও একমাত্র সত্যধর্ম বলে দাবী করে না বরং পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর স্বীকৃতি (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) সহ নিজেকে শাশ্বত সত্যধর্মের পূর্ণাঙ্গ, বিশ্বজনীন ও চূড়ান্ত রূপ বলে দাবী করে। যুক্তি-প্রমাণ ও বাস্তবতা দিয়ে সার্থকভাবেই যা প্রতিপন্ন করেছে। আল কোরআনের ঐশীধর্মিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্য, অবিকৃত ও সুরক্ষিত। হাদিসের সংরক্ষণ ও শ্রেণীকরণ পদ্ধতি নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত। আর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর প্রজ্ঞা, চরিত্র ও নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারাও স্বীকৃত। বিশ্বায়নের লক্ষ্যে একমাত্র তাঁকেই বিশ্বনবীর যোগ্যতা, দায়িত্ব ও মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারে এমন কোন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ ইতিহাস পায়নি। বিশ্বনবী যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন তা তাঁর জীবদ্দশাতেই মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করে আফ্রিকা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে যা পৃথিবীর অর্ধেক ভূভাগ জুড়ে (তৎকালিন সভ্য পৃথিবীর সিংহভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং বিজয়ী আদর্শ হিসেবে ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য।

সর্বোপরি, বিশ্বনবীর আদর্শে বিশ্বায়ন হলে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হবে বিশ্ব-স্রষ্টার অধীনে। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব থাকবে না। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকলেই এক স্রষ্টার প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ইহকাল এবং পরকালে জবাবদিহির অনুভূতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহর আইন মেনে চলবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিধিবদ্ধ অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিটি রাষ্ট্র বা সরকার এক কেন্দ্রের অধীনে সহাবস্থান করবে। কেউ সীমালংঘন করবে না। আগ্রাসন নয়, জাতীয় ও মানবিক উন্নয়নে সবাই সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবে। উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত হবে। মানুষের জীবনে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য।

www.pathagar.com

বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে শৃংখলা, সাম্য ও শান্তি। বিশ্বায়ন হবে মানবতার কল্যাণে। এ সত্যটি যেমন বুঝতে হবে বিশ্বের শান্তিকামী নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষকে তেমনি এগিয়ে আসতে হবে সর্বস্তরের সাধারণ মুসলমানকে। বিশেষ করে বিশ্বায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মূল উদ্যোগ গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করতে হবে মুসলিম রাষ্ট্র, সংস্থা ও ইসলামী আন্দোলনগুলোকে। প্রাথমিক পদক্ষেপে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রূপে 'মুসলিম জাতিসংঘ' গঠন করা যেতে পারে, যাকে কেন্দ্র করে সাংবিধানিকভাবে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্যের মাধ্যমে আধুনিক আঙ্গিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে খিলাফত ব্যবস্থাকে। এর মাধ্যমে আভ্যন্তরিণ সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিরোধ করতে হবে পুঁজিবাদী অশুভ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আর পরিচালনা করতে হবে মানবতার মুক্তিকামী বিশ্বনবী সূচিত শাশ্বত বিশ্বায়ন পরিকল্পনা। ওআইসি খুব দ্রুত এমন ঐকমত্য সিদ্ধান্তে আসুক এটাই সময়ের দাবী। ■

দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য সুসংবাদ

আপনার কাঙ্ক্ষিত (A+/A) ফলাফলের নিশ্চয়তায়

মিফতাহুল ফালাহ্ দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশন্স- ২০০৩

এতে প্রশ্ন সাজেশন ছাড়াও আরো পাচ্ছেন–

⁘ আরবি দ্বিতীয় পত্র ⁘ সাধারণ গণিতের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির নির্ভুল সমাধান।

⁘ ইংরেজি Unseen অংশের নির্ভুল উত্তরমালা ⁘ জটিল বিষয়ের সমাধান।

ইবতেদায়ী বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের বৃত্তি পাওয়ার নিশ্চয়তায়

মিফতাহুল ফালাহ্ ইবতেদায়ী পঞ্চম বৃত্তিসহচর–২০০৩

ইসলামাবাদ লাইব্রেরী

বুক্স এন্ড কমপিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৪৩১

আঞ্জুমন বিপণী
১৫৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন ঃ ০৩১-৬১৯০২২

www.pathagar.com

না'ত : বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত

ড. আবদুল ওয়াহিদ

□

রাসূলের শানে কবিতা, না'তিয়া বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় আস্তিক বনী আদম মাত্রেই রচনা করে থাকেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষায় এর ব্যত্যয় ঘটেনি। পুঁথি সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত রাসূলের শানে রচিত হয়েছে অগণন না'তিয়া। না'ত শব্দটির অর্থ, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

না'ত– আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

না'ত যবর দিয়ে (স্ত্রীলিঙ্গ) আরবী একটি শব্দমূল। শব্দটি সাধারণ গুণ- বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গভীর অভিনিবেশের সাথে শব্দরিট আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানে বেশ কটি অর্থ দেখা যায়। 'তাজুল আরূস' আভিধানিকের মতো আন্না'তু শব্দটি আরবী রূপান্তর ব্যাকরণে বাবে ইফতিয়ালে থেকে ইনতিয়াত ওজনে এসে থাকে। আর ইনতিয়াত শব্দের অর্থেও গুণকীর্তন ব্যবহৃত হয়। না'ত এর বহুবচন হলো নুয়ূত। তিনি আরও বললেন, না'ত বর্তমানে উভয় অবস্থাতেই মাফতূহ বা যবর হয়ে থাকে। না'ত অর্থ হচ্ছে গুণকীর্তন। বিশেষত কোন কিছুর অতিশয় গুণ-কীর্তন করলে না'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গুণ-কীর্তনে যা-ই বলা হয় তাকেও না'ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। আর গুণ বর্ণনাকারীকে বলা হয় না'য়িত। এর বহুবচন হলো নু'য়াত। কবির ভাষায় বলা যায়, আমি তাঁর প্রশংসা করেছি, আমি তাঁর প্রশংসাকারীদের একজন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও না'ত বলেই অভিহিত করা হয়। তাঁর না'ত বর্ণনাকারীর ভাষায় 'আমি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর ন্যায় কোন মানুষ দেখিনি।'

ইবনে সাইয়্যেদাহ বলেন, প্রত্যেক উত্তম এবং ভালো বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ অতিশয়োক্তির সাথে করাকেই না'ত বলে অভিহিত করা হয়। অতি চমৎকার কিছু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এটা হচ্ছে না'ত।

আযহারীর মতে, না'ত শব্দটি সেই ঘোড়ার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যে

www.pathagar.com

ঘোড়া অতি সুন্দর এবং দৌড়ে সব সময় প্রথম হয়ে থাকে। এমনিভাবে শব্দাবলীও সেই অশ্বের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যে ঘোড়া শ্রেষ্ঠত্ব, অতিক্রম এবং দ্রুত চলার গুণবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

মুনতাআত মুনতাআল শব্দের ওজনে সেই জীব (মানুষ বা জন্তু)-কে বলা হয়ে থাকে যার মধ্যে এমন কোন বিশেষ গুণ রয়েছে যা তাকে তার সমশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। যেমন- আমি তার না'ত বর্ণনা করেছি, তাই সে না'তের অধিকারী বনে গেছে। এমনিভাবে বলা হয়ে থাকে আমি তার গুণকীর্তন করেছি, তাই সে প্রশংসিত হয়েছে। ইবনুল আরাবী লেখেন যে, না'ত শব্দটি সেই মানবের জন্যও ব্যবহৃত হবে, যিনি সুদর্শন এবং সুন্দর ও মিষ্টভাষী।

আর না'য়িত শব্দের বহুবচন না'য়িতূন, না'য়িতান এসে থাকে। অবশ্য সিহাহ ও লিসান অভিধানে প্রথম রূপান্তরটিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি কবিতা দেখুন : হে উম্মে বশীরের এলাকায় বসবাসকারী গোত্র! যারা প্রশংসাকারীদের মধ্যে তাসরীর-এর সন্নিকটে রয়েছে।

না'ত ও ওয়াসফ-এর মধ্যকার পার্থক্য : না'ত শব্দটিকে সাধারণত ওয়াসফ শব্দের সমার্থক মনে করা হয়। অবশ্য আভিধানিকগণ শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। ইবনে আসীর বলেন :

না'ত হচ্ছে কোন কিছুর ভালো দিকগুলো বর্ণনা করার নাম। খারাপ বর্ণনার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। কেউ বাধ্য হলে বা করলে বলা হয়ে থাকে খারাপ না'ত তারিফ বা গুণ, সৌন্দর্য এবং খারাপ দিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কামুস অভিধান প্রণেতা জাওহারী এবং ফাইউমীর মতের বিপরীতে ইবনে আসীরের উপযুক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন : না'ত শারীরিক সৌন্দর্য বা চরিত্র-মাধুর্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- লম্বা, খাটো। এছাড়া কর্মের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন- প্রহারকারী। তিনি সা'লাবের মতামতও উপস্থাপন করে বলেন, না'ত হচ্ছে মানুষের শরীরের জন্য নির্দিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লেংড়া হয়ে যাওয়া। আর সিফাত শব্দের ব্যবহার সাধারণ। যেমন- আজীম ও কারীম বলে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াসফ বর্ণনা করা হবে, না'ত নয়।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, না'ত শব্দটি আরবী অন্যান্য শব্দের কাছাকাছি অর্থবোধক। অবশ্য নাত শব্দটি ভিন্নার্থক এবং উপযুক্ত শব্দাবলীর চাইতে উত্তম অর্থবোধক। প্রথমত দেখা যায়, শব্দটি বিশেষভাবে প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, শব্দটি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণকীর্তনেই ব্যবহৃত হয় না, বরং শব্দটি ভালো গুণ পরিদৃশ্য করার ক্ষমতা রাখে। আয যুবায়দীর ভাষায় : কোন বস্তুর সৌন্দর্যের সেই বর্ণনা যা সেই গুণের মধ্যে তারই মধ্যে থাকার কারণে অতিশয়োক্তি করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, শব্দটি উৎসগত দিক থেকেই উত্তম গুণের অধিকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তির জন্য যে জন্মগতভাবে সুন্দর, উত্তম চরিত্র এবং ভালো অভ্যাসের অধিকারী।

চতুর্থত, শব্দটি গুণ-বৈশিষ্ট্যাবলীর চূড়ান্ত সীমা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুরআনে এ শব্দমূলের না'ত কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য, কোন কোন তাফসীরকার কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দটিকে ওয়াসফ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

হাদীসে এবং শামায়েলুন নবীতে (হাফেজ মুহাম্মদ ইবন ঈসা) না'ত শব্দটি নাহু ও সরফের বিভিন্ন পার্থক্যসহ প্রায় ৫০টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে শব্দটির বিভিন্ন রূপ অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেলেও শব্দটি নবী করীম (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বিশ্ব সাহিত্যে। উদাহরণস্বরূপ সুনানু দারামীর বর্ণনা উপস্থাপনযোগ্য :

"আপনি তাওরাতে নবী করীমের প্রশংসা কিরূপ পেয়েছেন?"

হাদীস অধ্যয়ন করার পর এরই নিরিখে কোন কোন ব্যাখ্যাকার এবং এ মুহাদ্দিস স্ব স্ব লেখায় না'ত শব্দটিকে ওয়াসফ শব্দের সাধারণ অর্থ থেকে পৃথক করে শব্দটিকে নবী করীম (সা)-এর প্রশংসার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এভাবে শব্দটিকে একটি বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষায়িত করেছেন।

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ

নবী করীম (সা) গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় যে সাহিত্য পদ্যে হোক বা গদ্যে রচিত হয় তা-ই না'ত বলে অভিহিত। ড. ইউনুস হুসনী বলেন "এমন সমুদয় পদ্য যাতে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন প্রতিভাত, তাঁর সৌন্দর্য-চরিত-মাধুর্য বর্ণিত হয় তার সবই না'তের প্রশংসায় যায়। ড. ফরমান ফতেহপুরীর ভাষায়, নবী করীম (সা)-এর প্রশংসাসম্বলিত গদ্য ও পদ্যের প্রতিটি ছত্রই না'ত বলে অভিহিত।

প্রতীয়মান হচ্ছে, কবিতা, গান, গজল, কাসীদা, মসনবী, রুবায়ী, মুসাদ্দস যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, নবী করীম (সা)-এর শানে হলে তা-ই না'ত বলে বিবেচিত হবে। আর বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় নবী চরিত এবং নবী শানে রচিত হয়েছে অগনন সাহিত্যসম্ভার। বলা হয়ে থাকে, কোন শিক্ষিত মানুষমাত্রেই নবী করীমের উপর অন্তত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা উচিত।

না'ত শব্দ রাসূলের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্রথম ব্যবহার

নবী কারীম (সা)-র প্রশংসায় না'ত শব্দটি কবে, কোথায়, কিভাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে এটা নির্ণয় এবং নির্ধারণ করা কঠিন। সৈয়দ রফীউদ্দীন আশফাক মনে করেন, প্রথম

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শামায়েলে তিরমিযীর দীর্ঘ হাদীসের নিম্নোক্ত শব্দ ক'টি এখানে উল্লেখ্য : "আপনার ওপর একাকী যার দৃষ্টি পড়ে, যে ভয়ে নিপতিত হয়, যে আপনার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে আপনাকে ভালোবাসে, আপনার প্রশংসা করে বলে যে, আপনার পূর্বে না আপনার ন্যায় কাউকে দেখেছে আর না আপনার পরে আপনার ন্যায় কাউকে দেখেছে।"

আশকাফ বলেন, না'য়িত শব্দটি ইসলামী সাহিত্যে এ অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সুনানু দারমীতে কা'ব আল আহবারের বর্ণনা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া মাসায়েসুল কুবরা গ্রন্থে জালালুদ্দীন সুয়ূতীও এ ধরনের কটি বর্ণনার উদ্ধৃতি সংযোজন করেছেন।

আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, না'ত শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থাকলেও শব্দটি প্রিয়নবী শেষ নবীর প্রশংসায় বিশ্ব সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কবি-সাহিত্যিক-লেখকমাত্রেই মহানবীর জীবন-চরিত নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ এবং আধুনিক যুগেও নবীপ্রশস্তিসম্বলিত অনেক লেখা, গজল, কবিতা এবং স্মরণিকা-সংকলন রচিত, অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ যাত্রা কখনো থামবার নয়। ■

মাসিক পৃথিবী পড়ুন

এতে থাকে—

- আল কুরআনের ভাবানুবাদ
- আল হাদীসের অনুবাদ
- আল ফিকহ (মাসলা মাসায়েলের সমাধান)
- চিন্তাধারা (ইসলামের ওপর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ)
- জীবন কথা (সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনী)
- ইসলামী দুনিয়া
- আন্তর্জাতিক বিষয়
- অর্থনীতি
- স্বাস্থ্য কথা
- পুষ্টি বিজ্ঞান
- প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

----যোগাযোগের ঠিকানা----

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭, ই-মেইল : bic@accesstel.net

www.pathagar.com

চন্দ্রালোকে মুক্তি ভাসে

সাবিনা মল্লিক

□

কাবাসা যখন শোকে উন্মাদ, পরনের জামাকাপড় এলোমেলো, মাথার চুল খোলা– কাঁদছিল পাগলের মত, ঠিক তখন ইবনে আবু কায়েস গায়ের চাদরটা খুলে ছুঁড়ে মারল তার মাথায়।

কাবাসা ভীষণ চমকে গেল। কান্না ভুলে স্তব্ধ হয়ে রইল খানিক সময়। পরে, চাদরটা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখল– তার সৎ ছেলে– তীর্যক চোখে তাকিয়ে তারই দিকে। ছেলের চোখে অশ্রুর রেশ। কিন্তু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। শোক ছাপিয়ে চোখের ভাষায় অন্য রকম ইঙ্গিত।

কাবাসা বিমূঢ় হয়ে বসে থাকল আবু কায়েসের মরদেহের পাশে। তার স্বামী– তার হৃদয়— আজ তার কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। সে সাথে নিয়ে গ্যাছে তার অধিকার, তার সম্মান, সবকিছু।

তরুণী কাবাসা। তন্বী কাবাসা। রূপের ডালি নিয়ে সে এখন তার স্বামীর বাড়ীর স্থাবর সম্পদ। সৎ ছেলে চাদর ছুঁড়ে দখল নিয়ে নিয়েছে একটু আগে। এই ছেলে এখন তার মালিক। সে ইচ্ছে করলেই তাকে দিয়ে দাসীর মত ঘরকন্না করাতে পারে, কিংবা পশু চরাতে পাঠাতে পারে ঐ পাহাড়ের ওপারে। এমনকি তাকে ভোগও করতে পারে, নিকাহ্ করে কিংবা না করে।

কাবাসার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার ছেলেবেলার সই রইয়ানার বেদনার্ত করুণ মুখ। রইয়ানার স্বামীটা মরে গেল যুদ্ধে। তার সতীনের ছেলে হারেস নিকে করল তাকে। কাবাসার সাথে কখনও সখনও দেখা হলে রইয়ানা বিলাপ করে বলত, "এর চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল সই। স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের সাথে যখন আমার রাত যাপন করতে হয় তখন সারা গা ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে। মনে হয় ছুটে গিয়ে ঐ পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দেই, কিংবা খেজুরের রশি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ি। বদমাশটা যখন আমার দিকে হাত বাড়ায়, তখন ইচ্ছে করে ছুরি বসিয়ে দেই ওর বুকে তারপর মেরে ফেলি নিজেকে" –

আর বিধবা আসমা। ওর কি অবস্থা! ও আবার দেখতে ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি। ওকে নিয়ে বেধে গেল স্বামীর ভাইদের মধ্যে লড়াই। সবাই পেতে চায়। সবাই নিতে চায় ওর

www.pathagar.com

দখল। কদিন কি মারামারি গালাগালি! শেষে ওর শাশুড়ী চালাকী করে মালিকানার চাদর আসমার গায়ে বিছিয়ে দেবার সময় চাদরের প্রান্তগুলো ছোঁয়ায়ে নিল সব ছেলেকে দিয়ে। আসমা চলে গেল তার মৃত স্বামীর ভাইদের যৌথ মালিকানায়। ভাইদের বিবাদ মেটাতে আসমাকে এখন পালা করে যেতে হয় প্রতি ভাইয়ের ঘরে, প্রতি রাতে।

লবীবার স্বামী মরে গেলে তার দখল নেয় তার চাচা শ্বশুর। বেটা একটা চামার। বাড়ীতে রাজ্যের পোষ্যি। এতগুলো লোকের কাপড় কাঁচা যত্ন-আত্যি, যব পেষা, গাদা গাদা রুটি বেলা, সরুয়া রাঁধা সব এখন এই লবীবার। বাড়ীর ঝি বলতে সেই। আর কেউ কুটোটি পর্যন্ত ছোঁয় না। একটু এদিক ওদিক হলে গালি গালাজ এমনকি মারধোর। ঘর বন্ধ করে ওকে পেটায় ওর চাচা শ্বশুর আর শ্বশুরের ছেলেরা। অথচ লবীবার স্বামীটা ছিল মহাবিলাসী। আলাদা বাড়ীতে বউকে নিয়ে থাকত। কত সাজগোজ, কত সোহাগ। দুজনের দুটো রুটি আর সরুয়া রাঁধা ছাড়া লবীবার কি কাজটা ছিল? দিনমান কাটত তার স্বামীর সাথে খুনসুঁটি করে আর সেজেগুজে পাড়া বেড়িয়ে। কত ভাল গাইত মেয়েটা! কারো বড়ীতে বিয়ে হচ্ছে আর লবীবার গান নেই এমন কথা কে ভাবতে পারত?

আজ লবীবা যেন যন্ত্র। গলায় গান নেই। দেহে সাজ নেই। দু'চোখে শুধু ক্লান্তি, শুধু ঘুম। আহ শেষ ঘুমটা কবে আসবে! কবে পারবে স্বামীর কবরের পাশে নিজের ঘুমটা ঘুমিয়ে নিতে? লবীবার বুক চেরা আর্তি এখন এতটুকুই।

কুলসুমের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কুলসুমকে মেরে মুখে বিষ ঢেলে দিয়েছে এ খবর এখনও ফিরছে লোকের মুখে মুখে। কুতাইলার দজ্জাল শাশুড়ী বিধবা বউটাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে- এটাতো কাবাসার নিজের চোখে দেখা। খেজুর বাগানে বসে কাঁদছিল বউটা। পরনের জামা ছেঁড়া ফালা ফালা। পিঠে চাপ চাপ রক্ত। নাক মুখ ফোলা ফোলা।

দৃশ্যটা মনে পড়ায় কাবাসা শিউরে উঠল। ভয়ে জমে যেতে যেতে স্বামীর মৃত মুখের দিকে চাইল। মনে মনে সে আকুল হয়ে বলতে লাগল, "আবু কায়েস! তুমি কেন চলে গেলে? আমাকে কোথায় রেখে গেলে আবু কায়েস? তোমার ছেলে তোমারই ঔরসজাত ছেলে আমায় দিয়ে এখন দাসীবৃত্তি করাবে, আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। দেখ, সে এখন আমার মালিক। আবু কায়েস! তুমি কেন আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলে না!"

কিন্তু কাবাসার বিলাপ তার স্বামীর কর্ণগোচর হোক বা না হোক আবু কায়েসের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মসজিদে নববীতে তার জানাযা হবে। দাফন হবে সম্ভবত জান্নাতুল বাকীতে। কাবাসা অতশত জানতে পারল না।

আবু কায়েস মুসলমান। কাবাসাও। আকাবায় বায়েত হয়ে আসা আনসারীদের কাছে ওরা কলেমা পড়েছে। নবী (সা) মদীনায় তাশরীফ আনার আগ পর্যন্ত খুব একটা উচ্চবাচ্য করার সাহস পায়নি ওরা। এখন অবশ্য দিন পাল্টেছে। লোকজন মুসলমান

www.pathagar.com

হচ্ছে ঘরে ঘরে। যদিও আবু কায়েসের পরিবার একটু বন্য প্রকৃতির। সময়ে সময়ে নির্দয় নির্মম হতে বাধে না। বিশেষ করে আবু কায়েসের প্রথম স্ত্রীর ছেলেটা। কেমন বুনো গোঁয়ার। বদমেজাজের এক শেষ। নবী (সা) এখানে এসে যাওয়ার পরও ছেলেটাকে লাইনে আনা গেল না। ঘোরে ফেরে সে বাজে লোকদের সাথে। বাজে জায়গায় যায়। বিন উবাইয়ের মজলিসে তো তার নিয়মিত যাতায়াত।

সন্ধ্যা নামার পর শোক বুকে নিয়েও ওকে যেতে হল উনুনে। ভোজ হবে আজ এ বাড়ীতে। মৃত কায়েসের জন্য বিলাপ করতে আসা আত্মীয় পড়শীদের খাওয়ানো হবে ঘটা করে। কাবাসার যেন কোন দিকে মন নেই। যন্ত্রের মত রুটি বেলে বেলে সে পাহাড় গড়ে ফেলতে লাগল।

এরিমধ্যে হেঁশেলে কয়েকবার তদারকী করে গেছে তার সতীনের ছেলে তার মালিক। ছেলের প্রতিটি পদে আজ ভারি কর্তৃত্ব। কথায় বার্তায় হুকুমের সুর। সময়ে এই ছেলে যে কতটা পশু হয়ে উঠবে হিংস্র নখরে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে ওকে তা ভেবে কাবাসা হিম হয়ে যেতে লাগল চুলোর আগুনের পাশে বসেও।

আচ্ছা, আব্বাকে কি খবর দেয়া হয়েছে?

এদিক-ওদিক চাইল কাবাসা। কিন্তু, শুধোবার মত কাউকে কাছে পেল না। আসলে এ বাড়ীতে নির্ভর কর্‌র মত আর একটি জনমনষ্যিও রইল না ওর জন্য।

আব্বা খবর পেয়ে তো ঠিকই চলে আসবে। অবশ্যই আসবে। ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত নাও দেবে। কিন্তু, মেয়েকে সাথে নিতে পারার মত ক্ষমতা যে তার নেই। স্বামীর বাড়ীর ওয়ারিশরা ছাড়তে না চাইলে কাবাসার বাপের কি সাধ্য মেয়েকে সাথে নেয়!

কিন্তু এ বাড়ীর লোকেরা ওকে ছাড়বে না। কেন ছাড়বে? কাবাসার সিন্দুকে আছে অনেক সম্পদ। বিয়ের সময় বাপের বাড়ী থেকে আনা গহনাপাতি আর মোহর।

কাবাসা ধনী ঘরের মেয়ে। বিয়ের সময় ওর বাবা দুহাত উজাড় করে দিয়েছিল। পণের টাকা তো দিয়েছেই, তাছাড়া মেয়েকে দিয়েছে উপহার। এত এত। এতদিন এগুলো ছিল কাবাসার ব্যক্তিগত ভাণ্ডার। এখন আবু কায়েসের ছেলে হাতিয়ে নেবে নির্ঘাত। একটা চুল পর্যন্ত এদিক-ওদিক হতে দেবে না। কাবাসা চলে গেলে – অলংকারগুলো চলে যাবে– চলে যাবে স্বর্ণমুদ্রা। ওরা এটা মেনে নেবে ভাবা যায় না।

আচ্ছা কাবাসা তো সম্পদ চায় না, সে চায় মুক্তি। সে যদি এগুলোর দাবী ছেড়ে আব্বার সাথে যেতে চায়? কিন্তু তাও হবার নয়। সতীনের ছেলের হাবে-ভাবে বোঝা গেছে সে নিকে করার জন্য আটকে রাখবে বাপের বিধবা বউকে। এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না কুলাঙ্গরটা।

কাবাসার কেমন যেন বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সে ফুঁপিয়ে উঠল হঠাৎ। বেলনা ফেলে বাইরে কুয়োর পাড়ে এসে দাঁড়াল সে। চাইল আকাশের দিকে। তারায় তারায় ছেয়ে থাকা আকাশ। সেই আকাশের ওপারে যিনি আছেন তার কাছে নালিশ করল খানিক কেঁদে কেঁদে।

www.pathagar.com

বাড়ীর ভেতর থেকে ডাকতে এলো শাশুড়ী "কাঁদা কাটা পরে করো বাপু। এক বাড়ী লোক বসে আছে খাবার জন্য। রান্নাটা শেষ করে ওদের খেতে দাও গে।"
কাবাসা উনোনের ধারে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ যেন অকূলে কূল পেল। মনে হল, কাল একবার দেখা করতেই হবে। তার সঙ্গে। হ্যাঁ। তাইতো। কালই। যে করেই হোক তার সাথে ওর দেখা করা চাই-ই।
পরদিন। সন্ধ্যা পেরোলে আঁধারের আড়ালে কাবাসা হাজির হল মসজিদে। নবীজী (সা) বাইরেই ছিলেন। প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন খোলা বাতাসে।
কাবাসা সামনে গিয়ে সালাম করতে উনি জবাব দিলেন।
- "আমি কাবাসা বিনতে মায়ান। আবু কায়েসের বিধবা স্ত্রী।"
কি আশ্চর্য! তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
- "জী। কি আর্জি বলুন।" প্রচণ্ড সম্ভ্রম মানুষটির কণ্ঠে।
কাবাসা প্রথমটায় কি বলবে ভেবে পেল না। শেষে সাহস সঞ্চয় করে বলল,
- "আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। হযরত, আমরা মেয়ে বলে কি মানুষ নই?"
আকাশের চাঁদটা এখন বেশ উজ্জ্বল। চারদিক দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কাবাসা জবাবের জন্য নবীজীর মুখের দিকে চাইল। কিন্তু, তিনি কিছু বললেন না। বরং দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কাবাসাকে সুযোগ দিলেন কথা গুছিয়ে নিতে।
- "দেখুন হযরত, আমাদের আনসারীদের কি নিয়ম! কেউ বিধবা হলে জোর করে তাকে আটকে রাখে স্বামীর বাড়ীতে। কেউ চাইলে তাকে নিকেহ্ করে বা দাসী বানিয়ে রাখে। বাপের কাছে আমাদের ফিরে যেতে দেয় না। যেন আমরা মানুষ নই, পুতুল। স্বামীর ওয়ারিশদের সম্পত্তি।"
কান্নার দমকে কাবাসার কণ্ঠ বুজে এলো। তবু সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে যেতে লাগল, "আমার সতীনের ছেলে এখন আমার মালিক হয়েছে। তার যে স্বভাব– আমি তো প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছি ইজ্জত হারানোর। এই অবস্থা থেকে আমাদের কি কোন মুক্তি নেই? আল্লাহর দ্বীনে এই অসহায় অবলাদের জন্য কোন আশ্রয় নেই?
কাবাসার গলায় প্রতিবাদ ভর করল। বিদ্রোহের তোড়ে সে আরো কিছু বলতে চাইল। আরো অনেক কিছু। কিন্তু থমকে গেল নবীজীর দু'চোখে কান্না দেখে চাঁদের মত মুখটা ব্যথায় বিবর্ণ। ঠোঁট কাঁপছে থরো থরো।
কাবাসা নিশ্চুপ, রুদ্ধ।
আল্লাহর নবী (সা) সময় নিচ্ছেন। কিছু বলতে চাইছেন, দিতে চাইছেন সান্ত্বনা– কিছু আশ্বাস। কিন্তু পারছেন না। হাজার বছরের পাশবিকতার শৃংখল তিনি কি করে ভাঙবেন? কি করে মুক্তি দেবেন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় মায়ের জাতিকে এই বর্বর অসভ্য রেওয়াজ থেকে? নবীজী বিব্রত বোধ করতে লাগলেন ভীষণভাবে।

www.pathagar.com

এভাবে কিছুক্ষণ। হঠাৎ তিনি পরিবর্তিত হতে লাগলেন। এবং কাবাসা আশ্চর্য হয়ে প্রত্যক্ষ করল নবীজী (সা) অহী নাজিলের অবস্থায় যাচ্ছেন।
কি কষ্ট! প্রচণ্ড কষ্ট! ঘামে ভেসে যাচ্ছে চেহারা। মনে হচ্ছে পাহাড় সমান বোঝায় দেবে যাচ্ছেন তিনি। কাবাসা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল শুধু।
অবশেষে স্বাভাবিক হয়ে এলেন তিনি। ধীরে ধীরে কাবাসাকে শোনালেন তা, যা এতক্ষণ ধারণ করছিলেন অমানবিক কষ্টের ভেতর দিয়ে,
"হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না। যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে করো না কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে ..." (সূরা আননিসা)
আনন্দে কাবাসার চোখে পানি এসে গেল। পানি লুকোতে সে চাইল আকাশের দিকে। কি মুক্ত আকাশ! চন্দ্রালোকে কেবল ভাসছে আর হাসছে। হাসছে আর ভাসছে। ■

www.pathagar.com

মাটি-চোখ মেলে ॥ সৈয়দ শামসুল হুদা

শ্যামল শ্যামল হলো সুনীল সুনীল
তুমি যেই এলে নবী তুমি যেই এলে।
আলোদের আলো তুমি জানলো আলোরা
অপূর্ণ অপূর্ণ সবি হলো পূর্ণ হলো।
মরি মরি অলক্ষিত কী যে দৃশ্যাবলি
পৃথিবী আপন ভোলা আপন সম্ভারে।

যেদিকে সে মেলে চোখ চেনে না নিজেকে
অঙ্গ জুড়ে অভিনব এক কারুকাজ!
তুমি এলে সাথে সাথে সর্ব আকাংক্ষিত
ধরা দিলো মানুষের স্বপ্ন স্বপ্ন হাতে।

মরুচিত্ত নৃত্যময় সাগরের জল-
ফুলেদের দোল্ দোল্ রঙের বাহার
জান্নাতেরা এলো নেমে, সপ্ত আকাশের
একে একে গেলো খুলে সকল দুয়ার।

স্রষ্টা সুপ্রকাশমান প্রিয় সৃষ্টিময়
মানুষের বিজয়ের দোলে মাল্যখানি
পরানো তোমারি কণ্ঠে প্রিয় স্রষ্টা হাতে
পরালে সে মাল্য তুমি কণ্ঠে সকলের।
তুমি যেই এলে নবী তুমি যেই এলে
স্রষ্টাকে দেখ্লো সৃষ্টি মাটি-চোখ মেলে।

শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ॥ বিশ্বনাথ হালদার

শ্রেষ্ঠ নবী দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ
সাফায়াতে যাঁর মুক্তি পাবে গোনাগার উম্মত।
বাল্যকালেই মানুষের প্রতি তাঁর জন্মেছিল মায়া
যেমন সবুজ মহীরুহের তলে সুনির্মল ছায়া।
কুরাইশ বংশে জন্ম তাঁর ভরপুর আদর্শ জীবন
বিশ্বাসীরা অসংকোচে করে তাঁর পথ অনুসরণ।

www.pathagar.com

একটি চাঁদ ॥ মামুন আবদুল্লাহ

একটি চাঁদ হাসলো যখন মরুর বুকে
মানুষ সব শান্তি পেলো পরম সুখে
মারামারি
কাটাকাটি
বাড়াবাড়ি
দূর হলো।
ন্যায়ের ধ্বনি
ছুটে গিয়ে
দিগবিদিকে
সুর হলো।

অমানিশা সরে গিয়ে আসলো রোদ
এলো ফিরে সাম্য এবং মূল্যবোধ।

সুরের লেহাজ ॥ হাবিবুর রহমান

ঊষার আলোয় রঙিন হয়ে তপ্ত মরুর বালুর পরে
ডাকলো তাদের ডুবেছে যারা মিথ্যা মোহের অন্ধকারে
অলস ঘুমের রেশ কাটালো বাজিয়ে দৃপ্ত মোহন বাঁশী
সাম্যবাদের সুনীতিতে ফুটলো তাদের মধুর হাসি।

কার ছোঁয়ায় ধন্য হলো পুণ্যভরা আরব তীর
আদেশে কার জীবন দিলো দ্বীনের সেনা লক্ষ বীর
মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ ওমর আসলো ছুটে
কোন যাদুতে পাগল হয়ে পড়লো তাঁর চরণে লুটে।

আশরাফুল আম্বিয়া তিনি, অনুপ দয়ার বিশ্বনবী
নাজাত লাভের পথ দেখালো মানসলোকের ধ্যানের ছবি
ইশারাতে পড়লো খসে গগন কোলে দীপ্ত শশী
সততায় যাঁর মুগ্ধ হলো নিখিল আরব মরুবাসী।
পড়লো নুয়ে চরণ তলে শত রাজার শিরের তাজ
ছড়িয়ে গেল বিশ্বজুড়ে নব মুক্তির সুরের লেহাজ।

www.pathagar.com

বিশ্বজগৎ ধন্য ॥ নজরুল ইসলাম শান্তু

রাসূল আমার দ্বীনের নবী
বিশ্ববাসীর তাজ,
বাহক হয়ে জন্ম নিলেন
মানব জাতির মাঝ।

অন্ধ যুগের প্রাচীর ভেঙ্গে
মা-আমিনার ঘরে,
কচি মুখে শিশুর হাসি
মায়ের হৃদয় ভরে।

গাছপালা ও আকাশ-বাতাস
সকল সৃষ্টিকুল,
শেষ নবীকে চিনতে কেহ
করলো না যে ভুল।

ফুলের মতো অবুঝ শিশুর
লালন-পালন ভার,
সব হয়ে যায় ভাগ্যবতী
দুধ-মা হালিমার।

আঁধার ঘরে নূরের আলো
মোহাম্মদ (সা)কে পেয়ে,
দুধ-মা ভীষণ আদর করেন
গালে চুমু খেয়ে।

শিশু নবীর আগমনে
বিশ্বজগৎ ধন্য,
ইসলামী আইন করতে কায়েম
মানব জাতির জন্য।

www.pathagar.com

তুমি চির অম্লান ॥ মোহাম্মদ সোলায়মান আকন্দ

শুধু নামেই পরিচিত
কার্য পরিণামে ভূলুণ্ঠিত।
পরিচিত ছোট্ট একটি অবদান
আমরা নাকি মুসলমান,
পরিচালিত সকল জ্ঞান অজ্ঞান রাসূল (সা)
মরে গিয়েও আগাম মহীয়ান।
ও নবীজী তুমি কি?
বৃক্ষের মত ফল দেয়া বৃক্ষরাজ
তুমি ছিলে কুরআনের আলোকে আলোকিত
স্বচ্ছ ও সুন্দর প্রাণ,
তুমি তখনি ছিলে খাঁটি অমলিন মুসলমান।

হায় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)
তোমার স্মরণে কলমের অনুকরণে।

ও চেনা জানা পথের রাজা রাসূল (সা)
তুমি সেই নবী হিসেবেই চিহ্নিত,
তামাম দুনিয়ার মুসলমান
তোমাকে এখনো জানায় সালাম
সালাম-সালাম হাজার সালাম
তুমি আমাদের হৃদয়েই আছ হযরত মোহাম্মদ (সা)।

সাধ ॥ নজরুল ইসলাম সাধু

মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আমি হবো মধুর ধ্বনি,
সবার মাঝে পৌঁছে দেব আল কোরানের বাণী
ভোরের হাওয়া হয়ে আমি ছড়িয়ে দেব ফুল,
শিশিরভেজা পরশ নিয়ে ফুটবে গোলাপ ফুল।

বনের পাখি হয়ে আমি প্রভাতি গান গাব,
ঘরে ঘরে ভালবাসার শুদ্ধ বাহন হব,
জয়ের দূত হয়ে আমি পরাবো জয়ের মালা
ন্যায়ের পথে শহীদ হলে মিটবে বুকের জ্বালা।

www.pathagar.com

মিশবো গিয়ে আল্ আক্সার নামাজীদের ভীড়ে
ক্লান্তি এলে ঘুমিয়ে নেব ফোরাত নদীর তীরে।
হেজাজেরই পুণ্য ধূলি বুকের মাঝে নিয়ে
ভক্তি ভরে করবো তোয়াফ হেরেম শরিফ গিয়ে।

দ্বীনের নবীর লাখো স্মৃতি দেখবো নয়ন ভরে
যেথায় তিনি হলেন বড় বিশ্ব আলো করে।
কাবা থেকে হাঁটবো আমি মদীনারই পথে,
প্রিয় নবী ঘুমিয়ে যেথায় দুই খলিফার সাথে।

সবুজ বিশ্বাসে ॥ আসাদুল্লাহ্ মামুন হাসান

ইন্দ্রিয় দেরাজ ভেঙে পাপের ভয়
ক্রমাগত ধেয়ে আসে অনুভূতি বেয়ে।
আগ্রাসিত হতে থাকে পুণ্যের ঘর-দুয়ার
বিধ্বস্ত ঈমান ভিতের।
লুণ্ঠনে দখল হতে থাকে এ হৃদয় বাগদাদ!
মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে নীল দাবানল বাঁধছে ঘাঁটি,
এ বুকের মাঝে শঙ্কা বাঁধে বাসা
তোমার সত্যের নূর নিভু নিভু দুরন্ত ধূলিঝড়ে
জ্বালিয়ে রেখেছি দুই তালু ঘিরে তোমার বিশ্বাসে
হে রাসূল আমার!
কাবার দিকে তাকাই চেয়ে থাকি সবুজ গম্বুজে,
জানি পাথর আঁধার কেটে তুলেছে আলোর হীরে
রাসূল আমার!
তাঁর নির্দেশ শুষে এ হৃদয়ের নিভু আলো সূর্য হবে আবার
সবুজ বিশ্বাসে পাপ কনভয় ফিরিয়ে দেবে।
তাই ফিরে চাই-আশা পায় এ হৃদয়
তোমার বিশ্বাসে
হে রাসূল আমার
সমগ্র অবিশ্বাসের সাদ্দাদ বেহেশত ছুঁড়ে ফেলে
এ হৃদয় জুড়ে থাকে যেন সত্য কাবার।

www.pathagar.com

পথের দিশা ॥ শাহাবুদ্দিন আহমদ

এক.
পূর্ণ শশীর আলোর ছটায় উঠল ধরা ধাম
বিশ্বনবীর আগমনে আসলো ছুটে পয়গাম
দখিন বায়ে নাচলো প্রাণ
পুষ্প ফোটা মধুর ঘ্রাণ
মা আমিনার কোলে এলো মোহাম্মদ (সা) তাঁর নাম।

দুই.
আরব দেশে পাহাড় কোলে ফুটলো নবীন ফুল
খুশবুতে তার মুগ্ধ হলো বিশ্ব মানব কুল
মুক্তির দিশা মানব পেলো
আঁধার টুটে আলোক এলো
বিশ্ববাসী নামে পেলো মোহাম্মদ রাসূল (সা)

তিন.
আখেরি নবী (সা) এলেন যবে লয়ে আল্লাহ নাম
প্রমাদ গোনে কাফের শত্রু যত শরীক বাম
মা আমেনার কোলে চাঁদ
বাঁধলো সুখে আলোর বাঁধ
ফেরেস্তা জিনে জানায় তাঁকে লক্ষ কোটি সালাম।

চার.
মহানবীর জীবন চরিত মহামূল্যবান
জানতে হবে রেখে গেলেন কোন সে অবদান
সেই নবীর (সা) পথটি ধরো
জনসমাজে প্রচার করো
তবেই তুমি দুই জাহানে হবে ভাগ্যবান!

www.pathagar.com

কী পূর্ণ তুমি কলঙ্কহীন ॥ শাহ্ আলম বাদশা

চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, আছে গায়ে দাগ
ভরা পূর্ণিমাতেও লুকাতে পারে কি তা যৌবনা চাঁদ
সুদূর নীলে ঝুলন্ত অই রাতের প্রদীপ
কী আকর্ষণে সাগরে তোলে প্রমত্ত জোয়ার
আজো কি জানতে পেরেছে বেভুল মানুষ;
অথচ চাঁদও তোমার ইঙ্গিতে হয়েছে দু'ভাগ
কে জানে না সেই অলৌকিক বিস্ময়!

কী আশ্চর্য লোক তুমি আর তোমার পরশ
যাদুকে মানালো হার বিজ্ঞানও তাই
আনত-বিনয়ে ছোঁয় তোমার পদযুগল?
সসাগরা পৃথিবীর প্রতিপ্রান্ত, আদিগন্ত সবুজ
এমনকি প্রাচ্য-প্রতীচ্য, কালো-ধলো মানুষের সাত মহাদেশ জুড়ে
লেগেছে তোমার দীনের ঢেউ আলোক জোয়ার
সত্যি, অতুলনীয় তুমি কালজয়ী তোমার জীবন।
চাঁদের কলঙ্ক আছে, অপূর্ণ সূর্যালোক তারও
কিন্তু ঐশী আলোয় হে রাসূল, কী পূর্ণ তুমি কলঙ্কহীন !!

আলোর পথিক ॥ আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী

আলোর পথিক এসেছিলেন আঁধার দুনিয়ায়,
মুঠি মুঠি সোনার আলো ছড়ান পথের ছায়,
আঁধার কালো দূর হলো সেই আলোর মহিমায়।

আকাশ বাতাস মুখরিত তাঁর মহিমা গানে,
শান্তিসুখের ঢেউ বয়ে যায় সবার প্রাণে প্রাণে,
গগন-পবন বিমোহিত গোলাব কুসুম ঘ্রাণে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- তিনি সবার নবী,
আকাশ নীলে আলোকিত প্রদীপ্ত এক রবি,
চাঁদের মতো মুখখানা তাঁর কী অপরূপ ছবি!

www.pathagar.com

আরব মরুর খেজুর বনে বুলবুলি গায় গান,
পাহাড় থেকে নেমে আসে ঝরনা বহমান,
নবী এলেন সবার তরে– আল্লাহতালার দান।

আমরা সবাই সেই নবীকে অনুসরণ করে,
শান্তি-সুখের ঢেউ দোলাবো সবার ঘরে ঘরে।

তোমার সুন্দর চোখ ॥ হোসেন সৈয়দ

সময়ের ডাইমেনশন ছিঁড়ে
পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে ফিরে
তোমার চোখের মত চোখ দেখিনি কোথাও।
আরণ্যক রাতে জ্যোৎস্না যেন
ঐ চোখ থেকেই ঝরে পড়ে।

কিশোর রোদের মত মায়াবী সে চোখ
আর বোরাকের পালকের মত নরম সে চোখ
কী এক স্নিগ্ধতায় যেন কাছে ডাকে
যেন ডানপিঠে ছেলেটিকে কাছে ডাকে মায়াবী ফড়িং!

আকাশের সবগুলো নীল আর মাঠের সবুজটুকু
কী এক মুগ্ধতায় জমে আছে ঐ চোখে!
মায়াবী সে চোখ   যেন পরশ পাথর
চোখে চোখে জ্বেলে দেয় স্বপ্নের কাজল।
পৃথিবীর বন্ধ দ্বারগুলো কেমন কাঁপিয়ে দিলো।
ঐ ঝড়ো দৃষ্টি!
পৃথিবীর দৃষ্টিগুলো আজ কেমন দিগন্তভেদী!
আসলে তোমার চোখ এক অপরূপ সৃষ্টি
ঐ চোখে জেগে ওঠে জান্নাতি চর, রোদ, বৃষ্টি
তোমার সুন্দর চোখ যেন জ্যোতির পরাগ
ঐ চোখে খেলা করে আরশের আদর সোহাগ।

www.pathagar.com

আমার সাক্ষ্য ॥ মাসুম সাঈদ

হায় আফসোস
ঐ চোখ দেখার পরও যার হৃদয় গলেনি,
অথচ আমিতো জানি
ঐ চোখ দেখলে আবেগের প্রাবল্যে
আমার হৃদয় ভেঙেই পড়তো।
আফসোস ইবনে মুগীরার দুর্ভাগ্যের জন্য
সেতো কাছে পেয়েও তার চরণযুগলে চুম্বন খেতে পারেনি
অথচ ইকরিমার ঘোড়াও তার ব্যক্তিত্বকে ভয় পেয়ে
মাটিতে মিশে যেতে চেয়েছিল
জানি, বিশ্বাসের আরেক নাম আবুযরের বৈরাগ্য,
খাদিজার ভালবাসা
আর ভালবাসা সাদা চাদরধারী ওয়ারাকার মতই চক্ষুষ্মান
হে চক্ষুষ্মানদের নেতা আমি সত্য অস্বীকারকারী নই
খোদার কসম, আমি আপনাকে ভালবাসি
আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র নির্বাচিত পুরুষ।
সুসংবাদদাতা এবং সমগ্র বিশ্বের মুক্তির সূত্র।

জানাই সালাম ॥ মমিনুর রহমান মমিন

জানাই সালাম
দরুদ পড়ি
হাজারো বার,

যার উপরে
ঝরতে থাকে
আল্লাহ তালার
সৃষ্টি গুণগান।

জানাই সালাম
দরুদ পড়ি

www.pathagar.com

যার নামেতে
গড়াগড়ি,

জান্নাতে আর
ধরার বুকে
আল্লাহ তালার
সকল অনুদান।

দরুদ পড়ি
জানাই সালাম

যার উপরে
আল্লাহ তালা
নাজিল করেন
নিজের কালাম।

মহামানব এলেন ধরায় ॥ কামরুল হাসান মল্লিক

বিশ্বনবীর জন্ম হলো
সকল সৃষ্টির মূল,
মহামানব এলেন ধরায়
নাই যে তাঁহার তুল।
চাঁদ হেসেছে নূর ঝরেছে
মা আমিনার কোলে,
বন বনানী-বৃক্ষরাজি
তাইতো আজি দোলে।
সুবাস ছড়ায় পুষ্পগুলি
নাচে সবার প্রাণ,
দখিন হাওয়ায় ভেসে এলো
ছন্দায়িত গান।
আনন্দে সব আত্মহারা
গানের পাখি সুর তুলে,

www.pathagar.com

অশান্তি আর দুঃখ ব্যথা
মরুবাসী যায় ভুলে।
বেহেশত হতে খুশীর ধারা
এই ধরাতে যায় ভেসে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
সালাম জানায় মুচকি হেসে।
বারোই রবিউল আউয়াল
বিশ্বনবীর জন্মদিন,
সাগর বুকে বিমল হাওয়া
বাজলো আজি খুশির বীণ।

সময়ের গুণনে তুমি ॥ মাসরুর নেপচুন

সোবহে সাদেকের আকাশ ভেদ করে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে ওঠে–
'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম'
রাতের নিদ্রা ভেদ করে মু'মিনের কানে শুনাও–
এসো, 'আমার' কাছে–লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলে।
নিদ্রাচ্ছন্ন 'তোমার' প্রিয় মানুষগুলো
ছুটে চলে 'তোমার' প্রেম কামনায়।
তোমার অস্তিত্বকে ভুলতে দাও না তাদের,
দুপুরের রোদকে ক্লান্ত করে দিয়ে
আবার ডেকে নাও
হে পরিশ্রান্ত মানব–
এসো, মিলন হোক তোমাতে আমাতে।
সূর্যকে পশ্চিমে পাঠিয়ে বলো–
তোমাকে নিয়েই আমার বিজয়– হে মু'মিন,
শয়তানের সমস্ত দাঁতকে কালো করে দিয়েছো তুমি।
পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাবার পর
সমস্ত আকাশ রক্তিম রঙ ধরে, বলে–
তোমার প্রভুর সামনে এসে দাঁড়াও!

www.pathagar.com

সে ছাড়া তোমার আর কে আছে?
রাতকে গভীরের দিকে নিমজ্জিত করে
বলো, হে মানব সকল– তোমার পাঁচটি
ক্ষণকেই আমাতে-তোমাতে মিলন ঘটিয়েছি।
দিনের সমস্ত চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে
বলো– এসো বার বার মিলিত হই আমরা–
আমাদের বারবার মিলনের মাঝেই
দেখবে, তোমার-আমার মাঝে কোন দূরত্ব নেই।

মুহাম্মদ রাসূল ॥ মতিউর রহমান মনির

আরব দেশের কুরাইশ বংশে
মা আমেনার ঘরে
জন্ম নিলেন প্রিয় নবী
হেদায়েতের তরে।

ওহী এলো পেলেন নবী
এক আল্লাহর দ্বীন,
দিকে দিকে উঠলো জেগে
দ্বীনের মুসলেমীন।

তাঁর উছিলায় বিশ্ব জুড়ে
জ্বলছে দ্বীনের বাতি,
বাতির আলোয় যুগে যুগে
কাটলো আঁধার রাতি।

প্রচার করে খোদার এ দ্বীন
ফুটিয়ে সত্য ফুল,
বিদায় নিলেন খোদার দোস্ত
মুহাম্মদ রাসূল॥

www.pathagar.com

পরশপাথর ছুঁয়ে আছি ॥ রেজা রহমান

শতাব্দীর সিঁড়ি ভেঙে আরবের মরুভূমি থেকে
সুবাতাস বয়ে আসে মানবজমিনে
বহতা নতুন পথ সহজ সরল।

নতুন আঙ্গিকে আনে উজ্জ্বল সকাল
সনাতন আলোকছটায় জাগে শান্তিময় সোনারঙা দিন।
–এসব কাহিনী নয়।

সত্যের সওদা নিয়ে চৌদ্দশ' বছর বেয়ে
শান্তিসেনা দিগ্‌বিদিক ছোটে
মানুষেরই হাতে বদলে মানচিত্র-ভূগোল।
একটি শুভ্রস্নাত সকালের আলো
আত্মিক সৌরভ নিয়ে শুদ্ধতাকে ছোঁয়
লাত-মানাত ভেঙ্গে পড়ে
ধসে পড়ে পৌত্তলিক বেড়া
রোমান সাম্রাজ্য কাঁপে, নুয়ে পড়ে পারস্যের খসরুর প্রাসাদ।
ভোরের নির্যাস নিয়ে গোলাপ বাগান
কালান্তরে পৌঁছে গেছে বিংশ শতাব্দীতে।

কী আশ্চর্য! ভাবতে ভাল লাগে;
আলো হাওয়া এখনো স্মরণে ঢেউ তোলে
বেলালের দৃশ্য ফোটে মিনারে; গম্বুজে।
হে প্রিয় রাসূল (সা)
তোমার নিবিড়-ঘন মমতার পাশে
হাবশী গোলাম হয়ে থাকতে মন চায়
সিরাজাম মুনীরার আলো-অন্ধকারে তোমার সৌরভ-পূত পরশপাথর
ছুঁয়ে আছি; ছুঁয়ে থাকতে চাই।

বহমান স্রোতে ভেসে নতুন বন্দরে যেন পৌঁছে যেতে পারি!

www.pathagar.com

অনন্ত আকাশের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র ॥ মনসুর আজিজ

অনন্ত আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছি
নক্ষত্রের আকাল ছিল না আকাশে
জ্যোতির্ময় এক নক্ষত্র ম্লান করে দিয়েছে আকাশের আলো
আমাকে করেছে আলোকিত।

পৃথিবীর চারপাশে বিস্তীর্ণ জলরাশির অভাব ছিল না কোনো
মিঠে পানির অভাবে কণ্ঠ গিয়েছে ফেটে
পিপাসায় পৃথিবীর মানুষেরা ছিল কাতর
তোমার মিষ্টি কথায় আমার সব তৃষ্ণা দূর হয়ে গেছে

এই পৃথিবীতে ফুলের অভাব ছিল না
বৃন্ত থেকে পাপড়ি খসে পড়ছিল প্রত্যহ
কিন্তু ফুলের মৌতাত ছিল না, ছিল না সুরভি
তোমার মৌতাতে আমি আজ সুরভীত অনন্ত নক্ষত্র বীথি।

ওহে করুণা নিধান ॥ নূরুল ইসলাম জেহাদী

ওহে কৃপাবান ওহে করুণা নিধান
ওহে মদিনা ভূমিতে শায়িত পরান।
বারেক ফিরিয়া চাও উম্মতের পানে
যাতনা যাদের লাগি সহিছ পরানে।
ওহোদে যাদের তরে লহু বহায়েছ
যাদেরে পরান ভরে ভাল বাসিয়াছ।
সেই ধর্ম সেই দ্বীন সেই মুসলমান
হইতেছে ধরা পৃষ্ঠে আজি অপমান।

www.pathagar.com

হেরার আলো চাই ॥ নজরুল ইসলাম

চারদিকে নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে
এক চিলতে আলোর জন্য আমি
উন্মুখ হয়ে থাকি
যে আলো আমার আত্মাকে
ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে,

বসন্তের চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশতম
ফোঁটা পড়ে পড়ে যৌবনের কলসি এখন পূর্ণপ্রায়
অথচ এখনও আমি পুরোপুরি মানুষ হতে পারিনি,
এখনও আমার ভেতর বাইরে
বিস্তর ব্যবধান।
পরশ পাথর–'উসওয়াতুন হাসানা'
সে-তো আমার হাতের নাগালেই
অথচ এখনও আমি
হাবশি গোলাম– বিলাল ইবনে রাবাহ্‌র
একটি লোমও ছুঁতে পারিনি,
যদিও আকণ্ঠ স্বাধীন আমি
সবুজ ভূমিতে–
আর এই স্বাধীনতা আমাকে
প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে রাখে অনুক্ষণ।

এই দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই
হেরার আলোয় দ্যুতিময় হৃদয় চাই ॥

www.pathagar.com

আরবী পত্রসাহিত্যের বিকাশধারা

ড. নজরুল ইসলাম খান

□

আধুনিক আরবী পত্রসাহিত্য একটি অনন্য সৃষ্টি। আরবী সাহিত্যের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার অনেকটা এর দ্বারা পরিপূর্ণ। পত্রসাহিত্য সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান শতক পর্যন্ত এর অনন্য ক্রমধারা অব্যাহত রেখেছে। যুগে যুগে মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তা চেতনা ও আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বহন করে আসছে। কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক থেকে শুরু করে নবী রাসূলগণের জীবনেও কম বেশী পত্রসাহিত্যের প্রভাব রয়েছে, যা এর সমধিক গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। পত্রসাহিত্যকে আরবী ভাষায় রাসায়িলুল আদব বলে। রাসায়িল শব্দটি যখন রিসালা শব্দের বহুবচন তখন এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়াবে পত্রাবলী বা যোগাযোগসমূহ। কিন্তু সাহিত্যাঙ্গনে রাসায়িল শব্দটি পত্রসাহিত্য নামে বহুল পরিচিত। আরবী গদ্য সাহিত্যিকদের মতে, কোন বিষয়বস্তুর উপর পরিপূর্ণ আলোচনা সম্বলিত লিখিত বস্তুকে রিসালা বা পত্রসাহিত্য বলে। অথবা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্যবহুল ভাবপূর্ণ আলোচনাকে পত্রসাহিত্য বলে। রিসালা বা পত্রসাহিত্যের প্রচলন কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে তা নির্ণয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আল কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, হযরত সোলায়মান (আ) সাবা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বিলকিসের নিকট পত্র লিখেছিলেন। আল্লাহর বাণী : "ইযহাব বিকিতাবী হাযা ফালকিহ ইলাইহিম"- তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। সূরা নমল : ২৮) এই আয়াতে এর ইঙ্গিত রয়েছে।

আর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আ) তৎকালীন মিশরের বাদশাহর নিকট পত্র লিখতেন। তেমনি ইউশা ইবনে নূন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট, হযরত সোলায়মান (আ) স্বীয় পিতা হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট, আসিফ ইবনে বরখিয়া, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া, হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট পত্র লিখেছিলেন। বলাবাহুল্য, গ্রীক সভ্যতায় এরিস্টটলও তার ছাত্র আলেকজান্ডারের সাথে পত্রবিনিময় করতেন। আলী ইবনে খালফ-এর মতে, রিসালার প্রচলন নবী রাসূলদের সময়কাল থেকে প্রথম শুরু হয়। যেমন মহানবী (সা) রোমের সম্রাট হিরাকলের কাছে পত্র লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামপূর্ব যুগের পত্রাবলী

ইসলামপূর্ব যুগে পত্রসাহিত্যের প্রচলন থাকলেও তা সংরক্ষণের খুব বেশী প্রচলন ছিল না। তবুও মানুষ যেহেতু সাধারণত আবেগপ্রবণ তাই না জানাকে জানার এবং না পাওয়াকে পাওয়ার দুর্নিবার স্পৃহা তাকে সদা জাগ্রত করে তোলে। এ কারণেই মানুষ কালের গর্ভে বিলীন হওয়া তথ্যকে বাস্তবে রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর আগে তৎকালীন ইয়ামানের সম্রাট তুব্বা একদনি পবিত্র মদীনায় উপস্থিত হলে বনূ কোরায়যা গোত্রের ইহুদী এক আলিম আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। এতে তিনি মহানবী (সা)-এর কাছে একটি সীল মোহরাংকিত লিখার মাধ্যমে ঈমান আনয়ন করেন। আর ঐই পত্রখানা সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম সম্প্রদায়ের কাছে হস্তান্তর করে রাসূল (সা)-এর কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জাহেলী যুগেও পত্রের প্রচলন ছিল। জাহেলী যুগে পত্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল :

* পত্রের শুরুতেই তারা 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখত।

* বা, তারা পত্র লেখার সময় 'আম্মা বাদ' দ্বারা শুরু করত।

* আবার তারা পত্রের শুরুতে 'বিন ফুলান ইলা ফুলান'– অমুকের থেকে অমুকের কাছে লিখতো।

* আবার কোন কোন সময় কবিতা রচনার মাধ্যমেও পত্র লেখা শুরু করত।

মহানবীর (সা) সময়কার পত্রাবলী

পত্রের প্রচলন নবী রাসূলদের যুগেও কম বেশী ছিল। রাসূল (সা) নিজেও পত্র যোগাযোগ রক্ষা করতেন। রাজা, বাদশা, সম্রাট, ধর্মযাজক থেকে শুরু করে গোত্র প্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে পত্র লিখতেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও সমস্যা সমাধানের জন্য পত্র লিখতেন। তেমনি যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দান ও পরিচালনার জন্যেও অনেক সময় সাহাবীদের নিকট পত্র লিখতেন। মহানবী (সা)-এর পত্রের ভাষা এতই প্রাঞ্জল ও সহজ ছিল যে, পত্রের পাঠক পত্রের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা খুঁজে পেত না। পত্র লেখার সময় তিনি সকল দিক লক্ষ্য করে লিখতেন, যাতে পাঠক তার পত্রের মূল বিষয়বস্তু ভাবসহ সকল উদ্দেশ্য সহজে বুঝতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতার দিকেও লক্ষ্য রাখতেন। তাইতো প্রভাবশালী রাজা-বাদশাহের অন্তরেও পত্রের মাধ্যমে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূল (সা)-এ সুদীর্ঘ নবুয়াতী জীবনে বহু পত্র রচনা করেছেন। কিন্তু তা সংরক্ষণের উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে সকল পত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিকদের দেয়া তথ্যানুযায়ী এই পত্রের সংখ্যা দুইশত বা ততোধিক হতে পারে।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদীন যুগের পত্রাবলী

খোলাফায় রাশেদীনের সময়কালে পত্রাবলী চার শ্রেণীতে রচনা করা হতো। সংবাদ সংক্রান্ত; শোক বার্তা; প্রাকৃতিক দৃশের বর্ণনা ও তিরস্কার বিষয়ক। খোলাফায় রাশেদীনের সময়কালে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পত্রসাহিত্যের সমধিক প্রসার লাভ করে। কেননা তাঁরা প্রয়োজনের তাকিদে একে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশার্থে পত্র লিখতেন এবং অন্যে তার আবার সমুচিত উত্তর প্রদান করতেন, যার মাধ্যমে এ পত্রসাহিত্যের বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা) সময়কালের পর হযরত উমর (রা)-এর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিয়োগ করে বিচার সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে পত্র লিখতেন। আবূ মূসা আল আশআরী (রা) এর উজ্জ্বল প্রমাণ, কেননা তার নিকট একখানা 'নির্দেশপত্র রচনা করে পাঠানো হয়েছিল।

উমাইয়া যুগের পত্রাবলী

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরপরই উমাইয়া যুগে পত্রসাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বলতে গেলে উমাইয়া যুগেই পত্রসাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের রূপ লাভ করে। হাজারও প্রতিকূলতার মাঝে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রকে বেশ প্রভাবিত করে, যার প্রমাণ 'দিওয়ানুর রাসাইল ও দিওয়ানুল খিতাম'। এই সময় পত্রসাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ যুগেও পত্রসাহিত্যের পাশাপাশি খিতাবা বা বাগ্মিতা-সাহিত্যের প্রচলন ছিল কিন্তু পত্রসাহিত্যেরই বেশী প্রসার ঘটে। এ সময়ের পত্রগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. রাজনৈতিক পত্রাবলী : যা প্রাদেশিক গভর্নর, খলিফা, সরকার ও বিরোধী পক্ষ হতে রচনা করা হতো। ২. সামাজিক পত্রাবলী : যা সাধারণত মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জীবনের বিভিন্ন প্রবাহের সংবাদ জানানোর জন্য রচনা করা হতো। ৩. ধর্মীয় পত্রাবলী : যা ধর্মীয় পণ্ডিতদের থেকে বিভিন্ন উপদেশসহ রচনা করা হতো। তেমনি কখনো বিবর্তনমূলক প্রশ্নের জবাবেও এসব পত্র রচনা করা হতো।

আব্বাসীয় যুগের পত্রাবলী

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আব্বাসীয় যুগই হল আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। অবশ্য এর বীজ বপন করা হয়েছিল উমাইয়া যুগেই; যার ফলশ্রুতিতে সে বীজ বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। সে যুগে আরবী সাহিত্যের উন্নতির সাথে সাথে পত্রসাহিত্যেরও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। তখন মুসলিম সাম্রাজ্যে আরবী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সর্বজনীন ব্যবহার উপযোগী ভাষার মর্যাদা লাভ করে। যার ফলে আরব অনারব এর উন্নতি সাধনে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করে।

পারস্যে দুইটি দল ছিল। ফারসী দল ও আরবী দল। তাই পারস্যের বিভিন্ন অফিস

www.pathagar.com

আদলতেও আরবী ভাষার ব্যবহার ছিল। আব্বাসীয় খলিফার যুগে যেসব দেশ শাসিত ছিল তার অধিকাংশ দেশেই আরবী ভাষা ছিল। তাইতো আবূ মনসূর হালেবী পারসিয়ান হওয়া সত্ত্বেও সকল বই-পুস্তক আরবী ভাষায় রচনা করেছিলেন। আর আবু বকর খাওয়ারিযমী তিনিও আরবী ভাষায় লিখতেন।

আধুনিক যুগের পত্রাবলী

আব্বাসীয় যুগের পরই আধুনিক যুগ হিসেবে পরিচিত। পত্রসাহিত্য আধুনিক যুগেও তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে নানা প্রকার শিথিলতা থেকে মুক্ত ছিল না। কেননা সাহিত্যে ঐতিহাসিকদের অনেকেই পত্রসাহিত্যের সাহিত্যকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। তাদের দৃষ্টি ছিল গদ্য সাহিত্যের দিকে। যেমন তারা প্রবন্ধ বক্তৃতা গল্প ও নাটক বেশী চর্চা করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই পত্রসাহিত্য নিয়ে তারা খুব বেশী চর্চা করতো না। কিন্তু এমন দিন বেশী যায়নি। কালের আবর্তে প্রয়োজনের তাকিদে প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক হাফিয ইবরাহিম, আহমাদ শাওকী, বদিউযযামান হামাদানী এবং অধুনাকালের নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক 'নাজিব মাহফুয'-এর মত স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের সিদ্ধ হস্তের লেখনীর ছোঁয়ায় পত্রসাহিত্য পুনর্জীবিত হয় এবং পুনরায় সাহিত্যাঙ্গনে তার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। তাই আজও বিশ্বের সাহিত্যাকাশে পত্রসাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অম্লান।

অতএব বলা যায়, ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পত্রসাহিত্যের অবদান রয়েছে। যা পত্রসাহিত্যের ক্রমবিকাশের গুরুত্বেরই সাক্ষ্য বহন করে। তাই আমরা এ আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি যে, কালের আবর্তে পত্রসাহিত্য তার স্থান আরও সুদৃঢ় করবে এবং সাহিত্যামোদীদের মনের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে। পত্রসাহিত্যের বিকাশধারা বন্ধ হবে না কোন দিন বরং এর গতি বেগবান হবে প্রতিদিন। ■

www.pathagar.com

রাসূল (সা) এর আমলে তৎকালীন আমীর ও বাদশাহদের নামে লেখা চিঠি

মুহাম্মদ আবেদুর রহমান

□

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা) তৎকালীন বিভিন্ন দেশের আমীর ও বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতী চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। সময়টি ছিল ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিক। সাহাবীরা (রা) বলেন, চিঠিতে সীল-মোহর দেয়া হলে বাদশাহ তা গ্রহণ করবেন। সেই জন্য রাসূল (সা) রূপার আংটি তৈরী করেন, এতে মুহাম্মাদ, রাসূল ও আল্লাহ এই তিনটি শব্দ খোদাই করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ এক লাইনে, রাসূল এক লাইনে ও আল্লাহ এক লাইনে।

চিঠি লেখানোর পর আল্লাহর রাসূল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবাদের কয়েকজনকে চিঠিসহ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে

[নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিল আসহাম ইবনে আল জাফর]

চিঠির বক্তব্য :

এই চিঠি নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তার উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, কেননা আমি আল্লাহর রাসূল (সা)।

কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করব না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়

www.pathagar.com

তবে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাকো আমি মুসলমান। যদি আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ না করেন তবে আপনার উপর আপনার কওমের নাছারাদের সমুদয় পাপ বর্তাবে।"

আমর ইবনে উমাইয়া জামরী রাসূল (সা)-এর চিঠি নাজ্জাশীর কাছে প্রদান করেন। নাজ্জাশী এই চিঠি চোখে লাগান এবং সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। এরপর তিনি হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা)-এর চিঠির জবাবে তিনি একটি চিঠি লেখেন যা নিম্নরূপ :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল (সা) মুহাম্মাদের নামে নাজ্জাশী আসহামের পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। অতঃপর, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে। এ চিঠিতে আপনি আমার নিকট যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাত ভাই এবং আপনার সাহাবাদের মেহমানদারী করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ পাকের সত্য ও খাঁটি রাসূল (সা)। আমি আপনার নিকট বাইয়াত করছি আপনার চাচাতো ভাইয়ের বাইয়াত করছি এবং তার হাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য ইসলাম কবুল করছি।"

রোমক সম্রাট কায়সারের নামে

সহীহ বুখারীতে একটি দীর্ঘ হাদীসে এ চিঠির বর্ণনা রয়েছে :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের মহান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে দুই রকম পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন যা আমাদের ও আপনাদের জন্য একই সমান। সেটি হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা-আনুগত্য করব না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কাউকে শরীক করবো না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করব না। যদি লোকেরা অমান্য করে তাবে তাদের বলে দিন যে, তোমরা সাক্ষী থাকো আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

রাসূল (সা) হযরত দেহিয়া ইবনে খলীফা কালবিকে দিয়ে এই চিঠিটি প্রেরণ করেন।

আম্মানের বাদশাহ যেফার উদ্দেশ্যে চিঠি

রাসূল (সা) আম্মানের বাদশাহ যেফার এবং তার ভাই আবদের নামে একখানা চিঠি লিখেন। তাদের পিতার নাম ছিল জলনদী।

www.pathagar.com

চিঠি নিম্নরূপ :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে জলনদীর দুই পুত্র যেফার ও আবদের নামে। সালাম সেই ব্যক্তির উপর যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন। অত:পর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূল (সা)। যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই আমি কাজ করছি। আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনার বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখণ্ড ঘোড়ার খুরের নিচে যাবে। আপনাদের বাদশাহীর উপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।"

এই চিঠি পৌছানোর জন্য হযরত আমর ইবনুল আসকে মনোনীত করা হয়।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি–

আল্লাহর রাসূল (সা) মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের পারভেজের নামে–

সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। যারা বেঁচে আছে তাদেরকে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফেরদের উপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিত থাকবেন। যদি এতে অস্বীকৃতি জানান তবে সকল অগ্নি-উপাসকের পাপও আপনার উপরই বর্তাবে।"

রাসূল (সা) এর সিদ্ধান্তে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা ছাহমি (রা) এই চিঠিটি সম্রাটের নিকট পৌছান।

মিশরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে

রাসূলে (সা) করিম মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরাইজ ইবনে সাতার নিকট একখানা চিঠি লিখেছিলেন। জোরাইজের উপাধি ছিল মুকাওকিস। চিঠিটি নিম্নরূপ–

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সা) মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুকাওকিস আযম কিবতের নামে। তাঁর প্রতি

www.pathagar.com

সালাম যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করবেন আল্লাহ পাক আপনাকে দুটি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে কিবতিয়া এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্য সমান। সেটি এই যে আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে না মানে। যদি কেউ এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে বলে দাও সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।"

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআকে দিয়ে রাসূল (সা) এই চিঠি পৌছান।

মুকাওকিস আল্লাহর রাসূল (সা)-এর চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কৌটায় রাখেন এবং মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষার কাতেবকে ডেকে রাসূল (সা) এর নিকট নিম্নোক্ত চিঠি লেখেন।

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহপাকের নামে শুরু করছি। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে মুকাওকিস আযিম কিবত এর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি সালাম। আপনার চিঠি পাঠ করেছি। আপনার চিঠির বক্তব্য এবং দাওয়াত আমি বুঝেছি। আমি জানি যে, এখনো একজন নবী আসার বাকি রয়েছে। আমি ধারণা করেছিলাম যে তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আপনার খেদমতে দুজন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবতিদের মধ্যে এদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্য কিছু পোশাকও পাঠাচ্ছি। আপনার সওয়ারীর জন্য একটি খচ্চরও হাদীয়াস্বরূপ পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম।

মুকাওকিস আর কোন কথা লেখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি। তার প্রেরিত দাসীদের নাম ছিল মারিয়া কিবতিয়া এবং শিরিন। খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল। এটি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। রাসূল (সা) মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মারিয়ার গর্ভে আল্লাহর রাসূলের (সা) পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। শিরিনকে আল্লাহর রাসূল কবি হাসসান ইবনে সাবিত আনসারীকে দান করেন।

মুনযের ইবনে ছাদির নামে— বাহরাইনের শাসনকর্তা

রাসূল (সা) একটি চিঠি লিখে আলা ইবনে হাযরামির মাধ্যমে বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনযের ইবনে ছাদির নিকট প্রেরণ করেন।

এই চিঠির জবাবে মুনযের আল্লাহর রাসূল (সা) কে লিখেছিলেন–

"হে আল্লাহর রাসূল আপনার চিঠি আমি বাহরাইনের অধিবাসীদের পড়ে শুনিয়েছি। কিছু লোক ইসলাম পছন্দ করেছেন ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে পছন্দ করেননি। এখানে ইহুদী এবং অগ্নি-উপাসকও

www.pathagar.com

রয়েছে। আপনি এদের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিন।

এর জবাবে রাসূল (সা) যে চিঠি লিখেছেন তা নিম্নরূপ :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল (সা) মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুনযের ইবনে ছাদির নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (সা)।

অতঃপর আমি আপনাকে আল্লাহ্ পাকের কথা স্মরণ করে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবেন তিনি নিজের জন্যই সেসব করবেন। যে ব্যক্তি আমার দূতদের আনুগত্য করবে, তাদের আদেশ মান্য করবে সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করেছে মনে করা হবে। যারা আমার দূতদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দূতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশ আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই মুসলমান যে অবস্থায় ঈমান আনে তাদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি দোষীদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনিও ওদের ক্ষমা করুন। আপনি যত দিন সঠিক পথ অনুসরণ করবেন ততদিন আপনাকে আমি বরখাস্ত করবো না।

যারা ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসের উপর রয়েছে এবং যারা অগ্নি-উপাসনা করছে তাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে।"

হাওজা ইবনে আলীর নামে

ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলীর নিকট রাসূল (সা) সালীত ইবনে আমর আমেরির মাধ্যমে নিম্নোক্ত চিঠিটি ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলীর নিকট প্রেরণ করেন :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওজা ইবনে আলীর নিকট চিঠি।

সেই ব্যক্তির উপর সালাম যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন, আপনার জানা থাকা উচিত যে, আমার দ্বীন উট ও ঘোড়ার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন। আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকে আপনার জন্য অক্ষুণ্ন রাখা হবে।"

দামেশকের শাসনকর্তা গাসসানির নামে

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারেছ ইবনে আবু শিমার গাসসানির নামে। সেই ব্যক্তির প্রতি সালাম, যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন, ঈমান আনেন এবং সত্যতা স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

আপনাকে আমি আল্লাহ্ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দওয়াত দিচ্ছি। যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোন শরীক নেই। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন। আপনাদের জন্য আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই চিঠি আছাদ ইবনে খোজায়মা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবী হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাবের হাতে প্রেরণ করা হয়। হারেছের হাতে এ চিঠি দেয়ার পর তিনি বলেন, আমার বাদশাহী আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে? শীঘ্রই আমি তার বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছি।

তার বদনসীব, সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ■

উৎস :

১. সহীহ্ আল বুখারী

২. রাসূলুল্লাহর (সা) রাজনৈতিক জীবন

৩. MUHAMMAD THE FINAL MESSENGER

৪. রাসূলুল্লাহর (সা) বিপ্লবী জীবন

৫. সীরাতে ইবনে হিশাম

৬. সীরাতে সরওয়ারে আলম

৭. আর-রাহিকুল মাখতুম

৮. আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা)

www.pathagar.com

আলোর সন্ধানে

নাসীমুল বারী

□

চারিদিকে ধুধু মাঠ।

বালি আর বালিতে ঠাসা এসব মাঠে ফসলের কোন চাষ নেই। কল্পনাও করা যায় না ফসল চাষের। দূরে ছোট-বড় পাহাড়। সূর্যের সোনালী আভা বালুতে পড়ে চিক চিক করছে। জনবসতি নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু'চারটা খেজুর গাছ দেখা যায়। আর দেখা যায় সারি বেঁধে চলা উটের দল।

এমনি মাঠে একদল বালক খেলছে। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি আর ছুটোছুটিতে তাদের মন উড়ে চলছে বলাকার মতো। হঠাৎ একটা বালক দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে–এই শোন্ সবে, একটা মজার খেলা খেলবি?

–কী খেলা?

সমস্বরে সবাই বলে।

–ঐ যে পাগলটা যাচ্ছে, চল ঐটাকে ক্ষেপাই।

–কোন্ পাগলটারে?

হঠাৎ একটি ছেলে প্রশ্ন করে।

–কেন! চিন্‌লি না, ওই পাগলটারে? এ যে কুরাইশ বংশের মুহাম্মাদ। একদম জাত-কুল সব ধূলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

–ঠিকই।

আবার সমস্বরে সবাই বলে।

বালক-সরদারটি আবার বলে, দেখনা পাগলটার কাণ্ড! ক'দিন হয়েছে জন্মেছে, আর এখনই চায় আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মটা বদলে দিতে। ও কি বলে জানিস? বলে, আমাদের পূজা-পার্বণ কোন কাজে লাগবে না– এসব ছেড়ে দিতে হবে।

–ঠিক ঠিক তাই। চল্ ক্ষেপাইগে।

সমস্বরে চিৎকার দিয়ে সবাই ক্ষেপাতে শুরু করে। কেউবা মুখ ভেংচিয়ে কটাক্ষ করে। কেউবা ঢিল-পাটকেল মারতে থাকে। বৃষ্টির মতো ঢিল-পাটকেল পড়তে থাকে। বালকদের এ কৌতূহলী পাগলটি কিন্তু একটুও ক্ষেপেনি। বরং তাদেরকে ঢিল না মারার

www.pathagar.com

জন্য বার বার আদরের সুরে বোঝাতে চেষ্টা করে।

বালকদের সাথে বড়রাও যোগ দেয়।

দেখতে দেখতে দলটি বড় হয়ে যায়। ঢিল-পাটকেলের প্রচণ্ড আঘাতে কুরাইশ মুহাম্মাদের শরীর বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর দোষ তিনি লোকদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিতে ডাকতেন। মূর্তিপূজা, মারামারি, হানাহানি, লুটতরাজ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি জাহেলী স্বভাব বাদ দিয়ে শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিতে বলতেন। আরও বলতেন মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে; আল্লাহর সত্য ও শাশ্বত সৌন্দর্যে সমাজকে সাজাতে।

মানুষের এতো আঘাত সত্ত্বেও তিনি বিচলিত নন। তাঁর মাঝে শুধু একই চিন্তা, এসব বালকেরা, এসব লোকেরা না বুঝে তাঁকে আঘাত করছে। এ আঘাতের জন্য আল্লাহ যেন ওদের কোন শাস্তি না দেয়; ক্ষমা করে দেয়।

রক্ত ঝরতে ঝরতে শরীর বেয়ে পা পর্যন্ত এসে হাজির। এমনি সময় আল্লাহর দূত ফেরেশতা এসে বলেন– আপনি আদেশ করুন, আমরা আপনাকে আঘাতকারী লোকদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেই।

কুরাইশ বংশের মুহাম্মাদ তো আর সাধারণ মানুষের মতো কোন মানুষ নন। তিনি যে মহান আল্লাহর একজন দূত। মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছেন ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে। এ ধর্মেই আছে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। শাশ্বত সৌন্দর্যের অনুপম বৈশিষ্ট্যের ধর্ম ইসলাম সাম্যের এক অদ্বিতীয় পথ।

তিনি তো পারেন না সামান্য আঘাতে ধৈর্যচ্যুত হতে। প্রতিশোধ গ্রহণে জনপদকে ধ্বংস করে দিতে।

তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে বললেন– হে আল্লাহ, ওদের ক্ষমা করুন। ওরা তো বোঝে না।

ওরা যেন পায় তোমার আলোর সন্ধান।

কাকডাকা ভোরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে পড়েন মসজিদের পানে যেতে। কিছুদূর এগোতেই তিনি অবাক!

একি!

সারাপথে যে কাঁটা বিছানো!

পথ চলাই যে যায় না! এদিক ওদিক তাকায়। না, সবদিকই বন্ধ। কী আর করা যায়। কোনমতে কাঁটাগুলো একটু সরিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেন। তবু কাঁটা ফুটে ছিদ্র হয়ে যায় পা দুটো! কাঁটাগুলো তাঁর রক্তে লাল হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায় জুলুমের নিরব সাক্ষী হয়ে।

–হি... হি... হি।

হাসির শব্দে চমকে ওঠেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওই তো খেজুর গাছের আড়ালে এক বুড়ি। তাঁর এ দুঃখ দেখে হাসছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম দুঃখে বুড়িটা পরম আনন্দে প্রাণ খুলে হাসছে।

www.pathagar.com

হাসছে আর হাসছেই সে।

বহু কষ্টে পেরিয়ে গেলেন কাঁটা বিছানো রাস্তাটা। এবার বুড়িটার দিকে এগিয়ে যান তাকে বোঝাতে আদর্শ নারী হয়ে সব অপকর্ম ছেড়ে দিতে। মা হিসেবে সন্তানের মত সকলকে ভালোবাসতে।

কিন্তু কই বুড়িটা?

সে যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এগিয়ে আসতে দেখেই দৌড়ে পালাচ্ছে। তবে কি সে ভয় পেল?

কিন্তু কেন?

সমাজের লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বললেও, কষ্ট দিলেও তিনি তো কাউকে কিছু বলেন না।

মারেন না।

এমনকি বকাও দেন না। বড় আদরের সুরে কোমল করে বোঝাতে চান তাদের ভুল।

প্রতিদিন ভোরেই রাস্তায় কাঁটা-ছড়ানো থাকে। ফলে কষ্ট করেই পার হতে হয় এ রাস্তা।

হঠাৎ একদিন দেখেন পথে কাঁটা নেই।

ব্যাপার কী?

চিন্তায় পড়েন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে বুড়ির। তাই আসতে পারেনি বলেই হয়ত রাস্তাটা আজ কাঁটামুক্ত।

খোঁজ নিতে যান তার বাড়িতে।

গিয়ে দেখেন ঠিক-ঠিকই বুড়ির বিপদ– সে অসুস্থ। অসুস্থ বুড়ি তাই বাড়িতেই ছিল। তাঁকে দেখে বুড়ি তো ভয়ে জড়সড়। এবার বাগে পেয়েছে। নিশ্চয় প্রতিশোধ নিবে এখন সে।

বুড়ির বাড়ি পৌঁছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই খোঁজ নেন কী হয়েছে বুড়ির।

অসুস্থতার খবর জেনে তিনি বুড়ির শুশ্রূষায় লেগে যান। তাঁর সেবা-যত্ন আর আন্তরিক ব্যবহারে বুড়ি সেরে ওঠে অসুস্থ অবস্থা থেকে।

চরম শত্রুকে কাছে পেয়েও পরম বন্ধুর মতো এমন সেবা-যত্ন করায় বুড়ি আশ্চর্য হয়। এতো মানুষ নয়, দেবতা!

বুড়ি জীবনের এতটা কালেও এমন ভালো মানুষ দেখেনি।

ভক্তি, শ্রদ্ধায় ছোট হয়ে যায় বুড়ি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলামের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয় বুড়ি।

এগিয়ে আসে শান্তির শান্তির মিছিলে। ■

www.pathagar.com

আরবী গদ্যে রাসূলে কারীম (সা)

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

□

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ভাষার মতো আরবী ভাষারও আদি যাত্রা শুরু হয় কবিতা দিয়ে। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে উন্নততর কাব্য চর্চার নিদর্শন আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সেই সময় থেকে উমাইয়া যুগ পর্যন্ত কাসীদা রীতিতে আরবী সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। আরবী গদ্য বলতে তখন যা বুঝানো হত তা খুবই সীমিত এবং লৌকিক কিছু বিষয়াদীতে ছিল সীমাবদ্ধ। যেমন বক্তৃতা, ভাষণ, প্রবাদ বাক্য, বংশ লতিকা, উপদেশমালা, চিঠিপত্র, যাদুমন্ত্র ছিল তখনকার গদ্যের নমুনা।

আব্বাসীয় আমল থেকে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির যে সুবর্ণ যুগ শুরু হয়, তার মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এবং বুদ্ধির চর্চায় আরবী ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর সাথে আরবী গদ্যের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মোচিত হয়। ইসলামের মূল ভাষ্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর জীবন ও বাণী সংগ্রহের যে বিপুল কর্মকাণ্ড সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিঃসন্দেহে আরবী গদ্য সাহিত্যের সম্ভাবনাকে দিয়েছিল নতুন মাত্রা। বলা যায়, আরবী গদ্য নবতর যুগে যাত্রা শুরু করে মাগাযী ও সীরাত বিষয়ক রচনাকে উপজীব্য করে। এ সময়টা যেমন ছিল আরবী গদ্যের বিকাশ যুগ, তেমনি সীরাত সাহিত্যেরও।

সীরাতের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে আরবী সীরাতকার ও লেখকরা এক অতুলনীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন। তাদের অসীম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে আজ হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন ও কর্ম আমরা জানতে পারছি। 'সীরাত' অর্থ জীবনী বুঝালেও ব্যাপক অর্থে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পবিত্র জীবনীকে সীরাত নামে চিহ্নিত করা হয়।

আরবী গদ্যে সীরাত রচনার অনেকগুলো প্রাথমিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এগুলোকে 'মাগাযী' তথা মহানবীর যুদ্ধ অভিযানসমূহের বিবরণ বলা হতো। নবী জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগের উপর প্রথম সার্থক রচনা উপস্থাপন করেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ৭৬৮ খৃ.)। মদীনায় জন্মগ্রহণকারী এই প্রখ্যাত তাবেয়ী বিরচিত অমর সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতু রাসূলাল্লাহ' ছিল আরবী সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার প্রথম পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের উপর ইবনে ইসহাকের পরেও অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে উন্নত এ সকল গ্রন্থের উপযোগিতা ইবনে ইসহাকের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে খাটো করতে পারেনি। আব্বাসীয় খলীফার দরবারে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। ইবনে আদী বলেছেন, যদি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের জন্য অন্য কোন ব্যাপারে মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নাও হতো, তবে কেবলমাত্র তিনি বাদশাহদেরকে অর্থহীন ও বাজে গ্রন্থ ঘাটা থেকে বিরত করে রাসূলুল্লাহ'র যুদ্ধ পদ্ধতির এবং নবুওয়াত ও তাঁর জীবনের অন্যান্য সময়কার ঘটনাবলী আলোচনার দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরাতে সক্ষম হয়েছিলেন— এই মর্যাদাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। কেননা তিনিই এই বিষয়ের উপর প্রথম আলোকপাত করেন।

ইবনে ইসহাকের রচিত সীরাত গ্রন্থের অনুবাদ বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এটি ৩ খণ্ডে প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ইবনে ইসহাকের পর খ্যাতি ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ সীরাতকার হচ্ছেন আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃ. ৮৩৪ খৃ.)। কিন্তু তিনি কোন নতুন গ্রন্থ লেখেননি। ইবনে ইসহাকের কৃত সীরাতের সংক্ষিপ্তকরণ, পরিমার্জন করে একটি গ্রহণযোগ্য সীরাত গ্রন্থ তিনি খাড়া করেন— যা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

ইবনে হিশাম বসরায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটে মিসরের ফুস্তাত নগরীতে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তিত্ব ইবনে ইসহাকের অমূল্যকীর্তি যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করে খ্যাতির অধিকারী হন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর 'আস সীরাত আন্ নববীয়াহ' সীরাতে রাসূলের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সীরাতে ইবনে হিশামের জনপ্রিয়তা হেতু এই গ্রন্থের বেশ কিছু সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়েছে। নতুন ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন ও সমালোচনা পরিবেশিত হয়েছে কোন কোন গ্রন্থে।

বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে গ্রন্থটি কাব্যাকারেও প্রকাশিত হয়। কাব্যরূপ প্রদানকারী এরকম কয়েকজনের নাম হলো আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল দুমায়রী আদ দাইরিনী (মৃ. ৬০৭ হি.) ফাতাহ ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মাদ আল মাগরিবী (৭৯৩ হি.), আবু ইসহাক আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম। সর্বশেষ কাব্যে রচিত সীরাতে ইবনে হিশামের নাম 'ফাতহুল গরীব ফী সীরাতিল হাবীব' যাতে রয়েছে দশ হাজার কবিতার পংক্তি। এছাড়া মূল গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে বিশ্বের বহু ভাষায়।

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ আজ্ হুহরী (মৃ. ২৩০ হি./৮৫৫ খৃ.) বিরচিত 'তাবাকাত আল কুবরা' তাঁর এক অসামান্য সৃষ্টি। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫ খণ্ডে, মতান্তরে ১২ খণ্ডে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে মহানবী (সা), সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তীদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ড সীরাতে রাসূল (সা)

www.pathagar.com

নিয়ে আলোচনা করা হলেও পরবর্তী খণ্ডগুলোতেও প্রাসঙ্গিকভাবে নবী (সা)-এর প্রসঙ্গ এসেছে। ইবনে সা'দের এই বিশাল কর্ম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এক জার্মান সম্রাটের আর্থিক সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং অধ্যাপক Sachar এর সম্পাদনায় লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন আমর আল ওয়াকেদী (১৩০ হি./৭৪৭ খৃ. - ২০৭ হি./৮২২ খৃ.) একজন নেতৃস্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সীরাত লেখক। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। আল ওয়াকেদীর লিখিত 'কিতাবুল মাগাযী' এবং নবী করীম (সা)-এর ওফাত পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত মুরতাদদের সাথে সাহাবায়ে কিরামের জিহাদের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ 'কিতাবুর রোদ্দাত' প্রসিদ্ধ। আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল বালজুরী (মৃ. ২৭৯ হি. /৮৯২ খৃ.) রচিত 'আনসাবুল আশরাফ' ইতিহাস গ্রন্থেও সীরাতে রাসূলের (সা) আলোচনা স্থান পেয়েছে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন। সমসাময়িক পরবর্তী শ্রেষ্ঠতম সীরাতকার নিঃসন্দেহে আত্ তাবারী। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন, যার বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে সীরাতে রাসূলের (সা) নির্ভরযোগ্য বিবরণ। এতে পরিবেশিত হয়েছে নবী জীবনের অসংখ্য ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক জীবনের টুকরো ঘটনা।

মুহম্মাদ ইবনে জরীর তাবারী (২২৪ হি./৮৩৮ খৃ.- ৩১০ হি./ ৯২৩ খৃ.) পারস্যের তাবারীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখ আল রুসূল ওয়া আল মুলূক' একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। এতে সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের নবী-রাসূল, জনগোষ্ঠী, সমাজ ও শাসক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর সীরাহ থেকে ৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতের ইতিহাস এতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মহানবী (সা) থেকে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত ইতিহাস তিনি বর্ষভিত্তিক করে তুলে ধরেছেন। সনদের যাচাই-বাছাই এবং বলিষ্ঠতার কারণে তাঁর রচনা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

আল তাবারীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে মহানবী (সা)-এর সামগ্রিক জীবন সংক্ষিপ্তভাবে মুবতাদা, মাব'আস ও মাগাযী এই তিন পর্বে বিভক্ত করা যায়। মহানবীর (সা) জন্ম, বংশ পরিচয়, সমকালীন অবস্থা, বাল্যকাল এবং প্রতিশ্রুত নবী হওয়ার বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে মুবতাদা অংশে। কিশোরবেলায় মুহাম্মাদ (সা) এর চরিত্রে যে অসামান্য গুণাবলী প্রতিফলিত হয়েছিল তা তিনি নিখুঁতভাবে অংকন করেছেন দক্ষ শিল্পীর মত। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর আপোষহীন সংগ্রাম, নবুয়ত লাভ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তীব্র বাধা বিপত্তি, স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতা ইসলামের অগ্রযাত্রা সর্বোপরি হিজরতের বর্ণনাকে মাব'আস পর্বে ফেলা যায়। হিজরত থেকে মাদানী জীবন, সশস্ত্র যুদ্ধ, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি আলোচনাকে মাগাযী পর্বে চিহ্নিত করা যায়। শেষ পর্বে অন্যান্য আলোচনার সাথে আরো স্থান পেয়েছে মহানবীর (সা) সাধারণ ও পারিবারিক জীবন।

ইতিহাস রচনার ধারায় আরো যারা সীরাতে রাসূল (সা)-কে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মাদায়েনী (জ. ১৩৫ হি./৭৫৮ খৃ., মৃ. ২১৫ হি./৮২৯ খৃ.) অন্যতম। তিনি প্রায় ২৪০টি গ্রন্থ রচনা করেন। আল মাদায়েনী মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত হতে শুরু করে আব্বাসীয় খলীফা মুতাসীমের (৮৩৩-৮৪২ খৃ.) রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন। নবী জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তন্মধ্যে- সিফাত আন্ নবী, আল মাগাযী, আখবার আল মুনাফিকীন, আজওয়াজ আন নবী, খাতাম আর্ রাসূল অন্যতম।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ.) বুখারী শরীফ ছাড়াও তারিখ আল ছগীর, তারিখ আল কবীর ও তারিখ আল আসাত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি মুহাদ্দিস সুলভ পন্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সীরাহ এবং মাগাযী আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনা নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত।

পারস্যের অধিবাসী আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা (মৃ. ২৭০ হি./৮৭৩ খৃ.) প্রায় ৬২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'কিতাব আল মাআরিফ' এবং 'আদাব আল কাতেবী' মূল্যবান গ্রন্থ। বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারণা তিনি পেশ করেন। তাঁর রচনার ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবে এসেছে সীরাতে রাসূলের (সা) বর্ণনা। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। সৃষ্টির প্রারম্ভ এবং নবীগণ সম্পর্কে তার পরিবেশিত তথ্য মূল উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি প্রাচীন যুগের আলোচনায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

আল দিনওয়ারী (মৃ. ২৮২ হি./৮৯১ খৃ.), আল ইয়াকুবীর (মৃ. ২৮৪ হি./৮৯৮ খৃ.) রচিত বিশ্ব ইতিহাসে সীরাত আলোচনা স্থান পেয়েছে। নবম ও দশম শতকের মধ্যবর্তী সময়ের প্রতিভাবান লেখক ইবনে আবদ রাব্বিহী (৮৬০-৯৪০ খৃ.) রচিত 'আল ইকদুল ফরীদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর উপর দীর্ঘ অধ্যায় ব্যয় করা হয়েছে। পঁচিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এ বিরাট গ্রন্থে নবী (সা) এর কর্মবহুল জীবন বৃত্তান্ত ছাড়াও ইসলামের ইতিহাস ও কবিতার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা রয়েছে। এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ই হীরক খণ্ডের মতো মূল্যবান। আরবদের হেরোডোটাস খ্যাত আল মাসুদী (মৃ. ৯৫৬ খৃ.) তাঁর 'মুরুজ, আদ্ দাহাব' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে সীরাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী রচনাকারদের মধ্যে আরো রয়েছেন আল উতবী (১০৩৬ খৃ.), আল খতিব (১০৭১ খৃ.) উমাদ উদ্দীন ইস্পাহানী (মৃ. ১২০১ খৃ.), ইবনুল কিফতী (১২৪৮ খৃ.) আল আতহীর (১২৩৪ খৃ.) ইবনে আবী উসাইবিয়া (১২৭০) খৃ.), ইমাম গাযালী (১১১১ খৃ.), ইবনে খাল্লিকান (১২৮২ খৃ.), সম্রাট আবুল ফিদা (১৩৩১ খৃ.) প্রমুখ।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনে হাযম আল যাহিরী (মৃ. ৪৫৬ হি. ১০৬৩ খৃ.) রচিত 'জাওয়ামী আল সীরাহ', ইবনে আবদুল বার আল কুরতুবীর (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭০ খৃ.) 'আল-দুরার ফী ইখতিসার আল মাগাযী ওয়াস সীরাহ', আবদুর রহমান সুহাইলীর (৫৮১ হি/ ১১৮৫ খৃ. 'আল রওদুল আনফ,' আবদুর রহমান ইবনুল জওযীর (৫০৭ হি./১১১৩ খৃ.) 'শরফুল মুস্তাফা', ইবনুল আছীর (৬৩২ হি./১২৩৪ খৃ.) রচিত 'আল কামীল ফিত্ তারিখ,' হাফিজ আবু রাবী সুলায়মান ইবনে মুসা আল কালাঈ (৬৩৪ হি./১২৩৬ খৃ.)-এর 'ইকতিফা ফি মাগাযিল মুস্তাফা ওয়াল খুলাফা ছালাছাহ,' শেখ জহীরুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ গাজরুনীর (৬৯৪ হি. / ১২৯৪ খৃ.) 'সীরাতে গাজরুনী,' হাফিজ আবদুল মুমিন দিমায়াতীর (৭০৫ হি./১৩০৫ খৃ.), 'আল মুখতাসার ফি সীরাতি সাইয়্যিদিল বাশার', আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মদ খালাতী হানাফী (৭০৮ হি./১৩০৮ খৃ.) রচিত 'আল সীরাহ্ আল খালাতিয়াহ' সময়ের উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থ ও সীরাত আলোচনার অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন।

আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর (১২৫৮ খৃ.) অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলে সকল সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আশংকাজনকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর পরবর্তী কয়েকশত বছর মূলত আরবী ভাষা ও সাহিত্য বন্ধত্ব কাল অতিবাহিত করেছে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত স্পেনে মুসলমানদের (১৪৯২ সালে পতন হয়) আধিপত্য বজায় ছিল। সীরাত রচনায় স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু সাইয়িদিন্নাস (মৃ. ৭৩৪ হি./১৩৩৩ খৃ.) রচিত 'উয়ুনুল আছার ফী ফুনুনিল মাগাযী ওয়া আল শামাইল ওয়াস্ সীয়ার' একটি নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ। সমকালে হাফিজ যাহাবী (৭৪৮ হি./১৩৪৭ খৃ.) লিখিত 'আস্ সীরাত আন্ নববীয়াহ' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শামসুদ্দীন ইবনুল কায়্যিম আল জওযীয়াহ (৭৫১ হি./১৩৫০ খৃ.) রচিত 'যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ' মুসলিম বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তী কালে রচিত সীরাত গ্রন্থের অন্যতম উৎস হিসাবে এই বিরাট গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৮০ খৃ. ভারতে, ১৯০৬ সালে মিশরে যাদুল মাআদ প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালে কুয়েত থেকে পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়।

সমাজ বিজ্ঞানের গৌরবময় প্রতিষ্ঠাতা ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ:) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়াতুল মুবতাদ ওয়াল খাবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার' গ্রন্থে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব সমাজকে দেখেছেন। সাত খণ্ডে বিভক্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি তিনটি বড় ভলিয়মে প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডে রাসূলে কারীম (সা)-এর জীবনাদর্শ ও চারিত্রিক মাধুর্য ইবনে খালদুনের কলমে এমনই সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠে এসেছে যে, বিশ্ব এতে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না।

ইমামুদ্দীন আবদুল ফিদা ইবনে কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি./১৩৭২ খৃ.) বিরচিত আট খণ্ডের

www.pathagar.com

'আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অংশ সীরাতে রাসূলের জন্য নির্ধারিত। গ্রন্থটি ১৯৩২ খৃ. মিসর থেকে এবং ১৯৮২ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত।

আহমদ ইবনুল মুহাম্মদ আল কুলোনী (মৃ. ৯২৩ হি. /১৫১৭ খৃ.) রচিত 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদীয়া' একটি প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী আল যারকানী (১১২২ হি./১৭১০ খৃ.) এই গ্রন্থের আট খণ্ডে বিভক্ত একটি গবেষণামূলক ব্যাখ্যা রচনা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ আল দিমাশকী (মৃ. ৯৪৩ হি./১৫৩৬ খৃ.) রচনা করেন 'সুবুলূল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খায়রিল ইবাদ' নামক সীরাত।

'আল সীরাহ আল হালাভীয়াহ' নামক ৩ খণ্ডে বিভক্ত প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন আল হালাভী আল শাফিঈ (মৃ. ১০৪৪ হি./১৬৩৪ খৃ.)। জালালুদ্দীন সিউতী (১৪৪৫-১৫০৫ খৃ.) রচিত 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে ভিন্ন আঙ্গিকে মহানবীর (সা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশিত হয়েছে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে সীরাতে রাসূল (সা)

আরবী সাহিত্যের যুগ পর্বে ১২৫৮ খৃ. আব্বাসীয় বংশের পতনের পর হতে যে স্থবিরতা শুরু হয় তা প্রলম্বিত হয় ১৮৫০ খৃ. পর্যন্ত। এই সময়কে রেনেসাঁ যুগপর্ব বলা হয়। এই সময়কালে রচিত সীরাত সমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু রচনার নাম উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

আরবী সাহিত্যে 'নাহদা' তথা রেনেসাঁ যুগ শুরু হয় ১৭৯৮ খৃ. ফরাসী বিপ্লবী নেতা নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণ পরবর্তী সময় হতে। তাঁর মিসর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমণের ফলে সমগ্র আরব জগতে এক নব চেতনা সঞ্চার হয়। নেপোলিয়ন তাঁর সাথে নিয়ে এলেন ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সওগাত। স্থাপন করলেন বহু বিদ্যালয়, নাট্যশালা, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কলেজ। প্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলো আরব জাহানে। এরপর ১৮১৩ সালে মুহাম্মদ আলী পাশা যখন সিংহাসনে বসলেন তিনি মিসরবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা নিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আরবী অনুবাদ শুরু হলো। আধুনিক ধারায় নাটক, নভেল, উপন্যাস, গল্প এ সময় রচিত হতে শুরু করে। প্রকাশিত হতে থাকে বহু সাময়িক পত্র। প্রবন্ধ, গদ্য ইতিহাস ও গবেষণায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়। মিসর, সিরিয়া, ইরাক লেবাননের কবি-সাহিত্যিক ঐতিহাসিকরা এতে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মূলত এই অঞ্চলেই আরবী সাহিত্যের মূলধারা লালিত ও বিকশিত হয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরবী সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। বহু সাহিত্যিক সেই সময় হতে আজ পর্যন্ত আধুনিক আরবী সাহিত্যের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁরা আরবী সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের সভায় সম্মানীয় আসন দান করেছেন।

www.pathagar.com

আরবী সাহিত্যে অনেক দিক ও বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে নতুনভাবে।

আধুনিক আরবী গদ্যের বিভিন্ন ফর্মে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সশ্রদ্ধ উপস্থিতি বিচিত্র বিভঙ্গে এসেছে। প্রখ্যাত এবং অমর আরবী লেখকরা নবী করীম (সা)-কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের লেখায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সিরিয়ার বুতরুস বোস্তানী (১৮১৯-১৮৮৩ খৃ.), সিরিয়ার কুসতাকী আল হামসী (১৮৫৪-১৯৪১), মিসরের তাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩), তাওফীক আল হাকীম (জন্ম ১৯০২), আবুল ফজল ইবরাহীম, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, আবু সয়ীদ রশীদ রীদা, মহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, মুস্তাফা যায়েদ, আবদুল হামিদ নাজ্জার, ফরীদ ওয়াজাদী, আলী আবদুল জলীল, আহমদ জাকী, হোসাইন হাইকল প্রমুখ।

নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজ বলেছিলেন, এই সম্মান তাকে না দিয়ে যদি তাহা হোসাইন, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, অথবা তাওফীক আল হাকীমকে দেয়া হতো তাহলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হতো। স্মর্তব্য, নাজীব মাহফুজের চোখে শ্রদ্ধেয় এই তিন আরবী সাহিত্যিকই তাঁদের রচনায় মহানবী (সা)-কে উপস্থাপিত করেছেন অসীম উচ্চতায়।

অসামান্য প্রতিভাধর মিসরীয় সাহিত্যিক ড. তাহা হোসাইন (মৃ. ১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক হিসাবেও তাঁর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। জন্মান্ধ হয়েও তাহা হোসাইন আরবী সাহিত্যে ডবল ডক্টরেট লাভ করেন, দুইবার মিসরের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আরবী সাহিত্যের অনেকগুলো শাখায় তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। গবেষণা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে তিনি অনন্য। তাঁর রচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থিতি বর্তমান। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা দুই শতাধিক।

তাহা হোসাইন রচিত 'ফি আদাবাল জাহিলী' একটি অনবদ্য গবেষণা গ্রন্থ। জাহেলী যুগের সাহিত্য সম্পর্কে রচিত এই গ্রন্থ লিখে তিনি প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হন। তাঁকে ধর্ম-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে আল আজহারের দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি যে ধর্ম বিরোধী নন, আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর যে তার পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে তাহা হোসাইন রচনা করেন আরেক অসামান্য গ্রন্থ 'আলা হামী আল সীরাহ'। এতে তিনি রাসূল (সা) এর সংগ্রামবহুল জীবনের অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং নবী যে সকল সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী থেকে যোজন দূরে ছিলেন তা তিনি দেখিয়েছেন। আবদুস সাত্তার লিখেন : 'রাসূলে কারিম (সা) যে কত উন্নতমনা ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এ তথ্যও আছে এই গ্রন্থে। তদুপরি আছে জাহিলী আমলের কবি ও কবিতার প্রতি রাসূলে কারিম (সা)-এর উদার মনের সম্যক পরিচয়। রাসূলে কারিম (সা)-এর যে কবিতার প্রতি অনুরক্ততা ছিল 'আইয়ামে

www.pathagar.com

জাহেলিয়া যুগের এবং সাবআ মু'আল্লাকা খ্যাত দুজন কবি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যই সপ্রমাণ করে।'

'আল ওয়াদা আল হক' (সত্যের প্রতিশ্রুতি) একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। যার পটভূমি ও বিষয়বস্তু হিসাবে তাহা হোসাইন গ্রহণ করেছেন রাসূলে কারিম (সা)-এর সংগ্রাম বহুল জীবন কাহিনী। রাসূল (সা) যে সত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এবং নিজের জীবনে সেই প্রতিশ্রুতি নিখুঁতভাবে পালন করে বিশ্ববাসীকে এক অমূল্য সম্পদ ও শান্তি ধর্ম উপহার দিয়েছেন তা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

এই উপন্যাসটির চলচ্চিত্র রূপ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তার নাম দেয়া হয়েছে 'জুহুরুল ইসলাম' তথা ইসলামের প্রকাশ। এই ছবিটি প্রেক্ষাপটে প্রদর্শনের সময় অতি কৌশলে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিকৃতি প্রদর্শন বর্জন করা হয়েছে। তৎকালীন আরবের সামাজিক চিত্র এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত বিষয়বস্তুর সাথে সাজুয্য রেখে এমনই আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে যে, দর্শকদের তা আপ্লুত করে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত মিসরের আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (জ. ১৮৮৯) সীরাত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'আল ইনসানু ফিল কুরআনুল কারীম' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কুরআনের আলোকে মানুষের মর্যাদাকে। মানবীয় গুণাবলী না থাকলে মানুষ যে তার সত্তায় আর থাকে না এই বিষয়েও তিনি আলেখ্য উপস্থাপিত করেছেন। পৃথিবীর সকল ধর্ম অনুসারীদের কাছে কুরআন অনুসরণীয় ও শিক্ষণীয়– এ বিষয়টি তিনি যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তিনি মহানবী (সা), গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

'আল ফালাসিফাতুল কুরআনিয়া' গ্রন্থে তিনি মুসলিম দর্শনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের 'আবকারিয়াতু মুহাম্মাদ' আরবী সীরাত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। ১৫৯ পৃষ্ঠায় নাতিদীর্ঘ এই বইয়ে তিনি নবী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। এতে তিনি মহানবীকে (সা) শুধু একজন শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্যও বিশ্লেষণ করেছেন। সমালোচকদের মতে, রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধবাদীদের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য এই একটি গ্রন্থই যথেষ্ট। ড. তাহা হোসাইনের 'মাআররাতুল ইসলাম' এবং ড. আহমদ আমীনের 'জহুরুল ইসলাম' গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে আল আক্কাদের উক্ত গ্রন্থ প্রেরণা যুগিয়েছে।

আরবী নাটকের প্রবাদ-পুরুষ তাওফীক আল হাকীম (জ. ১৯০২) রচিত একটি শ্রেষ্ঠ নাটক 'মুহাম্মাদ' যা সারা মুসলিম দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছে। স্পর্শকাতর বিষয়বস্তুর উপর এই নাট্য ব্যক্তিত্ব অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

www.pathagar.com

'মুহাম্মাদ' নাটকটি রাসূল (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য। এই বিষয়বস্তুর উপর সম্ভবত এটি প্রথম ও দুঃসাহসিক কাজ, কিন্তু এটি মঞ্চস্থ করা হয়নি। এর চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে মহা হুলস্থুল হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় প্রধানত নাটকে মহানবীর (সা) ভূমিকা কিভাবে রূপ দেয়া হবে সেই বিতর্ককে কেন্দ্র করে। রাসূলুল্লাহর (সা) সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ভূমিকায় রূপ দেয়ার মত চরিত্র মুসলিম বিশ্বের কাছে রীতিমত আপত্তিকর বিষয় এবং অত্যন্ত গর্হিত কর্মের মধ্যে বিবেচিত। তাই উক্ত প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়নি।

মুসলিম সমাজের আপত্তি খণ্ডন করে বলা হয়, যীশুখৃষ্টের নাটক উপস্থাপন যদি খৃষ্টান জগতে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে তাহলে 'মুহাম্মদ' নাটকও অনুরূপ শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটাতে পারবে। তাওফীক আল হাকীম আরো বলেন, নাটক লিখলেই যে তা মঞ্চস্থ করতে হবে এমন কথা নেই। সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেকের কথাই যেন আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হচ্ছে এই আবেগ-অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করাই 'মুহাম্মদ' নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য।

এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আরো রয়েছেন খাদিজা (রা), জিবরাইল (আ), আজরাইল (আ), আবু বকর (রা), আলী (রা), উমার (রা), ফাতিমা (রা), আয়েশা প্রভৃতি চরিত্র যা এক একটি অনন্য সৃষ্টি। সমালোচকের ভাষায় : 'তাওফীক আল হাকিমের বিশিষ্ট বাকভঙ্গী সর্বত্র সংলাপের মাধুর্যে উজ্জীবিত করেছে। লেখকের তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং চেতনার স্পর্শে নাটকটি উদ্দীপ্ত। ফলে এর গতিবেগ আমাদেরকে শুধু কর্মাত্মক জীবনে নয়, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যের পথে চালিত করে। এখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। 'মুহাম্মদ' নাটকের আগাগোড়াই পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। রাসূল করীম (সা)-এর সংলাপে নির্ভরযোগ্য হাদীস সংগ্রহ সত্যি দুরূহ ব্যাপার এবং এই কাজটি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই তাওফীক আল হাকিম সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআনের আয়াত সংযোগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সংলাপগুলো নাতিদীর্ঘ এবং ভাষা সহজ, সরল এবং সাবলীল।'

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (১৮৮৮-১৯৫৬) বিংশ শতাব্দীর আরবী সাহিত্য ও সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৩২ সালে প্রাচ্যবিদ Emile Dermenghem লিখিত 'La Vie de Mahomet' শীর্ষক নবী-জীবনী গ্রন্থের আলোকে 'হায়াতু মুহাম্মদ' নামক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন, যা তাঁর সম্পাদিত 'আস্ সিয়াসাহ আল উসবূয়িয়াহ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। লেখাগুলো বেশ জনপ্রিয় ও সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৫ সালে এটি কায়রো থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আরো পরিশিষ্ট যোগ করে পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে দশ হাজার কপি করে আরো ছয়টি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। ১৯৬৮ সালে এর পঞ্চদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এ ঘটনাগুলোর

www.pathagar.com

মাধ্যমে 'হায়াতু মুহাম্মদ' গ্রন্থের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, আরবী সীরাত সাহিত্যে এটি একটি বিরল ঘটনা হিসাবেও স্মরণীয়। ইতোমধ্যে গ্রন্থটি সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, সুদান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক পরিচিতি ও সমাদর লাভ করেছে। ইংরেজী, তুর্কী, উর্দু, চীনা প্রভৃতি ভাষায় হয়েছে অনূদিত।

ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার 'হায়াতু মুহাম্মদ' গ্রন্থের একত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা, অযাচিতভাবে নবী চরিত্রের উপর কালিমা লেপন এবং সীরাতে রাসূলের উপর আবেগমূলক রচনার আতিশয্য দূর করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সীরাত লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজে হাত দেন। তিনি এ গ্রন্থ রচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

'হায়াতু মুহাম্মদ' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন আল আজহারের শায়খ মুহাম্মদ মুস্তাফা আল মারাঘী (১৮৮১-১৯৪৫)। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ড. হায়কল আল ইসলাম, খৃস্টধর্ম, একত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, মুসলমান ও খৃস্টানদের বিরোধ, মুসলমানদের বিধান প্রণয়নে অচলাবস্থা আর যুবকদের উপর এর প্রভাব, পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সাহিত্য, গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য, আল কুরআন বিকৃতির মিথ্যে অভিযোগ এবং আল কুরআন সঙ্কলন ও লিখন সমস্যা, উসমানী মাসহাফের যথার্থতা, রাসূল (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাকে মৃগী রোগের অভিযোগ, হাদীস সংকলনের কথা, কুরআন শ্রেষ্ঠতম মুজিযা হওয়ার কথা নিয়ে চমৎকার আলোচনা পরিবেশন করেছেন।

মিরাজ এবং মুজিযার মত কিছু ব্যাপারে ড. হায়কলের সিদ্ধান্ত বিতর্কের জন্ম দিলেও তার রচনা যে উচ্চাঙ্গের এবং হৃদয়গ্রাহী তাতে সন্দেহ নেই। রাসূল (সা)-এর জীবনীকে আদর্শ ও উন্নত মানবীয় প্রতিচ্ছবি হিসাবে তিনি প্রমাণিত করেছেন। ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী লিখেন : 'হায়াতু মুহাম্মদ' রচনার মাধ্যমে তিনি বিপথগামী যুব সমাজকে সত্য ও সঠিক পথের দিশাদানের আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছেন। ড. হায়কল একজন জীবনীকার মাত্র নন; বরং এর Scientific method-এর সাহায্যে হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে Historical critical study উপস্থাপন করে বুদ্ধিবৃত্তিক এক নতুন মত প্রতিষ্ঠার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।'

আবদুর রহমান আযযাম সমকালীন ইসলামী বিশ্ব ও আরব জাহানে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মিসরের সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহাসিক আযযাম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী আধুনিক বিশ্বে মহানবী (সা) তথা ইসলামের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ইসলামের আন্তর্জাতিকতা, একতা, সাম্য ও ভ্রাতত্বের অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন তা গত শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি আরব লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন (১৯৪৫-১৯৫২)। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তার জীবনের যে মিশন ও চিন্তাধারা তা তাঁর লিখিত এক অসামান্য গ্রন্থ 'আর রিসালা আল খালিদায়'

www.pathagar.com

(মহানবীর শাশ্বত পয়গাম) পরিকীর্ণ রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এটি এক মাইলস্টোন। নিউইয়র্ক টাইম আযযামকে 'One of the great statesmen of contemporary Islam' বলে অভিহিত করেছিলেন। বহু ভাষায় অনূদিত প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থের ব্যাপারেও একই কথা খাটে।

'আর রিসালা আল খালিদা' পুরোপুরি গবেষণা ও চিন্তামূলক আন্তর্জাতিক মানের রচনা। এতে আলোচিত বিষয়গুলো হল : মহানবীর (সা) জীবন বৃত্তান্ত, মহানবীর বাণীর মৌলিক নীতি, সমাজ সংস্কার, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি, মুসলিম আন্ত র্জাতিক আইন ও সম্পর্ক, ইসলামের বাণীর বিস্তার, বিশ্ব অশান্তির কারণ ইত্যাদি। ইসলামের ভূত-ভবিষ্যত ও সভ্যতা রক্ষায় তার ভূমিকা এতে আলোচিত হয়েছে।

সীরাতে রাসূল (সা), কুরআন ও ইসলামের ব্যাখ্যায় আরো যারা স্মরণীয় রচনা লিখেছেন তাদের মধ্যে আছেন, হামিদ আবদুল কাদির : 'আল ইসলাম জহুরাহ ওয়াল তাশরাহ ফিল আলম', মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আস সাহান : 'আরকানুদ দাওয়াতুল ইসলাম', মুহাম্মদ আল গাযালীর 'খুলূকুল মুসলিম', মাওলানা মুহাম্মদ আলী : 'আল ইসলাম ওয়ান নিজামী আল আলামীল জদীদ, জাকারিয়া আলী ইউসূফ : 'ইজতামা আল জয়ূশ উল ইসলামীয়া', আহমদ আমীন : 'ফাজরুল ইসলাম' 'জহুরুল ইসলাম' আবদুল মুতআল আস সায়িদী : 'লিমাযা আনা মুসলিম', আলী রাফায়ী : 'মহাসিনুল ইসলাম', ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারাজ 'নাজারাতু ফিল ইসলাম', মুহাম্মদ আবু জাহারাতা 'আল ওয়াহদাতাল ইসলামিয়াত', মুহাম্মদ কামাল ও মুহাম্মদ ইসমাইল ইবরাহীম রচিত 'আল বালাদুল মুকাদ্দসা' প্রভৃতি।

ড. মুস্তাফা আহমদ আল জারাক্কা, সাইয়েদ কুতুব, ড. মুহাম্মদ উমার চাপরা, মুহাম্মদ কুতুব, শেখ সৈয়দ আহমদ ইয়াসীন আল খিয়ারী প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতদের রচনায় নানা আঙ্গিকে স্থাপিত হয়েছে মহানবী (সা)-এর প্রসঙ্গ।

আরবী ভাষায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে নিকট অতীতে। ফর্মের দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। ড. মুহাম্মাদ সাঈদ রমজান আল বুওয়াইতী রচনা করেছেন 'ফিকহুস সীরাহ'। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই সীরাতে ফিকহের কিছু বিষয়ও স্থান পেয়েছে। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় অষ্টম সংস্করণ।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী আরবী সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত আরবী সীরাত 'আল সীরাহ আন নবভীয়াহ' ১৯৭৬ খৃঃ রচিত হয়। এতে রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব হতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। সৌদী আরব সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যভুক্ত। বিশ্বের একাধিক ভাষায় একাধিক স্থান হতে এই গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে সীরাতুন্নবী সম্পর্কে গবেষণাকর্মের জন্য রাবেতার পক্ষ থেকে পাঁচটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'আর্ রাহীক আল মাখতুম' গ্রন্থটি। ভারতের বেনারস-এর অধিবাসী শেখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী এই গ্রন্থ রচনা করে ৫০ হাজার সৌদী রিয়াল পুরস্কার লাভ করেন। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই আরবী সীরাত গ্রন্থটি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত। ১৯৯২ সালে রিয়াদ থেকে এর নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই দশকের ব্যবধানে এতগুলো সংস্করণ খুব কম গ্রন্থের ভাগ্যে জুটেছে। এটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির রচনা-গুণের কারণে ঘটেছে।

'আস সীরাহ্ আন নবভীয়াহ আস্ সহীহাহ' নামক বিশুদ্ধ সীরাতটি রচনা করেছেন ড. আকরাম দিয়া আল উমারী। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং ৭২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এর ভূমিকা লিখেছেন ড. আবদুল আযীম মাহমুদ আদ্‌দীব। গ্রন্থকার বাগদাদ ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীরাতুন্নবী বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও অন্তর্দৃষ্টি এ গ্রন্থের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে। নতুন ও পুরনো বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থসমূহের সূত্র এতে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৯১ খৃ. কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মারকাজু বুহুস আস সীরাহ ওয়াস সুন্নাহ'-এর তত্ত্বাবধানে এই সীরাতটি প্রকাশিত হয়।

আরবী গদ্যে কতোভাবে যে মহানবী (সা)-এর উল্লেখ হয়েছে পুরোপুরি তা তুলে আনা এক প্রকার অসাধ্য। জীবনী, দার্শনিক চিন্তাধারা, ইসলামের ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনায় তিনি এসেছেন; আরবী উপন্যাস, নাটকে, ভ্রমণকাহিনীতে, প্রবন্ধে, শিশু সাহিত্যে, ছোট গল্পে, বিশ্বকোষে, ধর্মীয় সাহিত্যে কতোভাবে যে মহানবীর (সা) সশ্রদ্ধ উল্লেখ হয়েছে তাঁর ইয়ত্তা নেই।

আরবী ছোটগল্পে নানা চেতনায় মহানবী (সা) এসেছেন। মিসরের প্রখ্যাত গল্পকার ইয়াহিয়া তাহিরের একটি ছোট গল্পে এই অনুষঙ্গ কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু অংশ উল্লেখ করেছি :

"টেলিগ্রামের বন্ধ খামটা হাতে নিয়ে আসমা ভাবলেন, প্রতিবারের মতো হাজী আবদুল করিম হজ্জে যাবার সময় বলেছেন, 'আমার ফিরে আসবার খবরটা টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানাবো।' আসমা ভীষণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তার স্বামী বেশ ক'বার হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। খোদা তাকে রাসূলের রওজা যিয়ারত করে স্বীয় চক্ষু আলোকিত করার সম্মান দিয়েছেন। একরাশ আবেগে আসমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি ও দুবার হজ্জে গেছেন। মদীনা মনোওয়ার স্মৃতিতে তার দৃষ্টি আটকে গেল। সম্মুখে রাসূলের (সা) রওজার বাউণ্ডারী। হাজারটা চাঁদও যদি আলো ঢেলে দেয় তবুও এত উজ্জ্বলতার সমাবেশ ঘটবে না যা রাসূলের রওজা মুবারকে বিচ্ছুরিত। আসমার মন বলছে– 'আহা, আবার কখনো যদি সেখানে হাজিরা দিতে পারতাম।'– অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার চোখ বেয়ে রাসূল প্রেমের দীপ্ত আবেগে।..." ■

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস : আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, ইফাবা/১৯৮৬
২. আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য : জি. এম. মেহেরুল্লাহ, ঢাকা/১৯৯৩
৩. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা : ড. আবদুল আজিজ আল দুরী, এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী অনূদিত, বাংলা একাডেমী/১৯৮২
৪. সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) : ইবনে ইসহাক, শহীদ আখন্দ অনূদিত, ৩য় খণ্ড/১৯৯২
৫. সীরাতে ইবনে হিশাম : আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা/১৯৯২
৬. মহানবীর (সা) জীবন চরিত : ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল, মওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত, ইফাবা/১৯৯৮
৭. আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা : আবদুস সাত্তার, বাংলা/এ, ১৯৯৪
৮. গোলামানে ইসলাম : আহমদ সাঈদ, মুজীবুর রহমান অনূ :, ইফা/১৯৯১
৯. আল্লামা জারীর তাবারী (র) ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান : ড. মো. আজিজুল হক, ইফাবা,/ ২০০০
১০. মহানবীর শাশ্বত পয়গাম : আবদু রহমান আযযাম, আবু জাফর অনূদিত, ইফাবা/১৯৮৫
১১. সীরাত সাহিত্যের বিকাশ : ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯৯৮
১২. আরবী সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা) : আবদুস সাত্তার, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টো-ডিসে' ৯২, জানু-মার্চ, ৯৩
১৩. কলম, এপ্রিল/১৯৯৩, ওয়ারেসুল হকের অনুবাদ গল্প
১৪. অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪১৭ হিজরী
১৫. ড. হায়কল রচিত 'হায়াতু মুহাম্মাদ (সা) : পর্যালোচনা; (প্রবন্ধ) ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ইফা পত্রিকা, জানু-মার্চ/২০০২

www.pathagar.com

শান্তির দূত

রফিক মুহাম্মদ

□

এক

দিনের সূর্য অস্ত গেছে। সূর্যের ঝলসানো তাপ এখন নেই। রাতের আগমনের সাথে বসন্তের চাঁদের আলো ক্ষুদ্র এই মরুযাত্রী দলের পথকে আলোকিত করে দিচ্ছে, তারা দ্রুত পথ চলছেন। চাঁদ অস্তমিত হলে গভীর অন্ধকারেও তারার বিবর্ণ আলোয় যাত্রীদল এগিয়ে চললেন। চারজনের ক্ষুদ্র একটি দল। তাদের ক্লান্ত দেহে রাতের মৃদুমন্দ বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, দিনের মরুভূমির ঝলসানো অসহ্য তাপকে ভুলিয়ে দিচ্ছে রাতের শীতল বাতাস।

যাত্রীদলের একজন ইবন উরিকাত। সুমিষ্ট তার কণ্ঠ। তার কণ্ঠের গান ভালোবাসার বিলাপ হয়ে মরুভূমির নীরবতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। সে সুরের ধ্বনি অদৃশ্য শক্তি হয়ে যাত্রীদলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির গভীরতার মধ্যেই যেন গোপন কিছু লুকিয়ে আছে। আরববাসীদের কবিতা, গান, পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ সবকিছু রাতকে ঘিরেই। তাদের কল্পনা, গোপন বাসনা, আনন্দ-দুঃখ, হৃদয়ের আবেগ-ভালোবাসা সবকিছুই রাতের শীতল ও নিস্তব্ধতায় উৎসারিত। তারা রাতের কথা ও প্রত্যাদেশ শোনে– রাতে তাদের মন ও অন্তর জাগ্রত হয়ে আলোকিত হয়। তাই তাদের সুমধুর গানের কথা হয় 'ইয়া লাইল-হে আমার রাত'। ইবন উরিকাতও তার সুমিষ্ট কণ্ঠে গাইছেন, 'হে আমার প্রিয় রাত, তোমার শীতল বাতাসে প্রিয় নবীকে আরো শান্তি দাও।' এ যেন গান নয় সুরে সুরে ইবন উরিকাতের প্রার্থনা। সে প্রার্থনায় মরুভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে আরামদায়ক মৃদুমন্দ শীতল বাতাস, যা দিনের সেই ভয়াবহ তাপকে মাটিতে চাপা দিয়ে দেয়। যাত্রীদল চলছে সম্মুখে পেছনে ফেলে প্রিয় জন্মভূমি। অন্ধকারে আকাশের তারাপুঞ্জের মধ্যে দেখে নিচ্ছে তাদের যাত্রাপথের দিক।

দুই

শান্তির দূত আসছেন। গোটা ইয়াসরিব শহরে ছড়িয়ে পড়ে এ খবর। প্রতিদিন দলে দলে লোক তাল জাতীয় তরুবীথি তলে প্রত্যাশায় থাকে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই রাস্তার দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মধ্য আকাশে সূর্য এসে যখন শরীর

www.pathagar.com

ঝলসে দিতে চায় তখন তারা ফিরে যায় বাড়িতে। তবুও আশাহত নয় তারা। শান্তির দূত, শান্তির অমীয় বাণী নিয়ে আসছে। শান্তির আশায় তারা উদগ্রীব। ওইতো দূরে মরুর ধূলী উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী আসছে। দূরে অশ্বারোহীদের আসতে দেখেই তাদের ইয়াসরিব বাসীদের আনন্দ উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মরুভূমির অসহ্য উত্তাপকে উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে যায় শান্তির দূতকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু বেশ দূর থেকে তারা দেখতে পায় অশ্বারোহীরা তাদের গতিপথ বদলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। তারা কিছুটা বিমর্ষ হয় এই ভেবে, শান্তির বার্তাবাহকের আগমনে বিলম্বে হচ্ছে কেন? এই ভেবে তারা উদ্বিগ্ন মনে সময় অতিবাহিত করে।

প্রতিদিন তারা মধ্য আকাশে সূর্য না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। একদিন অপেক্ষা করে ফেরার পথে কুলসুম বিন হামাদ হাঁটতে হাঁটতে সাদ বিন খুসিমার সাথে কথা বলেন–

'আমাদের মধ্যে যদি বিবাদ হয়, ঝগড়া হয় তাহলে তা হবে খুবই দুঃখজনক। কেননা আমরা ঈমান এনেছি। শান্তির বাহক, আল্লাহর নবী আমাদের সাথে থাকবেন এতে আপনার আপত্তি আছে?

উত্তরে সাদ বলেন, 'আমাদের বাড়িতে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। যা হোক, এ ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ না করাই উত্তম। এ বিষয়ে আল্লার নবীর সিদ্ধান্ত ই হবে চূড়ান্ত। অভ্যর্থনাকারী দল ফিরে যাচ্ছে উদ্বগ্ন মনে। তাদের হৃদয়ে শুধু তোলপাড় শান্তির দূত আসছেন না কেন?

তিন

নিস্তব্ধ রাত। গৃহের চারপাশে অস্ত্র সজ্জিত কুরাইশরা। সতর্ক তারা, ঘিরে রেখেছে মুহাম্মাদের (সা) ঘর। আজ রাতেই তাঁর শেষ রাত। অন্ধকারেও কুরাইশরা ক্রুর হাসি হাসে। ধীর ধীরে অতি সতর্কতার সাথে অস্ত্র-সজ্জিত লোকগুলো প্রবেশ করে ঘরে। এইতো বিছানায় শুয়ে আছে মুহাম্মাদ (সা), ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে মুখের উপর থেকে হ্যাঁচকা টানে চাদরটা সরিয়ে নেয়। কিন্তু একি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় কুরাইশরা। মুহাম্মাদের (সা) বিছানায় এ যে আলী! চক্রান্তকারী কুরাইশদের প্রধান আবু সুফিয়ান ক্রোধে ফেটে পড়ে। হে আলী বল মুহাম্মাদ (সা) কোথায়? আমি বলবো না। সাহস ও দৃঢ়তার সাথে আলী জবাব দেন। তার দৃষ্টির প্রখরতা তখন এতটাই উজ্জ্বল হয় যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আসা জোয়ানদের এই দলটাকে তার কাছে অতি তুচ্ছ মনে হলো। আলীর তীক্ষ্ণ এবং অনমনীয় জবাবে আবু সুফিয়ান তার দল নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের নির্দেশ দেয় আবু বকরের বাড়ি ঘেরাও করার জন্য। আবু সুফিয়ান ভাবে মুহাম্মাদ নিশ্চিত সেখানে আছে।

না, সেখানেও নেই। তবে কি মুহাম্মাদ তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে? কুরাইশ দলপতিদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। গোত্রপ্রধানরা পরিষদ হলে মিটিং-এর আয়োজন করে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্তের পর মক্কা শহরে ঘোষণা জারি হয়– 'যে কেউ মুহাম্মাদকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আনবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেয়া হবে।' দুর্ধর্ষ

www.pathagar.com

সুরাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘোষণা দিল, আমি পুরস্কার চাই না, আমি শুধু মুহাম্মাদকে চাই। তাকে না ধরা পর্যন্ত আমি দানা-পানি কিছুই স্পর্শ করবো না। সুরাকার কথা শুনে কুরাইশ দলপতিগণ আশান্বিত হলো। তারা নিশ্চিত হলো, দুর্ধর্ষ সুরাকা ও তার কালো ভৃত্য অবশ্যই মুহাম্মাদকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে। কয়েকদিন গেল, দিনের অসহ্য উত্তাপ, রাতের ভয়াল অন্ধকার সবকিছু উপেক্ষা করে সুরাকা তার ভৃত্যকে নিয়ে চষে বেড়ালো মরুভূমি। কিন্তু না ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো সুরাকা। চক্রান্তকারী কুরাইশদের আশার আলোও সেই সাথে নিভে গেল।

চার

ইয়াসরিববাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। শান্তির দূত আসছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতিদিনিই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা অপেক্ষা করছে। রাস্তার ধারে যতদূর পর্যন্ত গাছের ছায়া ততদূর পর্যন্ত তারা এগিয়ে যায়। সূর্যের তাপ অসহনীয় হওয়ার পর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই কয়েক দিনের মধ্যে তারা বেশ কয়েকবার দূর থেকে অশ্বারোহীদের আসতে দেখে আনন্দিত হয়েছে। চিৎকার করেছে । অশ্বারোহীদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে কেউ কেউ চিৎকার করে বলেছে 'ওই যে শান্তির দূত' আল্লার নবী আসছেন।' কিন্তু না! পথিকরা নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পায় সেটা ইয়াসরিবমুখী আরববাসীদের একটি বড় মরুযাত্রী দল। তারা চিন্তিত হয়। কি হলো, শান্তির দূত আসছেন না কেন? অপেক্ষায় থেকে থেকে প্রতিদিনই সূর্য মধ্যাকাশে গেলে, গাছের ছায়া ক্রমে মাটি থেকে বিলীন হয়ে গেলে তারা ঘরে ফিরে আসে।

বারই রবিউল আউয়াল তারিখ। অবশেষে দিগন্ত রেখা থেকে এক তীর পরিমাণ উচুঁতে সূর্য উঠার পূর্বেই দূর থেকে একখণ্ড ধূলার মেঘ যেন উঁকি দিলো। ধীরে ধীরে দিগন্তে বিন্দুর মতো দুটি উটকে দেখা গেল। উট দুটি ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। একজন ইহুদী প্রথম তা দেখতে পেল। সে শহরের একটা উঁচু দেয়ালের উপর উঠে চিৎকার করে বলতে শুরু করে "হে আরববাসী, ওহে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মহিলার পুত্রগণ, সুখ ও সৌভাগ্য তোমাদের উপর পতিত হয়েছে। তোমরা যে লোকটির জন্য অপেক্ষা করছিলে, তিনি এসেছেন।"

কয়েক মিনিট পর দুটি উটে চারজন যাত্রী এসে উপস্থিত হলেন। একটি উটে মুহাম্মাদ (সা) এবং আবু তালিব এবং অন্যটিতে ইবন উরিকাত ও আমীর। একটা গাছের নিচে উটের উপর থেকে তারা নামলেন। 'শান্তির দূত এসে গেছেন' এ খবর বিদ্যুৎ গতিতে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়লো। হিজরতকারী ও সাহায্যকারীগণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে দ্রুত তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় শ'খানেক লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, সুর করে গাইতে লাগল 'শান্তির দূত এসেছেন শান্তি নিয়ে- দলে দলে আয়রে তোরা শান্তির এই ছায়া তলে।'

তাদের এই ভালোবাসার উচ্চারণে প্রিয়নবীর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে মৃদু হাসির ঝিলিক। ■

www.pathagar.com

এক নজরে রাসূল (সা)-এর জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম

□

মহান আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এই দুনিয়াতে। তাঁরা সকলেই নির্দিষ্ট গোত্র বা কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি গোটা বিশ্বের সকল কিছুর নবী। তাকে বলা হয় রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁকে সৃষ্টি না করা হলে জগতের কোন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তাই তো সৃষ্টিজীব তাঁকে সমীহ করে চলে। নিম্নে রাসূল (সা)-এর জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হল।

১. রাসূলের জন্মতারিখ : তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মত, তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদিকের সময় ভূমিষ্ঠ হন।

২. কোন্ বংশ : আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশে। কুরাইশ বা ফিহির রাসূলের একাদশ ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি।

৩. মাতা পিতার নাম : মাতার নাম আমিনা। আর পিতার নাম আব্দুল্লাহ।

লালন-পালনে যারা সহযোগিতা করেন : দুগ্ধ পান করান বিবি হালিমা। পিতামাতার মৃত্যুর পর লালন-পালনের ভার ন্যস্ত হয় দাদা আবদুল মুত্তালিবের হাতে। তারপর দায়িত্ব অর্পিত হয় চাচা আবু তালিবের হাতে।

৪. তাঁর নাম করণ : তাঁর জন্মের সংবাদ শ্রবণে আবদুল মুত্তালিব পুত্রের মৃত্যু শোক ভুলে গিয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে শিশু পৌত্রের নাম দেন মুহাম্মাদ অর্থাৎ প্রশংসিত। এদিকে নবী জননী আমিনা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাঁর নাম যেন আহমাদ রাখা হয়। যার অর্থ চরম প্রশংসাকারী। আহমাদ ও মুহাম্মাদ এ দুই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

৫. কখন পিতামাতা হারান : জন্মের ছয়মাস পূর্বে পিতা মৃত্যুবরণ করেন। মাতা জন্মের ছয় বছর পর স্বামী আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত করে আসার সময় যিতাওয়া নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৬. বক্ষ বিদারণ : মুহাম্মাদ যখন দুধ মা হালিমার কোলে পালিত হচ্ছিলেন, তখন জিবরাইল কর্তৃক বক্ষ বিদারণ করা হয়। তখন বয়স তার পাঁচ বছর।

www.pathagar.com

৭ হিলফুল ফুযূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা) ১৭ বছরে উপনীত হলে আরবের যুবকদের একত্রিত করে হিলফুল ফুযূল নামে একটি শান্তি ও সেবামূলক সংগঠন স্থাপন করেন।

৮. প্রথম বাণিজ্য যাত্রা : মুহাম্মাদ সর্বদা ভাবতেন যদি বাণিজ্য কাফেলার সাথে গমন করতে পারি তাহলে ভালই হত। একদিন সে আশা তাঁর পূর্ণ হল। তিনি চাচার সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইয়ামেন সফর করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বছর।

৯. আল-আমিন উপাধি লাভ : তিনি ছিলেন অসহায় মানুষের বন্ধু। নিঃস্বার্থ সমাজ সেবী। সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্র গঠনের প্রথম উপকরণ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে আল আমীন উপাধিতে ভূষিত করল। অবস্থা এমন হয় যে, তাকে দেখামাত্রই আল আমীন বলতে থাকে। মুহাম্মাদ নামটি যেন চাপা পড়ে যায়।

১০. দ্বিতীয়বার বাণিজ্যে যোগদান : মুহাম্মদ (সা)-এর সত্যবাদিতা ও জয়জয়কার ধ্বনি শুনে বিবি খাদিজা তাকে ব্যবসার কাজে অর্ন্তভুক্ত করেন।

১১. বিবাহ : মুহাম্মদ (স)-এর কাজে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁকে বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্ত াব পাঠান। চাচা আবু তালিব সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন এবং যুবক মুহাম্মাদকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তখন রাসূলের বয়স ২৫ এবং খাদিজার বয়স ৪০ বছর।

১২. রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণ : রাসূল (সা)-এর কজন স্ত্রী ছিল এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে পাওয়া যায় তিনি ৯ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। তবে জমহুরে ওলামার মতে তাঁর এগারজন স্ত্রী ছিল। তাঁদের ধারাবাহিক নাম দেয়া হল– (১) হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) (২) সাওদাহ বিনতে যামআ (রা) (৩) হযরত আয়েশা (রা) (৪) হাফসা বিনতে ওমর (রা) (৫) উম্মে সালমা (রা) (৬) উম্মে হাবিবাহ (রা) (৭) যয়নব জাহাশ (রা) (৮) যয়নব বিনতে খোজাইমা (রা) (৯) মায়মুনা (রা) (১০) জুয়াইরিয়া (রা) (১১) সুফিয়া (রা)।

১৩. রাসূলের সন্তান-সন্তুতি : তাঁর কোন পুত্র সন্তান দুনিয়াতে বাঁচেনি। সবাই অপ্রাপ্ত বয়সে পরপারে যাত্রা করেছিলেন। চারজন কন্যা সন্তান জীবিত ছিলেন। তাঁদের বিবাহ শাদী হয়েছিল। তাঁরা হলেন– (১) হযরত ফাতেমা (রা) (২) কুলসুম (রা) (৩) যয়নব (রা) (৪) হযরত রুকাইয়া (রা)।

১৪. রাসূলের নবুয়ত লাভ : তিনি চল্লিশ বছরে উপনীত হলে হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় জিব্রাইল আমীনের মাধ্যমে অহী প্রাপ্ত হন। অহীর প্রথম বাণী পবিত্র কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত।

১৫. দাওয়াতী কার্যক্রম : অহীপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আর বসে থাকতে পারেননি। দ্বীনের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার ১৩ বছর দাওয়াতের প্রাক্কালে সর্বপ্রথম বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ইসলামের সুশীলত ছায়াতলে আশ্রয় নেন। ছোটদের মধ্যে এ

www.pathagar.com

সময়ে হযরত আলী (রা) ইসলাম কবুল করেন।

১৬. দ্বীন প্রচারে প্রথম উৎসাহদাতা : দ্বীনের কাজে সর্বপ্রথম উৎসাহ প্রদান করেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) যার কাজে খুশি হয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে সালাম দিয়েছেন।

১৭. কোথায় কত বছর অবস্থান করেন ঃ নবুয়ত লাভের পর তিনি মক্কায় ১৩ বছর এবং মদীনায় ১০ বছর অবস্থান করেন। মক্কায় প্রথম বছর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন।

১৮. শায়বে আবূ তালিব : নবী করীম (সা)-এর জন্য এ তিনটি বছর ছিল খুব করুণ। কারণ এ সময় বাহির থেকে খাদ্য না আসার কারণে অবরুদ্ধ সকল পুরুষ, মহিলা, শিশু খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছে। শিশুরা মায়ের দুগ্ধপান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যার ফলে তাদের কান্নার আওয়াজে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। অবশেষে তিন বছর পর মহররম মাসে নবুয়তের দশম বছরে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সঙ্গী সাথী নিস্কৃতি পেলেন।

১৯. বীরে মাউনার ঘটনা : রাসূল (সা)-এর মনে দারুণভাবে আঘাত করার অপর ঘটনাটি হল বীরে মাউনা। যাকওয়ানে রায়ল গোত্র কর্তৃক ৭০ জন ক্বারী শহীদ হলে রাসূল (সা) দারুণভাবে ব্যথিত হন এবং এক মাস পর্যন্ত কুনূতে নাযেলাহ্ পড়ে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ কামনা করেন।

২০. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : রাসূল (সা) নিজে ২৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করেন। যাকে গাযওয়া নামে অভিহিত করা হয়। এ গাযওয়ার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন গাযওয়ার সংখ্যা ১৯টি আবার কেউ বলেন ১৭টি।

২১. হুদায়বিয়ার সন্ধি : রাসূল (সা) ১৪০০ শত সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় হজ্জ করতে এলে মক্কার কাফের কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে ৬২৮ খ্রিঃ তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে একটি চুক্তি করেন, যাকে মহান আল্লাহ 'ফাতহুম মুবিন' বলে উল্লেখ করেছেন।

২২. মদীনার সনদ : রাসূল (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে সকল ধর্মের মাঝে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন যাকে 'মদীনা সনদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত সংবিধান। এখানে রাসূল (সা) একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন বলে পরিচয় পাওয়া যায়।

২৩. তাঁর চরিত্র : হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট একদল সাহাবী এসে রাসূল (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কুরআনই রাসূলের বাস্তব চরিত্র।

২৪. হিজরত : রাসূল (সা) এর জীবনের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মধ্যে হিজরত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাতৃভূমি ত্যাগকালে তিনি জন্মভূমির মায়ায় বার বার পেছনে ফিরে

www.pathagar.com

তাকান। আকাশ বাতাস তাঁকে যেন বিদায় দিতে চাচ্ছে না। সবকিছু নীরব নিথর হয়ে যায়। তবু যেতে হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে মুসলমান ও দ্বীনের কল্যাণে। মক্কা থেকে মদীনা ছাড়াও তাকে আরো বহু স্থান হিজরত করতে হয়েছে।

২৫. বিদায় হজ্জ : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) দশম হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রিঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী যিলহজ্জ মাসের পাঁচ তারিখ মক্কা শরীফে উপনীত হন। সাথে ছিল লক্ষাধিক গুণগ্রাহী সাহাবী এবং পূতঃ পবিত্র সহধর্মিনীগণ। তিনি সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। যেখানে রাসূলের দ্বীন প্রচার পরিপূর্ণতার, মানবতার, ভালবাসার, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি রাসূল (সা)-এর চিরবিদায়ের কথা ছিল।

উপসংহার : পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা) পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষ এবং রাসূল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রতিটি কাজের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাই খুঁজে পাব। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত, তাঁর জীবনেতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারব। ■

তথ্যপঞ্জি

১. আররাহীকুল মাখতুম : আল্লামা সফিউর রহমান মোবারক পুরী
২. আসহুস সীয়ার : আবুল বারাকাত মুহাম্মদ রউফ
৩. বিশ্ব নবী : গোলাম মোস্তফা
৪. বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

জীবন সায়াহ্নে মুহাম্মাদ (সা)

আবু তাহের মোঃ সালেহ

□

দশ হিজরীর শেষ দিকের ঘটনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র আরব জাহান এখন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর চিন্তা চেতনায় এবং অনুভব-অনুভূতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং কথাবার্তায় বিশেষ ধরনের নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো। তাঁকে বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না।

দশম হিজরী রমজান মাস। এ বছর মুহাম্মাদ (সা) বিশ দিন এ'তেকাফ পালন করলেন। অথচ অন্য সময় তিনি দশদিন এ'তেকাফ করতেন। হযরত জিব্রাইল (আ) এ বছর নবী করীম (সা) কে দু'বার সমগ্র কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনালেন।

দশম হিজরীর জিলহজ্জ মাস। প্রিয়নবী (সা) দশই জিলহজ্জ তারিখে আরাফাত ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল, আমার কথা শোন। জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এ জায়গায় আর মিলিত হতে পারব কিনা। দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, এখন থেকে সকল প্রকার সুদ খতম করে দেয়া হলো। তিনি আরও বলেন, স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা আল্লাহ পাকের কালামের মাধ্যমে পরস্পরের জন্য হালাল হয়েছ।

আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে জিনিস দু'টি হলো আল্লাহর কিতাব 'আল কুরআন' এবং তাঁর রাসূলের (সা)'সুন্নাত'। তাঁর ভাষণ শেষ করার পরপরই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম।" (আল-মায়েদা, আয়াত-৩)

অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই নাযিল হয় আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা 'আন্‌নসর'।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :
"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।"
সূরা 'নসর' এর অপর নাম 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে করীম (সা) এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয়নবী (সা) বুঝে ফেললেন যে, এবার দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পালা।
একাদশ হিজরীর সফর মাস। এ মাসের শুরুতে মুহাম্মাদ (সা) ওহুদের ময়দানে গমন করেন। সেখানে অহুদের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য এমনভাবে দোয়া করলেন যে, তিনি তাঁদের কাছ থেকে যেন বিদায় গ্রহণ করলেন। ফিরে এসে মিম্বরে বসলেন। সমবেত সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে ওয়াজ নসিহত করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, আমি আমার 'হাউজ' অর্থাৎ হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি।
একদিন মধ্যরাতে প্রিয়নবী (সা) জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে গেলেন এবং কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে কবরবাসীদেরকে সুখবর প্রদান করলেন যে, আমিও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো।

অসুস্থতার কবলে মুহাম্মাদ (সা)

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর। এদিন ছিল রোববার। প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (সা) জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁর প্রবল মাথা-ব্যথা শুরু হয়। শরীরের তাপ এতো বেড়ে যায় যে, মাথায় বাঁধা কাপড়ের পট্টির ওপর দিয়ে তাপ অনুভব করা গেছে। এদিন থেকেই নবী করিম (সা)-এর মৃত্যুকালীন অসুখের সূচনা। এ অসুখ অবস্থায় তিনি এগার দিন মসজিদে নববীতে নামাজের ইমামতি করেন। অসুখের মেয়াদ ছিল চৌদ্দদিন। শেষের দিনগুলোতে অসুস্থতা বাড়তে লাগলো। রাসূলে করীম (সা) ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষ সপ্তাহ তিনি সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হলে আল কুরআনের সূরা 'নাস' ও 'ফালাক' পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁ দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারতো না তাই এরূপ করতাম। (ইবনে কাসীর)

আখেরী চাহার শোম্বা

দুনিয়ার জীবনের অন্তিম সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর পাঁচদিন আগে আখেরী

www.pathagar.com

চাহার শোম্বা অর্থাৎ শেষ বুধবার। এ দিনে নবী করীম (সা) এর পবিত্র দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। এতে তাঁর কষ্ট-যন্ত্রণাও বেড়ে গেল। তিনি মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে যেতে লাগলেন। জ্ঞান ফিরে আসলে বললেন, বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি আমার ওপর ঢালো। আমি যেনো লোকদের কাছে গিয়ে অসিয়ত করতে পারি। নির্দেশ মোতাবেক পানি ঢালার জন্য নবী করীম (সা) কে বসিয়ে দেয়া হল। তাঁর শরীরে প্রচুর পরিমাণ পানি ঢালা হলে, তিনি বললেন আর প্রয়োজন নেই।

এরপর রাসূল (সা) কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। তিনি মসজিদে গেলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। এ সময় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। সমবেত সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ইহুদী-খ্রীস্টানদের উপর আল্লাহ-পাকের অভিশাপ। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তোমরা আমার কবরকে পূজা করার উদ্দেশ্যে মূর্তিতে পরিণত করো না। এরপর তিনি নিজেকে পেশ করে বললেন, আমি কাউকে আঘাত করে থাকলে সে যেনো আমাকে আঘাত করে বদলা নিয়ে নেয়। কাউকে অসম্মান করে থাকলে, সেও তার বদলা নিতে পারে। এভাবে কেউ কোন কিছু পাওনা থাকলে তা সে বুঝে নিতে পারে। সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে তিন দিরহাম পাওনা রয়েছি। সাথে সাথে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হল।

মৃত্যুর আর মাত্র চারদিন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। নবী করীম (সা) অসুখের তীব্রতায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সঙ্গী সাথীদেরকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেন :

১. ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুশরিকদের জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দেবে।

২. আগন্তুক প্রতিনিধি দলের সাথে আমি যেভাবে ব্যবহার করতাম তাদের সাথে তোমরাও সে রকম ব্যবহার করবে।

৩. নামাজের ব্যাপারে সচেতন থাকবে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।

নবী করীম (সা) অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজে পর্যন্ত ইমামত করেন। এশার নামাজের সময় রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় মসজিদে যাওয়ার শক্তি আর থাকলো না। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা) কে ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য খবর পাঠালেন।

জীবনের শেষ দিন

সে দিন ছিল সোমবার। ফজরের নামাজ শেষ করলেন। এরপর তাঁর ওপর আর কোন নামাজের সময় হয়নি। চাশতের নামাজের সময়ে রাসূল (সা) প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। সেই কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন। এরপর পুনরায় ফাতিমার কানে কিছু কথা বললেন। এবার হযরত

www.pathagar.com

ফাতিমা (রা) হাসতে লাগলেন।
পরবর্তী সময়ে হযরত আয়েশা (রা) হযরত ফাতিমা (রা) কে তাঁর কান্না হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, ফাতিমা, এই অসুখেই আমার মৃত্যু হবে। একথা শুনে আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার অনুসারী হয়ে পরলোকে যাবে। একথা শুনে আমি হাসলাম।
নবী (সা) এর যন্ত্রণার তীব্রতা দেখে হযরত ফাতিমা (রা) হঠাৎ বলে ফেললেন, হায় আব্বাজানের কষ্ট! একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন, তোমার আব্বাজানের আজকের পরে আর কোন কষ্ট নেই।
তারপর হযরত হাসান-হোসাইন (রা) কে ডাকলেন, চুম্বন করলেন। সহধর্মিণীদের ডাকলেন, প্রয়োজনীয় নসিহত করলেন। এদিকে কষ্ট ক্রমেই বাড়ছিল। বিষ-এর প্রভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। খয়বর অবরোধের সময় তাঁকে এ বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।
এরপর সাহাবায়ে কিরামকে ওয়াজ নসিহত করলেন। তিনি তাদের বলেন, নামাজ নামাজ এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী। নবী (সা) এ কথা কয়েকবার উচ্চারণ করলেন।

মৃত্যুকালীন সময়

মৃত্যুকালীন হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা)কে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ-পাক আমাকে ২টি বিশেষ নিয়ামতের ভাগী করেছেন।
এক. নবী করীম (সা) আমার ঘরে আমার কোলের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
দুই. তাঁর ওফাতের সময় আল্লাহ পাক নবী (সা) এবং আমার থুথু একত্রিত করেন।
মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নবী করীম (সা) মিসওয়াক চাইলেন। মিসওয়াক শক্ত হওয়ায় হযরত আয়েশা (রা) প্রিয় নবীর (সা) অনুমতি নিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে তা নরম করে দেন। এরপর তিনি ভালোভাবে মিসওয়াক করলেন এবং পানি দিয়ে নিজের হাতে চেহারা মুবারক মুছলেন। এরপর বললেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'- অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। মৃত্যু বড় কঠিন।
নবী করীম (সা) মিসওয়াক শেষে হাতের আঙ্গুল তুললেন। এ সময় তাঁর দৃষ্টি ছিল উপরের দিকে। উভয় ঠোঁট নড়ছিল। তিনি বিড় বিড় করে বলছিলেন:
হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎব্যক্তি যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ-পাক আমাকে মার্জনা কর, আমার ওপর রহম কর, আমাকে 'রফিকে আলায়' পৌঁছে দাও।
রাসূল (সা) শেষ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। এর পরপরই তাঁর হাত ঝুঁকে পড়লো। তিনি পরম প্রিয়ের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি-রাজিউন'।

www.pathagar.com

সেদিন ছিল একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, চাশতের নামাজের শেষ সময়।

চারদিকে শোকের ছায়া

হৃদয়বিদারক এ শোকসংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে শোকের কালো ছায়া। হযরত ওমর (রা) জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, যারা বলবে যে, মুহাম্মাদ (সা) মারা গেছেন, তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন।
হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমরকে (রা) বসতে বললেন। হযরত ওমর (রা) বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত আবু বকর (রা) উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কেউ যদি মুহাম্মাদ (সা)-এর পূজা করে থাকো তাহলে সে যেন জেনে রাখে যে মুহাম্মাদ (সা)-এর মৃত্যু হয়নি। আর তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের ইবাদাত করে, তারা যেন জেনে রাখে যে, একমাত্র আল্লাহ-রাব্বুল আলামীনই চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :
মুহাম্মাদ কেবল রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? কেউ যদি পেছনে ফিরে যায় তাতে আল্লাহ-পাকের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ পাক অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন। (আলে-ইমরান, আয়াত-১৪৪)
মানসিক যন্ত্রণায় দিশেহারা-অস্থির সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের (রা) বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করলেন যে, নবী করীম (সা) সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।
হযরত ওমর (রা) বলেন, কুরআন মজীদের এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনে আমি যেন মাটি হয়ে গেলাম। আমি তখন বুঝতে পারলাম প্রিয়নবী (সা) সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।

দাফনের প্রস্তুতি

মঙ্গলবার রাসূল (সা)-কে গোসল করানো হয়। তাঁর দেহ অনাবৃত না করেই গোসল দেয়া হয়। গোসলের পর তিন খানি সাদা ইয়ামেনী চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়। এতে কোর্তা এবং পাগড়ি ছিল না। শুধু চাদর দিয়েই জড়িয়ে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) হুজরায় হুজুর (সা) যেখানে ইন্তেকাল করেন সেখানেই বিছানার নিচে কবর খনন করা হয়।
এরপর দশজন করে সাহাবা হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাযার নামাজ আদায় করেন। এ নামাজে কেউ ইমাম হননি। পুরুষদের পরে মহিলারা, তারপর শিশুরা জানাযার নামাজ আদায় করে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র দেহ কবরের ভিতর রাখা হয়। ■

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) পথে

কাজী তাবাসসুম

□

আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। তিনি এরশাদ করেছেন।

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনই যদিও তা কাফেরদের কাছে অপ্রীতিকর।" (আত তওবা : ৩২, সফ : ৮)

"তিনি রাসূলকে সত্য ধর্মসহকারে পাঠিয়েছেন যাতে একে সব ধর্মের উপর বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যদিও তা মুশরিকরা পছন্দ করে না।" (আত তওবা : ৩৩, সফ : ৮)

"আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করে দেবেন।" (আত ওতবা : ১৪)

প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন আজ কাফেররা বিজয়ী হচ্ছে? আসলে নিজেদের পরিণতির জন্য আজ আমরাই দায়ী। প্রিয় রাসূল যে পথ ও পাথেয় দিয়ে গেছেন আজ সেই পথ ও পাথেয় থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আল্লাহই হলেন সবচেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী। আমরাই পারিনি বিজয়ের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করতে। আমরা ভুলে গেছি আল্লাহর সেই ঘোষণাঃ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (আল বাকারা : ১৫২)

আমরা অপেক্ষা করছি অদৃশ্য সাহায্যের। অপেক্ষা করছি এক ঝাঁক আবাবিলের। অপেক্ষা করি মূসা-তারেক-সাল্লাউদ্দীনের। ভুলে গেছি আল্লাহর নির্দেশকে।

"তোমরা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" (আলে ইমরান : ১০৩)

"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।" (আলে ইমরান : ১০৫)

"মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর সমবেতভাবে যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (আত তওবা ৩৬)

"আল্লাহ্ তাদেরকেই ভালবাসেন যারা তার পথে লড়াই করে এমনভাবে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (আস সফ : ১১)

www.pathagar.com

মহানবী (সা) এই নির্দেশকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলেই সেদিন বদর প্রান্তরে ক্ষুদ্র বাহিনী বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল।

আল্লাহ নিষেধ করেছেন কাফের মুশকিদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে। অথচ আজ রাসূলের উম্মত হয়েও আমরা তাদেরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আল্লাহর সাহায্য ও অভিভাবকত্বের উপর ভরসা হারিয়ে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি তারই শাস্তি আজ গোটা মুসলিম বিশ্ব ভোগ করছে।

রাসূলের উম্মাতের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষা বিশ্বাসের, এই পরীক্ষা আমলিয়াতের।

"আল্লাহ তো অবশ্যই পরীক্ষা করে নেবেন ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

(আল আনকাবুত : ৩)

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে, সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে আমরা কার সাথী হব? কাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো? এই সিদ্ধান্তের উপরই নির্ধারিত হবে আমাদের ইহকালীন সাফল্য ও পরকালিন অবস্থান।

আজ আমাদের সামনে দুটি পথ:

(১) "এরাই হলো সে সমস্ত লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে নিয়েছে আর ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আজাব।" (আল বাকারা : ১২৭)

(২) আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, মারে ও মরে। ... ... তোমরা আনন্দিত হও সেই লেনদেনে যা তোমরা তার সাথে করেছ। আর এ হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (আত তওবা : ১১১)

সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই- জাহান্নামীদের না জান্নাতীদের।

আমরা কি পেতে চাই ক্ষমার বিনিময়ে আজাব, হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী নাকি জান ও মালের বিনিময়ে জান্নাত? সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখনই চূড়ান্ত সময়।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয় অবশ্যই আসবে, অবশ্যই অবশেষে রাসূলের (সা) উম্মাতেরাই পৃথিবীর শাসনাধিকারী হবে যদি তারা কাতারবন্দী হতে পারে রাসূলের পথে। সীসাঢালা প্রাচীরের প্রবল শক্তি নিয়ে যদি গড়তে পারে প্রতিরোধ দুর্গ। ■

www.pathagar.com

মহানবী (সা)-এর অনন্য ব্যক্তি প্রতিভা : একটি নবতর মূল্যায়ন

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

□

নবুয়ত কোন শিক্ষা, যোগ্যতা বা অর্জনযোগ্য বিষয়ের নাম নয়। দক্ষতা, মেধা বা প্রতিভা দিয়ে নবী হওয়া যায় না। চর্চা, অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা দুনিয়ার সব কিছু অর্জন সম্ভব হলেও নবুয়ত বা রিসালত লাভ করা সম্ভব নয়। নবুয়ত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ পাকের মনোনয়ন। আল্লাহর পয়গাম মানবজাতির কাছে বহন করে আনা এবং তার প্রচার করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ নবী-রাসূল মনোনীত করেন। "আল্লাহ্ ফেরেশতা এবং মানবকুল থেকে রাসূল মনোনীত করে থাকেন।" এই আয়াতে যে সত্যটি ফুটে ওঠে তারই পূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের এ উক্তিতে ঃ "প্রত্যাদেশকৃত ওহী ভিন্ন তিনি (নবী করীম সা.) মন থেকে কোন কথা বলেন না।"

আল্লাহপাকের মনোনয়ন ও ওহীর মাধ্যমে পরিচালনার বৈশিষ্ট্যে নবী-রাসূলগণের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। বিশ্বের সকল মনীষী, কৃতীপুরুষ, বিজয়ী বীর, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মপ্রবর্তক ও সংস্কারকের জীবনে তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা ও সুনিপুণ কর্মকৌশলের ভূমিকা অনুপাতেই তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু নবী-রাসূলগণের জীবন ও আদর্শের আলোচনায় এ বিষয়টি মুখ্য হয়ে আসে না। এখানে আসে প্রতিটি কর্মসাধনা ঘটনা ও পরিবর্তনের পেছনে খোদায়ী প্রত্যাদেশের বর্ণনা আর প্রত্যাদিষ্ট কর্মপদ্ধতির আলোকে পরিচালিত নবুয়তি আন্দোলন তথা তৎপরতার সার্থক রূপরেখার বিবরণ।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)র জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর আবির্ভাব ও জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপ্রচারক কর্তৃক বিবৃত হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী। পূর্ববর্তী নবীগণও সংবাদ প্রদান করেছেন শেষ নবীর আগমনের। অতএব, আখেরী নবী (সা)র আবির্ভাব ছিল পূর্ণরূপে পরিকল্পিত ও খোদায়ী ব্যবস্থাপনার আওতাধীন। পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় ও সমাজ একজন সাধারণ অথচ অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেনি। যা অন্যান্য কৃতীপুরুষ বা মনীষীদের বেলায় ঘটে থাকে। এ হিসেবে নবী-রাসূলগণ সম্পূর্ণভাবেই ব্যতিক্রম।

www.pathagar.com

মাতৃ উদর থেকেই পিতৃহীন অবস্থায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়া, বালক বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বিজন প্রান্তরে মাতৃহারা হওয়া, দাসীর সাহায্যে পিতামহের গৃহে পৌছা, অল্পকালের ব্যবধানে পিতামহের মৃত্যু ঘটায় দরিদ্র পিতৃব্যের সংসারে অনাথ অবস্থায় নীত হওয়া ইত্যাদি পথ-পরিক্রমায় শিশু-কিশোর ও তরুণ মুহাম্মাদ (সা) এর যে মনো-দৈহিক বিকাশ সাধিত হয় তা নিঃসন্দেহে তাঁর ভবিষ্যত জীবনের কর্ম সাধনা ও তৎপরতার জন্যে উপযোগী সূচনা পর্ব। একটি অনন্য আদর্শিক জীবন সংগ্রাম ও সর্বপ্লাবি যুগবিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল। মহান প্রভুর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রাকৃতিক নিয়মেই মহানবী (সা)- পার্থিব দিবস-রজনী, চল্লিশটি বর্ষ পরিক্রমণ করে একটি পরিণত মানবের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে প্রিয়নবী (সা)কে নবুয়তের দায়িত্ব লাভের সময় দুয়ারে উপনীত করে। সাধারণত সকল নবীই যে সময়কালে নবুয়তের মর্যাদাগত দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধা মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ নবী-রাসূলগণও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী 'মানুষ'। তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও চেতনা সকল মানুষের চেয়ে বেশি, বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। তদুপরি তাঁরা খোদায়ী নির্দেশনায় ধন্য। ব্যক্তি বা মানুষ হিসেবে নবী-রাসূলগণের প্রাক-নবুয়ত জীবনও অনুপম বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আমাদের প্রিয়নবী (সা)র যৌবনে নিজ জাতি ও সমাজের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তিনি নিজ নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক গুণাবলীর দ্বারা সমাজকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছেন। কাবা গাত্রে কৃষ্ণ কালো পাথর স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাঁর উপর বিবাদমান জনতার পূর্ণ আস্থা এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধানের প্রতি গোটা আরব সম্প্রদায়ের সানন্দে সমর্থন ও অংশগ্রহণ থেকে আমরা মানুষ মহানবী (সা)র কর্ম কৌশলের অনুপম নৈপুণ্যের প্রমাণ পেতে শুরু করি।

নবুয়ত প্রাপ্তির আগে গোত্রীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিশেষত ফিজার যুদ্ধোত্তরকালে তরুণ মহানবী (সা)র সমাজসেবা ও সাংগঠনিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচী থেকেও আমরা তাঁর গণমুখিতার নীতির প্রমাণ পাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত গোত্র, পর্যদস্ত জনগোষ্ঠী ও অনাথ, পিতৃহীনের পুনর্বাসন সংস্কার ইত্যাদি তো সর্বপ্রথম তিনিই আরবদের শিখিয়েছেন। "হিলফুল ফুজুল বা ফজলগণের অঙ্গীকার" তাঁর সামাজিক কর্মসাধনারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তার লাইম লাইটে উঠে আসাও কি একজন উদীয়মান জননেতা ও যুব ব্যক্তিত্বের সুচিন্তিত কর্মকৌশলের প্রমাণবহ নয়?

হযরত নবী করীম (সা) পিতৃব্য আবু তালিবের ঘরে দিনযাপন করলেও ব্যক্তিগত কর্ম ও দায়িত্ব থেকে তিনি কখনোই পিছিয়ে থাকেন নি। চাচার ঘরোয়া কাজে অংশগ্রহণ এবং তাঁর পেশাগত দায়িত্বে সহযোগিতা ইত্যাদি হযরতের মানবিক নৈতিকতারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চাচার সহযাত্রী হয়ে অখন্ড শামের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য যাত্রাও তরুণ মুহাম্মাদের সমাজ ও জীবন ঘনিষ্ঠতারই বহিঃপ্রকাশ। এরপর যখন চাচার সংসারের

www.pathagar.com

জানালা দিয়ে তিনি চোখ রাখলেন বাইরের বিশাল ভুবনে, দেখলেন জীবন সংগ্রামের আরো বিস্তৃর্ণ ময়দান। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদের বাণিজ্য-কাফেলার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হয়ে প্রচুর লাভ হলো বাণিজ্যে। বাণিজ্য কর্মীদের রিপোর্ট শুনে হযরত খাদীজা যুবক মুহাম্মাদের সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর অভিভাবক চাচা আবু তালিবের কাছে। বিয়ে হলো। হযরত এবার চাচার বাড়ি থেকে বিবি খাদীজার ঘরে স্থানান্তরিত হলেন, সাথে নিয়ে এলেন আদরের ছোট ভাই আলীকে। এবার তিনি হযরত খাদীজার ব্যবসায় ম্যানেজিং পার্টনার। মা খাদীজা হলেন যুবক মুহাম্মাদের নবুয়ত পূর্বকালীন কর্মতৎপরতার একনিষ্ঠ সহায়িকা। এভাবে কাটলো দেড় দশক। খাদীজার দেয়া ক্রীতদাস যায়েদ ইবন হারিসা এখন নবীজীর পুত্র বলে পরিচয় লাভ করেছে। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। মা খাদীজা, হযরত আলী আর যায়েদ ইবনে হারিসা ঘরের ভেতর সর্বাগ্রে প্রিয়নবীর উপর ঈমান এনে নতুন দ্বীনের প্রথম মহিলা, কিশোর ও ক্রীতদাস সদস্যরূপে ইতিহাসে আসন লাভ করেন। আর বাইরের পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি প্রিয়নবীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী বন্ধু হযরত আবু বকর (রা)। স্বাবলম্বী হওয়া, ঘরবাঁধা, জীবিকার উপায় অবলম্বন আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত গড়ার এ ধারাক্রম কি সুন্দর পরিকল্পনা আর উত্তম কর্মকৌশলের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না?

রাসূল আকরাম (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম আদিষ্ট হলেন, "আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।" ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে তিনি তাই নিজগৃহে খানার দাওয়াত দিয়ে জমায়েত করলেন কুরাইশের হাশেমী নেতৃবর্গকে। কথা পাড়লেন অতি বিনয় অথচ আত্মবিশ্বাসী বলিষ্ঠতার সাথে। কাজ হলো না বটে তবে কম্পন সৃষ্টি হলো। আবু কুবায়ত পর্বতে চড়ে পরবর্তী ঘোষণা দিলেন। ইসলামের প্রকাশ্য আহ্বান প্রচারের এ সূচনা লগ্নেও ব্যবহার করলেন ভাষা-বক্তৃতার এক নিটোল কৌশল। "আমি যদি বলি এ পর্বতের পেছন থেকে এক দুর্ধর্ষ শত্রুদল ধেয়ে আসছে তোমাদের তছনছ করে দিতে, তোমরা কি বিশ্বাস করবে না?" আরো বললেন, "এক জীবন কাটিয়েছি আমি আপনাদের হয়ে, আমাকে তো আপনারা সত্যবাদী ও বিশ্বাসীরূপেই দেখেছেন।" এভাবে মনো-চৈতনিক ক্ষেত্র তৈরি করে তবে দিয়েছেন নতুন বার্তাটি। এ সবই ছিল নবীজীর কাজের সৌন্দর্য, প্রাণপূর্ণ কর্মকৌশল।

ইসলাম প্রচারে বাধাবিঘ্ন যখন চরমে— আরকাম ইবনে আরকাম (রা) এর ঘরে গোপনে তখন প্রিয়নবীর মিশন চলছেই। রাতের আঁধারে নতুন মুসলমানেরা সমবেত হয় এই ঘরে, আবার ফর্সা হওয়ার আগেই তাদের ফিরে যেতে হয় নিজ নিজ ঠিকানায়। হুযুর দোয়া করেন, "হে আল্লাহ, খাত্তাবের পুত্র উমর অথবা আবুল হিকাম উমর, এদের একজনকে আমার সাথে কাজে লাগিয়ে দিন।" প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্বিনীত উত্থান ছাড়া শান্ত নিরীহ ও সরল মানুষের এ ছোট্ট কাফেলাটি অবরোধ ভাঙতে পারছে না, আঁচ

www.pathagar.com

করতে পেরেই হুযুর এ দোয়া করেছিলেন এবং খাত্তাব-পুত্র ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যক্তিগত প্রভাব মিশিয়ে দার আরকামের গোপন নামাযকে নিয়ে কায়েম করে দিয়েছিলেন কাবা প্রাঙ্গণে।

হিজরতের প্রাক্কালে নিজের বিছানায় হযরত আলী (রা)কে শুইয়ে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যেন কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ আমাদের গচ্ছিত আমানত টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি সাথে নিয়ে বিদেশ চলে গেছে। আর মদীনায় যাওয়ার পরিচিত পথটি মক্কা থেকে উত্তর দিকে চলে গেলেও হুযূরের হিজরতের রাস্তাটি ঐতিহাসিকেরা স্থির করেছেন দক্ষিণমুখী রূপে। মজার বিষয় হলো, সওর গিরিগুহায় ঘুর পথে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার লক্ষ্যে হুযুর বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী রাস্তা। মনে হয় যেন, তিনি ইয়ামন বা হাদ্রামাউত যাবেন বলে মক্কা ছাড়ছেন। কর্মকৌশল তো এখানেও আমরা দেখতে পাই।

মদীনার পথে এক লোক হযরত আবু বকর(রা)কে বলে, "আপনার সাথী লোকটাকে তো চিনলাম না!" সিদ্দীকে আকবার খুবই সতর্কভাবে সাবধানী জবাব দিলেন, "ইনি? ইনি আমার রাহবার। পথ দেখানো তাঁর কাজ।" শংকা কেটে গেলে হুযুর মৃদু হেসে হযরত আবু বকর-এর এই রহস্যময় উত্তরে হর্ষ প্রকাশ করলেন। লোকটি বুঝতে পেরেছে, হুযুর বোধহয় আবু বকরের মরু-ভ্রমণের পেশাদার কোন পথপ্রদর্শক। আর হযরত আবু বকর প্রিয়নবীকে নিয়ে নিরাপদে মদীনা পৌঁছানোর ব্যাকুলতাও কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রিয়নবীর মূল পরিচয়। ইনি তো সত্যিই রাহবার। সত্য পথের দিশারী। বাচনিক কৌশলের এ ঘটনার প্রতি ব্যক্ত সমর্থন থেকে আমরা নবীজীর আদর্শের প্রাণময়তার সন্ধান পাই।

মদীনায় হিজরতের বহু পূর্বেই মুসআব ইবন উমায়র (রা)কে ইসলামী আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয় এবং হজ্জ মওসুমে মদীনা থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে চুক্তির মাধ্যমে মদীনায় যখন প্রিয়নবী (সা)র পূর্ণ পরিচিতি ও তাঁর আনুগত্যের প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হয় তখনি আল্লাহর নির্দেশে তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ সেই নগরীতে হিজরত করেন। হিজরতের পর বিভিন্ন গোত্র ও বংশের পাড়ায় আবাস গ্রহণের জোরদার আবেদন একটি সমস্যা রূপে দেখা দিলে হুযুর (সা) সংকট নিরসনে উটের গতি বা ইচ্ছার সাহায্য নেন। তিনি বলেন, এর পথ ছেড়ে দাও, এ উটনীটিই আল্লাহর আদেশক্রমে সঠিক স্থানে গিয়ে থামবে। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা) যখন রাসূলে করীম (সা) এর বসবাসের জন্য নিজের দ্বিতল গৃহটি ছেড়ে দিচ্ছেন তখন হুযুর বললেন, আমার জন্য উপরে নয়, নিচের অংশটিই খালি করে দাও। লোকজন আসবে, বৈঠক হবে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে উপরের কোঠায় থাক। মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য যে জায়গাটি ক্রয় করা হয়, এটি সাহল ও সোহায়ল ভ্রাতৃদ্বয় বিনা পয়সায় হুযুরকে দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। পিতৃহীনদের দান নিয়ে ইসলামের প্রথম

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় মসজিদ নয়, টাকা দিয়েই এটা কিনতে হবে। সহল ও সোহায়ল বিনিময় গ্রহণ করলো।

গোত্রীয় অসন্তোষ নিরসনে উটের ইচ্ছার উপর জোর দেয়া, বসবাসের জন্য আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহের বহির্মুখী ও নিচের অংশ নির্ধারণ এবং নির্মাণে অনাথদের জমি নগদ মূল্যে ক্রয় ইত্যাদি কর্মকৌশল নিঃসন্দেহে নিপুণ তাৎপর্যপূর্ণ।

হিজরত-উত্তরকালে মদীনায় ইসলামী সমাজ কায়েমের সূচনাপর্ব ছিল মুহাজিরদের পুনর্বাসন। মদীনাবাসী আনসারীদের একজনকে একজন মুহাজিরের দায়িত্বভার দেয়ার সুন্দর সহজ নিয়মে যে চিরন্তন ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন রচিত হয় তার প্রভাবে গোটা ইসলামী যুগেই তার সুফল প্রভাব অব্যাহত রাখে। এতে করে মদীনা শরীফে শরণার্থী শিবির বা সমাজবিচ্যুত অভিবাসন গড়ে ওঠেনি যা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক ঘটনা। মদীনার প্রাচীন গোত্রগুলো, নানা ধর্মাবলম্বী নাগরিক, বিভিন্ন পেশার অধিবাসী নিয়ে হুযুর একটি ঐতিহাসিক 'সমঝোতা স্মারক' রচনা করেন যা 'মদীনা সনদ' নামে আখ্যা পায়। এই সামাজিক সংবিধান ছিল দল- গোত্র-ধর্ম স্বার্থ পেশা ও নীতি নির্বিশেষে সকল মদীনাবাসীর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দলিল। এই কাজটি বিশ্বনবীর কর্ম-পরিকল্পনা ও কৌশলের প্রকৃষ্টতম প্রমাণরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি।

মদীনার নগর-কর্তা হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর সাথে ইয়াহুদী, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদেরও সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থেকে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ এবং বিশ্বশান্তির ধারণা পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। প্রতিরক্ষা, সামাজিক সুবিচার, পেশাগত স্বাধীনতা, নৈতিক স্বকীয়তা, ধর্মীয় স্বাধিকার ও নাগরিক আনুগত্য বা শৃংখলার মূলমন্ত্র নিয়ে রচিত হয় এই বহুজাতিক বহুমাত্রিক দলিল। এর মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল ইসলামের ধর্মীয় জিহাদে অমুসলিম নাগরিকদের সামাজিক অংশগ্রহণ। অমুসলিম মুনাফিকদের দল নিয়ে প্রিয়নবী যাত্রা করেছিলেন হক-বাতিলের লড়াইয়ে। ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছার পথেই দুর্বলচেতা মুনাফিকরা কেটে পড়ে, তথাপি হুযুর এদের প্রকাশ্যে সমালোচনা, বহিষ্কার বা বিচার করেন নি- কেননা ঐক্য, সংহতি ও সামাজিক শৃংখলা একজন শাসকের ভাবমূর্তিকে শত্রুশক্তির সামনে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী রূপে তুলে ধরে থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাতী তৎপরতার সংবাদ শত্রুদের মাঝে সাহস বৃদ্ধি করে।

মক্কার মুশরিকরা মদীনায় আক্রমণ পরিচালনা করে প্রিয়নবীর নব অংকুরিত সুখী সমাজের ভিত্ তছনছ করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্থ রসদ ও অস্ত্রের যোগান দেয়ার জন্যে তারা যৌথ বাণিজ্যের কাফেলাসহ আবু সুফিয়ানকে অখণ্ড শামে পাঠায়. ফেরার পথে আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপর আক্রমণ চালনার মাধ্যমে শত্রুর সমরশক্তি বিনাশ এবং নিজেদের ফেলে আসা সম্পদ ও অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে মদীনার প্রতিরক্ষা বাহিনী ঘুরে বেড়ায় মক্কা-সিরিয়া মহাসড়কে। গোপনে খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্র তীর বেয়ে মক্কায় পৌঁছে যায়। কিন্তু আক্রমণের নেশা তাকে

www.pathagar.com

আবারো টেনে আনে নিরীহ মদীনার পানে। বদর প্রান্তরে যুদ্ধ বাধে। এরপর আবার সংঘটিত হয় ওহুদের রক্তক্ষয়ী সংঘাত। হুযুর রণক্ষেত্রে সৈন্য বন্টন, কাতারবন্দী, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, ঘাঁটি প্রহরা ইত্যাদির তদারক করেন পরম নৈপুণ্য ও দক্ষতার সাথে।

সকল বিরোধী শক্তির সমন্বিত অভিযান, আহযাবের যুদ্ধে প্রিয়নবী (সা) তাঁর মর্যাদাবান অনুচর ইরানের সালমান (রা) এর পরামর্শে গ্রহণ করেন আরব বিশ্বের অভিনব সমর পদ্ধতি। পরিখা খননের মাধ্যমে অরক্ষিত সীমান্তে ব্যারিকেড সৃষ্টির প্রয়াস, যা আরবীয় যোদ্ধাদের জন্য ছিল বিস্ময়কর। এ ছাড়া প্রতিটি কাজে, সাধনায়, সংগ্রামে সাধারণ সৈনিকদের সাথে, সরল নাগরিকদের সাথে মহানবীর উদার অংশগ্রহণ, কাজের স্পৃহা গতি ও উৎকর্ষকে করে তুলতো বহুগুণ তেজি ও উজ্জ্বল। খন্দক বা পরিখা খননের সময় সাহাবীরা ক্ষুধা-তৃঞ্চার অবস্থাকে হুযুরকে অবহিত করলে তিনি নিজের পেটের কাপড় উঠিয়ে প্রদর্শন করেন, ক্ষুধা-কাতর দেহকে সোজা রাখার প্রয়োজনে বাধা দু'খানা পাথর। ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পরিখা খননে কোদাল চালনায় ছিটকে পড়া পাথরখন্ডের উপর থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে "আমি পারস্য সম্রাটের রাজকীয় প্রাসাদ দেখতে পাই।" এ সবই তোমাদের করতলগত হচ্ছে অচিরেই।"

শক্রর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎসে আঘাত, আক্রমণাত্মক দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই, সহচরদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো, ভিনদেশী প্রক্রিয়া-প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্ম-তৎপরতায় নিজের অংশগ্রহণ ইত্যাদি থেকেও উত্তম কর্মকৌশল ও সুন্দর পরিকল্পনার নিদর্শনই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বদরের বন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ পরিশোধে অক্ষম, তাদের জন্যে হুযুর শর্ত জুড়ে দেন, ওরা প্রত্যেকে যেন মদীনার দশ জনকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলে এই হলো তাদের মুক্তিপণ। এ কেমন কর্মনৈপুণ্য! কত সুন্দর সমাধান! হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কৌশলগুলো ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। হুযুর সহস্রাধিক সাহাবীকে নিয়ে মক্কা সীমান্তে হুদায়বিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন। হযরত উসমান (রা) গেলেন মক্কার নেতৃবর্গের সাথে বৈঠকে। প্রস্তাব ঃ এ বছর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সহচরদের নিয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ তথা উমরা করবেন। আত্মরক্ষার তরবারি তাদের কোষবদ্ধ থাকবে। সমরসজ্জা থাকবে না। কিন্তু না; কাফিররা এতে রাজী হলো না। হুদায়বিয়ার নেতা সোহায়ল এলো সন্ধি চুক্তি সই করতে। শর্তঃ এ বছর নয়, আগামী বছর উমরা করবেন তাঁরা। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কাওয়ালাদের হাতে তুলে দিতে হবে তবে কেউ মদীনা থেকে মুরতাদ হয়ে মক্কায় এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না ইত্যাদি।

উমরা ও মাতৃভূমি ভ্রমণের উদ্বেলিত উৎসাহে বিপত্তি আর বিনীত সন্ধিচুক্তির শোকে সাহাবীরা ক্ষুব্ধ এবং শোকাহত। হযরত উমর উচ্ছ্বসিত আবেগে আপ্লুত হয়ে নবীজীকে

www.pathagar.com

জড়িয়ে ধরে অবুঝ শিশুর মতো বলে উঠলেন, "হে নবী! আমাদের মিশন কি সত্যনিষ্ঠ নয়, আপনি কি সত্যনবী নন? তবে কেন এত অবমাননা, এত গ্লানি স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে আমাদের?" অব্যক্ত উচ্চারণে নব সাহাবী সোচ্চার- 'মর্যাদার লড়াইয়ে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত।'

অপূর্ব ধৈর্য ও অফুরন্ত স্থিরতা। শান্ত-স্থির অবয়বে আনত নয়নে প্রিয়নবী (সা) কেবলই অন্তরমুখী। এতেই রয়েছে আমাদের সুস্পষ্ট বিজয়। মহাপ্রাপ্তি। এখানে মুক্তি নয় যুক্তির হবে জয়। আবেগের নয় ত্যাগের। প্রাবল্যের নয় বিনম্রতার- সদাচারের।

তিনি সাহাবীদের বললেন, এখানেই মাথা মুড়িয়ে বা ছেঁটে পশুগুলো কোরবানী করা হোক। শোক ও অবদমিত উদ্বেলতায় সব অনড় নিশ্চল। হুযুর তাঁবুতে গিয়ে বিবি উম্মে সালামাকে বললেন, ওরা যে আমাদের নির্দেশ শুনছে না। কি সর্বনাশ! যদি আল্লাহর গযব নেমে আসে! বিবি বললেন, "আপনি মৌখিক নির্দেশ আর দেবেন না। নিজে গিয়ে এ আমলগুলো শুরু করে দিন, দেখবেন জানবাজ সাহাবীরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে এক নিমিষেই।" আর হলোও তাই।

হুদায়বিয়া থেকে হুযুর ফিরে এলেন। দু'টি বছরও ঘুরেনি। এরি মধ্যে এ সন্ধিচুক্তির সপ্লাবি সুফল ইসলামকে বহু দূর এগিয়ে নিয়েছে। দু'হাজারের কম সাথী নিয়ে হুদায়বিয়ার অভিযাত্রী এবার দশসহস্র সঙ্গী নিয়ে চলেছেন মক্কা জয়ে। আল্লাহ কতই শক্তিমান, কত মহান!

শত্রুর সাথে সংঘাতের চেয়ে কৌশলগত সমঝোতা ভালো। নীতিহীন প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তিই উত্তম, কেননা এটা তারা সহজেই ভঙ্গ করে এবং বিরোধী পক্ষকে অ্যাকশানে যাওয়ার বৈধতা দিয়ে দেয়। নিপীড়িত হয়ে জনসমর্থন পাওয়া সহজ, আক্রমণের চেয়ে বিনম্র প্রত্যাবর্তন এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে সংগঠনকে গণমুখী করে। এসব কর্মকৌশলের ফলে হুদায়বিয়ার আপাত নতজানু সন্ধি বৃহত্তর ও চূড়ান্ত বিজয়ের ভূমিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। সহকর্মীদের উচ্ছ্বসিত আবেগ নিরুত্তরে স্তিমিত করে সময়ে এর সঠিক ব্যবহার প্রকৃত নেতার জন্যে অবশ্য অপরিহার্য। কৌশলগত প্রয়োগে এ আদর্শও কম গুরুত্ববহ নয়।

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা, আল্লাহ্‌র ঘরে আশ্রয় লাভকারীদের সুরক্ষা, অস্ত্র সংবরণকারী স্বগৃহে অবস্থানকারীদের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি এককালের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের বাড়িকেও নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করা কত বড় কৌশল ছিল তা কি বলে বুঝাতে হয়! হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বন্টনে নওমুসলিম, মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অতীত প্রতিপক্ষ পরিবারের 'নববন্ধু' সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান কৌশল ও প্রজ্ঞার সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে পড়ে।

তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসকবর্গ এবং প্রাদেশিক গবর্নরদের প্রতি পত্র দেয়ার মাধ্যমে তাদের সাথে ইসলামের প্রথম লেনদেন, শান্তি-যুদ্ধ ও আন্ত

www.pathagar.com

র্জাতিক সম্পর্কের সূত্রপাত করে দিয়ে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার, খলীফাগণের কর্মপন্থা নির্দেশ করে গিয়েছেন। আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে প্রদেশভিত্তিক শাসক, বিচারক, রাজস্ব আদায়কারী, শিক্ষা-সংস্কৃতি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে এগিয়ে যাওয়ার পথ ও প্রেরণা দিয়ে যান। শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, আন্ত র্জাতিক বিষয়াদি, বিচার, কৃষি, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও সমর বিষয়ক দফতর প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর সকল দায়িত্ব সমাপ্ত করে হযরত আবু বকর (রা)-কে জাতির ইমাম নিযুক্ত করে যান। খোলাফায়ে রাশেদীনকে দিয়ে যান অনুসরণীয় আদর্শের প্রবক্তার স্বীকৃতি। বলে যান ঃ "দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমাদের জন্যে। এই দু'টি শক্ত করে আঁকড়ে থেকো-পথচ্যুত হবে না। এক. আল্লাহর কিতাব, দুই. আমার সুন্নাহ।" বিদায় বেলায় দিয়ে গেলেন দীনের পূর্ণতার ঘোষণা। শেষ ভাষণ পরিগণিত হলো মানবতার মুক্তির চূড়ান্ত সনদরূপে।

তেইশ বছরের নবুয়তি কর্মসাধনার স্বর্ণসৌধ যখন নিটোল পূর্ণ তখন বললেন, "প্রধান বন্ধুর সাথে।" মিলিত হতে চাই আল্লাহ রফীকে আ'লার সাথে। এরপর পার্থিব জীবনাবরণ থেকে মাকামে মাহমুদের পথে মহাযাত্রা।

প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি, ওহীর দ্বারা পরিচালিত নবী-জীবনের কর্মকৌশলের ও পরিকল্পনার গুরুত্ব একেবারেই শূন্য। সকল নবী-রাসূলের বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। সুতরাং বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে আর আলোচিত জীবনের পবিত্রতম নাজুকত্বে এ নগণ্য অধম দারুণ উৎকণ্ঠিত। তথাপি আড়ষ্ট ভীরুতার কালিতে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলাম প্রিয়তমের জীবনের আলোকময় কিছু কর্ম ও পদক্ষেপের বাহ্যিক নৈপুণ্য ও কৌশল। আমার অনিচ্ছাকৃত কোন অবমূল্যায়ন বা অনুভব - অভিব্যক্তির হীনতা যেন স্পর্শ না করে মহান রাসূলের পদধূলিকেও। পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নিয়ে কলম ধরার প্রেরণা অবশ্য পেয়েছি আল্লাহপাকের এ বাণী থেকে- "যিনি তাঁর রাসূলকে নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের সামনে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তিলাওয়াত করবেন, তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করবেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন।" 'হিকমত' শব্দটির ব্যাপক অর্থের মাঝে কর্মকৌশলও যে রয়েছে এতে হয়ত কেউই ভিন্নমত পোষণ করবেন না। ■

www.pathagar.com

উপমহাদেশে সীরাত চর্চা

নাসির হেলাল

❑

উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস আদিকাল থেকে। বিভিন্ন ভাষায় মানুষের বসবাস এ উপমহাদেশকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। নানা জাতিগোষ্ঠী, নানা ভাষা হওয়ার কারণে ছোট ছোট প্রশাসনিক এলাকায় এ ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল। জাতিতে জাতিতে বিভেদ ছিল প্রবল। রাজায় রাজায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ছিল এলাকার মানুষের জন্য বিধিলিপি। অশান্তির আগুন যখন অত্র এলাকাকে গিলে ফেলেছিল ঠিক সে সময়ে এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলাম সবসময় ঐক্যে বিশ্বাসী। ভালকে ভাল বলে গ্রহণ করার উদার মানসিকতা ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের ঐতিহ্য। এ জন্য ইসলাম যেখানেই বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রবেশ করেছে, সেখানকার রীতি রেওয়াজকেও (শির্ক নয় এমন) গ্রহণ করেছে। উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাসূল (সা) প্রচারিত ও প্রদর্শিত ঐক্যের আদর্শ নানা মতের, নানা ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত করে। এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম জনপ্রিয় ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপমহাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে।

পৃথিবীতে প্রচলিত ছোট বড় প্রায় সব ভাষায়ই রাসূল (সা)-এর জীবনী রচিত হয়েছে। একথা অকাট্য সত্য যে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আর কোন নবী-রাসূল বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ওপর তা হয়নি। এমনকি বিষয়টি এমন যে রাসূল (সা)-এর ওপর রচিত গ্রন্থের তুলনায় অন্য ব্যক্তিত্বের বিষয় এতটাই নগণ্য যে তা আলোচনায় না আনাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উপমহাদেশে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলো হলো- উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, অসমীয় প্রভৃতি। এর মধ্যে উর্দুভাষা সব থেকে সমৃদ্ধ ভাষা এবং উর্দু সাহিত্যও সমৃদ্ধ সাহিত্য। বলো চলে ইসলামী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষা উপমহাদেশে বিশাল অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। সীরাত চর্চার ক্ষেত্রেও উর্দু ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে অফুরন্ত ভাণ্ডার। আনন্দের বিষয় বাংলা ভাষা ও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলা ভাষায়ও সমৃদ্ধ ও আশাব্যঞ্জক সংখ্যক সীরাত সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট ভাষায়ও সীরাত সাহিত্য রচিত হয়েছে ও হচ্ছে।

www.pathagar.com

উর্দু ভাষায় সীরাত চর্চা

"ভারতীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উর্দু ভাষা এ সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্দু ইসলামী সাহিত্য ইসলামের বিশ্ব ভাষা আরবীয় থেকে দুর্বল নয় কোনো অংশে। এর কারণ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত উর্দু ছিল গোটা উপমহাদেশের জাতীয় ভাষা। অর্থাৎ যোগসূত্রের মাধ্যমই ছিল উর্দু। উর্দু চর্চার ক্ষেত্র ছিল সর্বব্যাপী। ফলে প্রতিটি অঞ্চলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এ ভাষায় তাদের সৃজনশীল অবদান রাখতেন। বিশাল উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই ছিল এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। আর এটা খুবই বাস্তব সত্য, যে ভাষায় গোটা ভূখণ্ডের, গোটা জাতির বৌদ্ধিক সৃজনশীলতা প্রকাশিত হয় সে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধতম হয়। এতে সন্দেহের অবকাশও খুবই কম। সবদিক থেকে প্রবাহিত ছোট ছোট স্রোতধারা অবশেষে মিলিত হয়ে যেমন মহানদীর সৃষ্টি করে উর্দু ভাষার ইসলামী সাহিত্যও তেমনি। সুতরাং ইসলামী সাহিত্যের জগতে আরবীর পরে উর্দুই সমৃদ্ধতর ভাষা।" (ইসলামী সংস্কৃতি, বিশ্বনবী সংখ্যা– আবু রিদা সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৪)।

উর্দু ভাষাতে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত সীরাতের ওপর প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গদ্য ও কবিতায় মহানবী (সা)-এর ওপর এত গ্রন্থ উর্দুতে রচিত হয়েছে যে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। "হিজরী একাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উর্দু ভাষায় সীরাতে রাসূলের উপর কাব্যগ্রন্থ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু উর্দু গদ্যে সীরাতে রাসূল (সা) রচনা আরম্ভ হয় তারও পরে। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উর্দু গদ্যে সীরাত সাহিত্য রচনার খবর মেলে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রাচীন উর্দু সাহিত্যে সীরাতুন নবী (সা)-এর ওপর রচিত বেশীরভাগ গ্রন্থই কবিতায়। কারণ, তদানীন্তন সময়ে গদ্যের চাইতে পদ্যের প্রভাব ছিল বেশী। উর্দুতে মীলাদনামা, মিরাজ নামা, ওফাত নামা, শামায়েল নামা এবং নূর নামা ইত্যাদি হচ্ছে নবী কারীম (সা)-এর মুবারক জীবনের উপর গ্রন্থ রচনার উৎকৃষ্ট দিক বা উপাদান এবং এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সীরাতে নববীর ওপর বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ।

এসব গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখানে উর্দু ভাষায় রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থের উল্লেখ করছি– 'সীরাতুন্নবী'– সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খৃ.)। ৬ষ্ঠ খণ্ডে সমাপ্ত এ বিশাল সীরাত গ্রন্থের দু'খণ্ডের কাজ শেষ না হতেই আল্লামা শিবলী নোমানী ইন্তেকাল করেন। এরপর সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ঐ অসমাপ্ত দ্বিতীয় খণ্ডসহ ৬ষ্ঠ খণ্ডের কাজ সমাধা করেন। এ সীরাত গ্রন্থটিকে সীরাত বিষয়ক নির্যাস বলা হয়। 'রহমাতুল্লিল আলামীন'– কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপুরী। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯১২-১৯২১ খৃ. মধ্যে প্রকাশিত হয়। লেখক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে নবী (সা)-এর সঠিক জীবনপঞ্জী রচনার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সীরাতকার সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ভূয়সী প্রশংসা করেন, এমনকি ৩য় খণ্ড প্রকাশের সময় নদভী সাহেবের একটি দীর্ঘ অভিমত সংযোজিত হয়। 'সীরাতুল মুস্তাফা'–

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দাহলভী, ১৫৩৩ পৃ. এ বিশাল গ্রন্থটি ৩টি খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে নানা ধরনের ভ্রান্তিরও তিনি অপনোদন করেছেন। 'আবতাবই নবুয়ত'– মাওলানা হাফেজ ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়ব দেওবন্দী (জ. ১৩১৫ হি.); সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া'– মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬ খৃ.); 'তাযকিয়ায়ে মুহাম্মদী'– মাওলানা আযাদ সুবহান; 'কাছিদায়ে উজমা'– মাওলানা আমীনুল্লাহ আজীমাবাদী (মৃ. ১২৩৩ হি.); 'নূরে মুহাম্মদী (সা)'– মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫-১২৯০ হি.); 'সীরাতে হাবীব ইলাহী'– মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুহাদ্দেসী বরকতী (জ. ১৯১১ খৃ.); 'সীরাতে পাক'– মাওলানা সৈয়দ আবদুল আহাদ কাছেমী (জ. ১৯২৯ খৃ.); সীরাতে মোস্তফা'– মাওলানা ওবায়দুল হক (জ. ১৯২৮ খৃ.); 'খুৎবাতে আহমদীয়া'– স্যার সৈয়দ আহমদ; 'রাসূলে আকরাম কি সিয়াসী জিন্দেগী'– ডক্টর হামীদুল্লাহ; 'আল নবীয়্যুল খাতিম'– মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী; 'খুৎবাতে মদ্রাজ'– মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী' 'সীরাতে সারওয়ারে আলম'– মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৩০-১৯৭৯), গ্রন্থটি মাওলানা মরহুম শেষ করে যেতে পারেননি। হিজরত পর্যন্ত লেখার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে নঈম সিদ্দিকী ও আবদুল ওকীল উলুবীর সম্পাদনায় এ বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'মুহসিনে ইনসানিয়াত'– নঈম সিদ্দিকী; 'নশরুৎ তীব ফী যিকরীন নাবিয়্যিল হাবীব (সা)'– মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র); 'মাকালাতে সীরাত'– ডক্টর মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়াই, 'আখলাকুন নবী'– মাওলানা ইউসুফ বিনুরী; 'তাওয়ায়ীখে হাবীবে এলাহী'– আন্দামানবন্দী মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরভী; 'হাদীয়ে আলম'– ওলী রাযী; 'ফাৎহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন'– মাওলানা মুহাম্মদ মুশহিদ বাইয়মপুরী (র); 'হাদীছে দেফা'– মেজর জেনারেল আকবর খান, প্রভৃতি।

তামিল সাহিত্যে সীরাত চর্চা

জানা যায় তামিল ভাষায় সীরাত কেন্দ্রিক বেশকিছু গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু এগুলোর কোন কপি বা শিরোনাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে তামিলনাড়ুতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর আগে থেকেই সেখানে একেশ্বরবাদী বা তৌহিদবাদীগণ বসবাস করতো। তিরুমূলার নামক জনৈক তামিল সাধু রচনা করেন 'তিরুভাসাকাম' নামে একটি পুস্তিকা। যাতে তিনি বলেন, ঈশ্বর এক; অদ্বিতীয় (তামিল ভাষায়– অন্ত্রে কুলাম; অবুভানে দিভান)।

অন্য একজন বিখ্যাত তামিল সাধু তিরুভাল্লুবার ঈশ্বরকে দেবতার আসনে বসাননি বা মনুষ্যাকারেও কল্পনা করেননি, উপরন্তু ঈশ্বরের এমন সব গুণ উপস্থাপন করেছেন যা কেবল আল্লাহর গুণাবলীর সাথেই কমবেশী মিলে।

১২শ শতকের আগে তামিল ভাষায় রাসূল (সা) সম্বন্ধীয় কোন রচনার কথা জানা যায় না। তবে মুসলমানদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ১২শ শতক থেকে তামিল ভাষায় কিছু কিছু ইসলামী সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্রাবিড় আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পর রাসূল (সা) সম্বন্ধে অমুসলিমরা ও আগ্রহী হয়ে

www.pathagar.com

ওঠে। এমনকি এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ই. ভি রামস্বামী ইসলামের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন, বক্তৃতা বিবৃতি দেন এবং শেষমেষ ১৯৪৭ খৃ. ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৮ শতকে উমারু পুলাভার রচনা করেন তামিল মহাকাব্য 'সীরাহ পুরাণম'। এ সময়ে তামিল সাহিত্যে সীরাত বিষয়ক রচনার হিড়িক পড়ে, বলা চলে মোটামুটি একটি প্রতিযোগিতা চলেছিল। অনেক অমুসলিম কবি এ বিষয়ে মুসলিম কবির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেখ আবদুল কাদির নাইয়ানার রচিত এক খণ্ড পুস্তক এ সময়ে সংগ্রহ করেন উবাথেসীয়া বালাভা মুদালিয়ারের পুত্র সেলভারাইয়ান।

তামিল গদ্য সাহিত্য জনপ্রিয় হয় ১৯ শতকে এসে। এ সময়ে সীরাত বিষয়ক বেশ কিছু বইপত্র রচিত হয়।

ই ভি রামস্বামীর শিষ্য ড. সি. এন অন্নদুরাইও রাসূল (সা)-এর প্রশংসা করেন এবং নিজেকে তাঁর শিষ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি তৌহিদপন্থী বলেও ঘোষণা করেন। রাসূল (সা) সম্পর্কিত তার বহু বক্তৃতামালা "নামিগাল নয়াঙ্গাম পরতি আন্না' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

মুল্লাই মুথাইয়া নামক জনৈক তামিল পণ্ডিত রাসূল (সা)-এর ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অপরদিকে ঈদে মিল্লাদুন্নবী (সা) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দ্রাবিড় আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও তেজস্বী বক্তা মি. কালিমুথুর দেয়া বক্তৃতা সংগ্রহ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

রাসূল (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনধারার ওপরে দু'টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যার রচনাকার যথাক্রমে শিবানুসারী হিন্দু সাধু মাদুরাই আথীনামের ও তামিল অধ্যাপক তামিল আবনান।

এছাড়া রাসূল (সা)-এর পৃথক পৃথকভাবে আরও গ্রন্থ রচনা করেন ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য ডঃ ভালামপুরী জন, রিপাবলিকান পার্টির রাজ্য সভাপতি ড. সিপান এবং বৌদ্ধ সাধু স্বামী অন্নধা।

জানা গেছে উল্লিখিত গ্রন্থ/পুস্তিকাগুলো "ফ্রেটার্নিটি পাবলিকেশন্স' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তেলেগু ভাষায় সীরাত চর্চা

দক্ষিণ ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই অন্ধ্ররাজ্যে ইসলামের আবাদ শুরু হয়। তেলেগু ভাষায় প্রথম দিককার সীরাত চর্চা বিষয়ক গ্রন্থগুলোর বা কাজের তেমন কোন তথ্য উদ্ধার হয়নি। গভীরভাবে গবেষণা করলে হয়ত তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রায়ালাসীমার এবং উপকূলীয় অন্ধ্ররাজ্যের মুসলমানেরা তেলেগু ভাষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে এবং সাহিত্যের ভাষা হিসেবে পাঠ শুরু করে। ফলে মুসলমানদের ভেতর থেকে বেশ কিছু তেলেগু ভাষার পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। তারা সীরাত বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেন। এর মধ্যে সব থেকে সৃষ্টিশীল ও পাঠকনন্দিত কাজ করেন কুমবুমের (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলা) মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর (মৃ. ১৯৭১ইং)। তিনি প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সীরাত বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৭৭ সালে তেলেগু ইসলামিক প্রকাশন (Telegu Islamic Publications 1977) নামে একটি

www.pathagar.com

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। যে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৬০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সীরাত বিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে তাদের পত্রিকায় সাপ্তাহিক ও মাসিক 'গীতুরাই' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। ঐ বিশেষ সংখ্যাগুলোতে পরিকল্পিতভাবে নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

'প্রাচ্যের ইতালীয়' ভাষা তেলেগুতে আরও সমৃদ্ধ সীরাত সাহিত্য রচনার ব্যাপারে সেখানকার মুসলিম পণ্ডিতদের আরও পরিকল্পিত ভূমিকা রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

মালায়ালম সাহিত্যে সীরাত চর্চা

নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে ২১ হি./৬৬৪ খৃ. ২১ রজব তারিখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরব মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে মালিক বিন দিনার কদুনগাল্লুর বন্দরে আশ্রয় নেন। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবীয়রা সফরে আসতেন। কিন্তু এবারের সফরটি ছিল ভিন্ন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও এবার তারা আল্লাহ-রাসূলের বাণী সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং ছড়িয়ে দিলেন মালায়লেম ভাষাভাষী মানুষের কাছে। ইসলামের আলোয় কেরালার মানুষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

মালায়ালম ভাষার হরফ অনেক পরে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে প্রথম দিকে মুসলমানেরা মুখে মুখে মাপ্পিলাগীত গাইত। এ গীত সারা কেরালায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে আরবী হরফে মালয়গীত লেখার প্রচলন হয়। যে কারণে ১৮৬৮ খৃ. টেলিচেরিতে থিপ্পোথিল কুনজাম্মেদের মালিকানায় আরবী মালায়ালম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাপাখানাটিই কেরালার প্রথম ছাপাখানা।

অবশ্য এ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে মালায়ালাম মুসলিমদের প্রথম গ্রন্থ আহমদ কোয়া সাহেব রচিত 'সিব্বাগুন্নবী' বোম্বাই থেকে ছাপা হয়। এ সময়ে অন্য একটি আরবী-মালায়ালম গ্রন্থ ছাপা হয় পাঞ্জাব থেকে।

আরবী মালায়ালম ভাষায় রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– কাজী আবূ বকর কুঞ্জী (মৃ. ১৩০১ হি.)-র 'খাসিদাসুম ফী মাদহুন্নবী' এবং 'নূলমালা', গ্রন্থ দু'টি প্রথম মুদ্রিত গীত। এতে রাসূল (সা)-এর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অজ্ঞাত লেখকের রচিত দু'টি গ্রন্থ–'পুরানাপাত্তু' ও 'ত্রিক্কালিয়ানাম'। গ্রন্থ দু'টিতে যথাক্রমে– রাসূল (সা)-এর শৈশব ও স্বর্গীয় বর্ণনা রয়েছে। হাক্কানাপাত্তু (রচনাকাল ১২৭৯) ও মিয়ারাজপাত্তু (রচনাকাল ১৩৪৩) নামক কাব্যগ্রন্থ দু'টিতে রাসূল (সা)-এর জীবনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। একই নিয়মে মুসুমালা (১২৯৫ হি.) এবং ওয়াফাস কিস্সা (১৩০৩) গ্রন্থ দু'টি রচিত হয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ হলো কাস্যিয়ারাকাম কুঞ্জভা রচিত উম্মুহাত মালায় (১৩২৯); ভীরানকুট্টী ইবনু মুহাম্মদ কুট্টি রচিত 'মধ মাজীদ মালা' (১২৯৫) এবং 'সফর পাত্তু'।

কয়েকজন বিখ্যাত কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো গযবথ বদরুল খুবরা– চাক্কীরী মইনকুট্টি (মহান কবি); নবী কীর্থনম– এন. কুঞ্জীকমু মাস্টার; বদরী উধম ভাযহা খাল্লাইল আবদুল্লাহ

www.pathagar.com

কুট্টি; বদর, ওয়াফাথুন্নবী সি. কে. আভারই; মুয়েজিসাথুল মোহামদীয়া এদাথালা মইদুট্টি মুসলিয়ার; নবীচরিথম মনিপ্রাভালাম– সাইয়েদ গফুর শাহ; বদর অপ্পানা– নাল্লাম বীরান; মাক্কাম ফাথু– মনুথোদী চেরীয়া কুমজিপপোক্কার; গযভাথ ফাথাহু মাক্কাহ– মাচিলকাথ মইদীনমুল্লহ; টালুলাম, মুল্লা পুরানা পুথুমা– কট আপ্পারামবথ কুঞ্জী খাদির; হিজরা মুসলিময়ারাকাথ আহমদ কুট্টি মুসলিয়ার; হিজরা, খানদক পদ ফুথূহ তায়ীফ-কোদামবিয়াকাথ কুঞ্জী সীথি থাঙ্গল; তারীখ– মায়েবারী– মানজাম পিরাকাথ আবদুল আযীয প্রভৃতি। হিজরা, হুনাইন– কদর আহমদ; তবুক– মুহাম্মদ কুট্টি চুল্লীইল; হুনাইন– পন্নাই মালিয়াক্কাল কুনজাহমদ; মাক্কাম ফাতাহ– তনূর ভাদাক্কিনীয়াকাথ মইদীন কুট্টি মুল্লাহ; মুথাইয়ে উধম– ভলোচিরা মইদীন হাজী; বানূকুরাইলা– পারাপ্পানান গাদ খাইয়াথ এবং খায়বর– মুহাম্মদ কুট্টি মুল্লাহ গ্রন্থগুলো মর্মস্পর্শী ভাষায় পদ্যে যুদ্ধের বর্ণনা।

রাসূল (সা)-এর জীবনচিত্র কাব্য সাহিত্যে চিত্রিত করার জন্য যেসব কবি প্রশংসিত হয়েছেন তারা হলেন– টি. উবাইদ, পি. টি. আবদু রহীমন, পুন্না ইউরকুলাম, ভিগপ্প, পি. এম. এ. থাঙ্গল, ও. আবূ ও. এম. কারুভারাক্কুঞ্জু এবং আবদুল হাই এদাইউর।

সরাসরি মালায়ালম ভাষায় রচিত গ্রন্থ সাইয়েদ মকথী থাঙ্গালের নবীনানাইয়াম। এছাড়া মালায়ালম ভাষার প্রাথমিক যুগের সীরাতগুলো– 'সীরাথু রাসূল'– আবদুল্লাহ আল-ইয়ামনী; খ্রিস্টু প্রভাচিকা নবী মুহাম্মাদ থানে– সওয়ারাজে থিলেকুল্লু; ভাটি মুহাম্মদ থানে– ও মোহিন কুট্টি; আসাওয়াসা প্রদান- এস. মুহাম্মদ; মুহাম্মদ নবী– মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ থাঙ্গল; মুহাম্মদ নবযিদা মথরুকা জীভিথাম- এ. এম. আবদুল কাদির মৌলভী; অন্ধ প্রভাচাকান– এ. মুহাম্মদ কান্নু; মুহাম্মদ নবীউম নালূ খালীফামারুম– এ. এম. আবদুল কাদির আযহারী; নবীউম নালু যাকহাকালুম, মুহাম্মদ নবী– টি.কে মুহাম্মদ ভেলিয়ানকোডে; এ্যারেবিয়া জ্যোতিপম– ভাক্কাম পি. মুহাম্মদ মইদীন; অন্ধা প্রভাচাকম– কে. সি. কমুকুট্টি মৌলভী; মুহাম্মদ নবীযুদে জীভাচরিত্র সংগ্রাম, প্রভাচাকান মারুদে প্রভাশা– নাঙ্গল– আরাক্কাল মুহাম্মদ সাহিব; লোকগুরু– কাদির মুহাম্মদ মৌলভী; থিরুভেঝু থুকালিলে মুহাম্মদ– এ. এম. কাদির; রাসূল কারীম বিবিধ মন্ডলাঙ্গলিল– টি. পি. মাহমুদ; রাসূল কারীম– এম. মুহাম্মদ কান্নু; অন্ধ্যা প্রভাচাকন– পি. ভি. মুহাম্মদ; ফাথহুল বায়ান ফী যীরাথু নবীইল কারীম– কে. কে. মুহাম্মদ আবদুল কারীম; নবী যুদে চরিত্র পুস্তকাঙ্গল– সি. ভি. এ হাইড্রোসে।

সাম্প্রতিক সময়ে গত তিন/চার দশকে মালায়ালম ভাষায় রচিত ও অনূদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে– সিরুন্নবী (১৯৬৪)– আবদুল হাই; নবী চরিতম (১৯৬৫)– টি. মুহাম্মদ; রাসূল কারীম (সা. ১৯৭১)– পি. কে. কুনহী বাভা মুসলিয়ার; আল্লাহু ভিন্দে প্রভাচাকান (১৯৭৩)– এ মুহাম্মদ সাহিব; রাসূল কারীম (১৯৭৪)– মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম, তরজমা : কে. সি. কমুকুট্টি মৌলবী; নবীথুদে হীভিথাম (১৯৭৯)– আবূ সালীম আব্দুল হাই; তরজমা : ভি. এ কবীর; কাবালায়ম (১৯৮১)– মৌলবী পি. আবূ বাকের হাজী; কুদুমবাস/পদনম (১৯৮৩); শামশানুয়াল মারুপাদিকল (১৯৮৫); স্টীমে (১৯৮৬); ১০০ চাধুঙ্গ (১৯৮৬); আল্লাহু আকবর তো আসসালামু আলায়কুম (১৯৮৯) এবং আল-

www.pathagar.com

ইনসানুল কামিল (১৯৯০) শিরোনামের গ্রন্থগুলো মৌলবী পি. আবূ বাকের হাজী রচিত। এছাড়া মুহাম্মদ (সা)– অধ্যাপক সাইয়েদ ইব্রাহীম, তরজমা : পোক্কার কোদালূন্দী; মুহাম্মদ নবী ওরু লাখু চরিতম– অধ্যাপক কামাল পাশা : মুহাম্মদ হুসায়ন হাইকল, তরজমা : কে. পি. কামালুদ্দীন ও ভি. এ. কবীর প্রভৃতি।

ওড়িয়া সাহিত্যে সীরাত চর্চা

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে মোগল দরবারের সাথে ওড়িষ্যার সাংস্কৃতিক বন্ধন রচিত হয়। ওড়িষ্যায় বসবাসরত হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতার স্বাক্ষর বহন করে আসছে সেই গোড়া থেকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে ওড়িয়া সাহিত্যে সীরাত চর্চার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টা। বহু হিন্দু লেখক কবি, সাহিত্যিকই স্বেচ্ছায় সীরাত চর্চায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন ও রাখছেন।

১৭৭৫ সালে কটকে ও বালাসোরে কদম-ই-রাসূল স্থাপিত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান এ স্থানটি পবিত্র জ্ঞানে দর্শন করে। কটকের মৌলবী মৌলবী মুহাম্মদ মানসুর রচিত 'কোরআনের আলোকে' গ্রন্থটি ওড়িয়া ভাষার প্রথম ইসলামী সাহিত্য।

বর্তমান সময়ে ১৮টি ইসলামী গ্রন্থ রচনা করে এক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন এস. এ সামাদ। ১৯৫৯ সালে তার লেখা রাসূল (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সালে তার লেখা গবেষণাগ্রন্থ 'মহাপুরুষ মুহাম্মদ' প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ওড়িয়া লেখক "দৈনিক দ্য সমাজ' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক শ্রী উদয়ানাথ সারাঙ্গী ১৯৮২ সালে বিশ্বের আটজন মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে রাসূল (সা)-এর ওপর ১৪ পৃষ্ঠার একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, যা প্রশংসনীয়।

ওড়িয়া শিশু সাহিত্য সমিতি যে মাসিকটি প্রকাশ করে তার ১৯৯২ সালের মার্চ সংখ্যায় শ্রী জগন্নাথ মোহান্তির লেখা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। এ নিবন্ধে লেখক রাসূল (সা)-কে মানবজাতির মহান বন্ধু হিসেবে দেখিয়েছেন।

শেখ কুরাইশ সম্পাদিত 'সদা-ই-উড়িষ্যা' নামক দ্বিভাষিক যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তাতে নিয়মিত সীরাত বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়।

ওড়িয়া সাহিত্যে সীরাত চর্চার পরিমাণ খুব বেশী নয়। তবে যা হচ্ছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

অসমিয়া ভাষায় সীরাত চর্চা

১৯৯১ সালের জনগণনানুযায়ী অসমীয় মোট জনসংখ্যার ২৫% মুসলমান। রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের বেশ আগেই ইসলামের আলো এসে পৌছে। বিভিন্ন দায়ী দলের দাওয়াতে উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। কুচ, মেঘ ও থারা উপজাতির লোকেরাই প্রধানত এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। পরবর্তীকালে মেঘ উপজাতির সদস্য আলী মেগী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি অন্যতম ইসলাম প্রচারক

www.pathagar.com

হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে অসম ইসলামের আলোয় আলোচিত হলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে সীরাত সাহিত্যের তেমন ব্যাপ্তি এখানে পরিলক্ষিত হয় না। তা সত্ত্বেও কিছু কাজ হয়নি তা নয়। এক্ষেত্রে প্রথম দিকে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী (১২২৭ খৃ.), গিয়াসুদ্দীন আওলীয়া (১৩৪৬ খৃ.), শাহ মিলন বা আযুন যাকীর (১৬৩৫ খৃ.) প্রমুখ।

পরবর্তীতে অসমীয় লেখকদের যে সমস্ত সীরাত গ্রন্থ সীরাত সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে– হযরত মুহাম্মদ– কবি জামিরুদ্দীন আহমদ; শিশু হযরত মুহাম্মদ– আলীমুন নিসা পীয়ার; জগত গুরু (অনুবাদ) কবি জামিরুদ্দীন আহমদ; ইসলামের রবি– মুহাম্মদ সাদের আলা; হযরত মুহাম্মদ– ফয়েয আহমদ; বিশ্বধর্মত হযরত মুহাম্মদ– রফীউল হুসাইন বড়ুয়া; প্রেমের রাসূল– আব্দুল রহীম মুস্তাফী; অলৌকিক ঘটনা আরু হযরত মুহাম্মদ– ড. আতোয়ার রহমান; বেদ পুরানাত হযরত মুহাম্মদ– রফীউল হুসাইন বড়ুয়া; হযরত মুহাম্মদ, পবিত্র কোরআন, ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাতি– মুহাম্মদ কেরামত আলী; জগত গুরু– মুহাম্মদ কেরামত আলী; বিশ্বনবীর মীরাজ– মুহাম্মদ কেরামত আলী; বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ– বদরুল হুদা; ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (অনুবাদ)– নূরুল ইসলাম মাযার ভূঁইয়া; হযরত মুহাম্মদ সামো জীবনী– মহাম্মদ মাজীদ আলী; সীরাতুন নবী (সংকলন)– বরক্ষেত্রী সীরাতুন্নবী সম্মেলন, নল বাড়ী; হযরত মুহাম্মদ চরিত্র– মুহাম্মদ সালেহ; ইসলামের নবী– লোকপ্রিয় গোপিনাথ বরদলুই; বিশ্বনবী– সাইয়েদ কাইয়ুদ্দীন আহমদ; মানব মুকুত হযরত মুহাম্মদ এম. ইলিমুদ্দীন দীওয়ান, প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে অসমীয় মুসলমানদের বেশীর ভাগের মাতৃভাষা বাংলা। অপরদিকে অসমীয় ভাষায় লিখিত রূপ বাংলা অর্থাৎ বাংলা হরফে অসমীয় উচ্চারণ লেখা হয়।

বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা

বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা করে থেকে শুরু হয়েছে তার সন তারিখ ঠিক করা বলা অবশ্যই দুরূহ ব্যাপার। তবে একথা বলা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমিরুল মুমিনীনের খিলাফতকালে যখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখন থেকেই মৌখিকভাবে সীরাত চর্চার শুরু। অবশ্য লিখিতভাবে খোদা, মহামদ, টুপি, পেকাম্বর, আদম্ফ, গাজী, ফীকর, মলানা প্রভৃতি শব্দগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি রামাইপণ্ডিত তার 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের 'নিরঞ্জনের রুশ্মা' কবিতায় প্রথম ব্যবহার করেন। যেমন–

ধর্ম হৈলা জবনরূপী   মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভা ত্রিকচ কামান
চাপিয়া উত্তম হএ   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদা এ বলিয়া এক নাম।

----

www.pathagar.com

ব্রহ্ম হৈলা মহামদ　　বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আনন্দ হৈল্যা শূলপানি
গনৈশ হৈল্যা গাজী　　কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যত মুনি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হলেন– শাহ মুহাম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪০৯ খৃ.)। তিনি রসূল প্রশস্তি করে তাঁর কাব্য শুরু করেছেন। 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যে তিনি লিখেছেন–

জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথা হৈল য়নুপম ॥
যথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন।
তারপর মোহাম্মদ মাণিক্য সৃজন ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের দরবারে কবি জৈনুদ্দীন ও শাহ বিরিদ খান 'রসূল বিজয়', নামে আলাদা আলাদা কাব্য রচনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কবি জৈনুদ্দীন লিখেছেন–

তাঁর পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতা মণ্ডিত তাজ অতি মনোহর।
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সভঅ পরম সুন্দর।

শাহ বিরিদ খান তাঁর কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন–

সা বিরিদ খান কহে রসূল বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বারি খায় ॥

১৮০২ খৃ. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা গদ্যে অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখকের 'মহম্মদের বিবরণ' শিরোনামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটি মিশনারী ট্রাস্ট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা গদ্যে প্রকাশিত রাসূল (সা)-এর ওপর প্রথম এ প্রয়াসটি একটি কুৎসাপূর্ণ রচনা। অর্থাৎ রাসূল-এর বিরুদ্ধে খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও রাসূল প্রশস্তি করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন–

'আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর যেমন তাঁর কবিতায় রাসূল প্রশস্তি করেছেন তেমনি প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও (১৮০৮-১৮৭০ খৃ.) রাসূল প্রশস্তি করেছেন। 'ইউসুফ জোলেখা' মুসলমান রচিত প্রথম কবিতা গ্রন্থ, 'উচিত শ্রবণ' (১৮৬০) মুসলমান লিখিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ। অবশ্য এ গ্রন্থে পদ্যও কিছু কিছু আছে। এ রকম একটি পদ্যেই রাসূল প্রশস্তি রচনা

www.pathagar.com

করেছেন খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী–

নবীজীর নুরে সংসারে প্রচারে
প্রকাশিল দিবা নিশি
স্বর্গমর্ত্য আর কিরণ তাহার
দেখাছিল রবিশশী ॥
ছিদ্দিকী অধীনে সেগুন ব্যাখানে
কেমনেতে পারে বলো।
নবীজী যে স্থানে ব্যাখ্যানিতে গুণে
সাধনে অক্ষম হলা ॥

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র দু'শ বছরের কিন্তু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের। সেই চতুর্দশ শতাব্দীর 'ইউসুফ জুলেখার কবি শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভ পর্যন্ত যত বাঙালী কবি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কাব্য রচনা করেছেন তাদের প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে রাসূল প্রশস্তি করেছেন, গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

যেহেতু বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন সেজন্য উল্লেখযোগ্য কিছু কবির কবিতার কিছু পংক্তি প্রথমে তুলে ধরছি। পূর্বে শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন ও শাবিরিদ খানের কবিতার পংক্তি পেশ করেছি। এ ধারায় মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের কিছু পংক্তিমালা–

ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.) রচনা করেন– 'ওফাতে রসূল', 'রসূল বিজয়', 'নবী বংশ' 'জ্ঞান প্রদীপ', 'শবে মিরাজ', 'রসূল রচিত', 'জয় কুমার রাজার লড়াই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সা)-এর কর্মময় জীবন ও ইসলামের মর্মকথা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

'নবী বংশ' বাক্য গ্রন্থটির ভাষার সৌন্দর্য ও ভাবের মনোহারিত্বের কারণে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক কাব্য গ্রন্থটিকে 'ম্যাগনাস ওপাস' (Magnus Opus) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'ইহা বিষয়-বৈচিত্র্যে ও আকারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেও হার মানাইয়াছে। এই বাক্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি আদর্শ বলা চলে।"

সত্যিই সুবিশাল 'নবী বংশ' কাব্য গ্রন্থে বিভিন্ন নবীদের ব্যক্তিসত্তা ও তাঁদের কাহিনীর বর্ণনার চমৎকারিত্ব একদিকে কবির অসাধারণ ধৈর্য, অপরদিকে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় বহন করে।

নবী বংশের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও খাদিজা (রা)-র বিয়ে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেন আমাদেরই পরিচিত পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন–

"সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।
হীরা জরি চান্দোয়া যে মানিক্য পোখম ॥
চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমানা ॥

www.pathagar.com

ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান ॥
খাসী বকরী দুম্বা আর উট যে প্রধান।
মেজায়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান ॥"

কবির কবিত্ব শক্তির প্রমাণ মিলে তাঁর 'শব-ই মিরাজ' কাব্য গ্রন্থেও। তিনি বোরাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন–

"সেই তুরঙ্গের নাম বোরাক আছিল ॥
বোরাকের মুখমুণ্ড নরের আকার।
চিকুর লম্বিত অতি নারীর বৈভার ॥
বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত ॥
নরের বচন কহে অতি সুললিত ॥
অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর।
চলিলে বিজুলি যেন রহিতে সুধীর ॥
নীলা কষা জমরুদের বরণ তাহার।
দেখিতে সুন্দর অতি বড় শোভাকার।"

'জ্ঞান প্রদীপ' কাব্যের শুরুতে রাসূল প্রশস্তি করেছেন এভাবে–

"প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ
আঠার হাজার আলম যার সৃজন।
দ্বিতীয় এ লই মুস্তফা পয়গম্বর
যার সিফত আছে রোজ মহাশর।
যতন করি ধরি এ রাসূল দুপা এ
আখেরে এড়াইয়া যদি হিসাবের দাএ।"

এমনিতে তিনি তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলিতে কবি কৃত্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬২৫) তাঁর 'রসূল বিজয়' কাব্যের শুরুতেই লিখেছেন-

"আল্লাহো গণি মোহাম্মদ নবী
রসূলনামা কিতাব খানি কহিলাম এবে
কা এয়া মন হইয়া সোন করিলাম সবে।"

সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল লিখেছেন তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের শুরুতেই–

"পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভূবন নিরসিলা ॥
তাহার পিরিতে প্রভু সৃজিল সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥"

www.pathagar.com

কবি মুহাম্মদ খান 'মুক্তাল হোসেন' কাব্যের শুরুতে লিখেছেন–

"মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া।
দয়ার আধার নবী কৃপায় সাগর।
বাখান করিতে তার সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেন এ চৌদ্দ ভুবন।"

সৈয়দ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫) রসূল প্রশস্তি এভাবে করেছেন–

"মোহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া।
আপনার নূরে তাঁকে রাখিলা ছাপাইয়া।"

সৈয়দ মর্তুজা (১৫৯০-১৬৬২ খৃ.) তাঁর 'যোগ কালন্দর' পুঁথিটি এভাবে শুরু করেছেন–

"প্রথম প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিয়ে নবীর চরণ ॥"

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পাদে রাসূল (সা)-এর প্রসঙ্গে এসেছে আখ্যান কাব্য, খণ্ড কবিতা, গযল-গান ও দোয়া-দরূদ ইত্যাদির মাধ্যমে। ১৯০২ খৃ. মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় 'মৌলুদ শরীফ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এতে মীর মশাররফ হোসেন যে রাসূল প্রশস্তি করেছিলেন–

"তুমি হে এছলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষনবী
নতশিরে তোমার সেবি,
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।
তুমি সত্য উদ্ধারিলে মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে
প্রভুবাণী শুনাইলে
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ ॥"

মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) লিখেছেন–

"গাওরে মোস্লেমগণ নবী গুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে।
যে দেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাওরে ॥"

মেহেরউল্লার শিষ্য ও ও সহকর্মী মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭) লিখেছেন–

"তিনি সদ্য আদি নূরী
উছলিছে স্বর্গ পুরী
বাজাও আনন্দ ভেরী
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।"

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগীয় পর্যায়েই ছিল কবিতা কিন্তু বিংশ শতাব্দী এসেই বাংলা কবিতা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এ পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ-এর দশকের শেষ দিকে আধুনিক মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে। এরা হলো– শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম। নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে আধুনিক বাংলা কাব্যের রাসূল (সা)-কে নিবেদিত প্রথম কবিতা শাহাদাৎ হোসেনের 'হজরৎ মোহাম্মদ (দ.)' শিরোনামের কবিতাটি। এটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে সংখ্যা সওগাতে ছাপা হয়। কয়েকটি পংক্তি–

"তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীর ধ্যানে,
সাক্ষাত লাভি' স্বর্গ দূতেরে ধরিলে মহান সত্যজ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সেজন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যার
জানলে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য আর।
ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক–পাতে,
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতিঃ হেরিল মানব জীবন–প্রাতে।"

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খৃ.) সেই সৌভাগ্যবান কবি ব্যক্তিত্ব যাঁর গদ্য পদ্য দু'ধরনের রচনায় বাঙালী মুসলমান মনে রেখেছে এবং আজও সমান ভাবে নন্দিত। 'বিশ্বনবীর'র লেখক কবি গোলাম মোস্তফা রাসূল (সা)কে নিবেদন করে চমৎকার গীতি কবিতা রচনা করেছেন। যেমন–

নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহাম্মদ রসূল।
কুলমাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটি ফোটা ফুল ॥

বাংলা মিলাদ শরীফের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্যসাধারণ সংযোজন করেছেন তার তুলনা বিরল। বর্তমানে বাঙালী মুসলমানের গৃহে গৃহে বা যে কোন স্থানে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে সুর করে যে কিয়ামটি পড়া হয় তা গোলাম মোস্তফারই রচনা। যেমন–

"ইয়ানবী সালাম আলায়াকা
ইয়া রাসূল সালাম আলায়কা।
....
তুমি যে নূরের রবি
লিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি॥"

ঐ একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্লাবী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.)। উল্কার মত আর্বিভূত হয়ে একের পর এক হামদ, নাত ও

www.pathagar.com

ইসলামী গান ও কবিতা রচনা করে এ ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করলেন, এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেন। মোসলেম ভারতে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কবিতা "খেয়া পারের তরণী"। লিখলেন–

"পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল সাফ।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ; তরী ভরা পাথেয়?"

সাথে সাথে সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। এরপর ১৯২০-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হল 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম; আবির্ভাব।' ঠিক এর এক বছর পর ঐ মোসলেম ভারতেই প্রকাশিত হল 'ফাতেহা-ই দোহাজ দহম; তিরোভাব।' শিরোনামের আসাধারণ দু'টি কবিতা। প্রথম কবিতাটির (আবির্ভাব) প্রথম স্তবক এমন–

নাই তা–জ
তাই লা–জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর–শীষে তোরা সাজ।
করে তসলিম হর কুর্ণিশে শোর আ–ওয়াজ
শোন কোন মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা–মাঝ!
উরজ্‌ য়্যামন নজ্‌দ হেযাজ্‌ তাহামা ইরাক্‌ শাম
মেসের ওমান্‌ তিহারান–স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর্‌, তাহে আব্‌ জম্‌ জম্‌।
শোন দামাম কামান্‌ তামাম্‌ সামান
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"

কবিতাটি সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন–
"পরবর্তী সময়ে গোলাম মোস্তফাকে 'বিশ্বনবী' (১৯৪২-এর প্রকাশিত) শিরোনামে দীর্ঘ কবিতা লিখতে দেখেছি, আবদুল কাদিরকে 'হযরত মোহাম্মদ', 'মিল্লাদুন্নবী', 'অন্তর্ধান' লিখতে দেখেছি; আবদুল কাদিরকে 'হযরত মোহাম্মদ', 'মিল্লাদুন্নবী', 'অন্তর্ধান' লিখতে দেখেছি; এবং ফররুখ আহমদ-কে লিখতে দেখেছি 'সিরাজাম মুনীরা।' কিন্তু 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম'-এর উজ্জ্বলতাকে কেউ ম্লান করতে পারেননি; এমন কি নজরুল ইসলামের স্বরচিত 'মরু ভাস্কর' (অসমাপ্ত) কাব্যগ্রন্থ যাদুকরী বহু পংক্তি উপহার দিলেও 'ফাতেহা-ই-

www.pathagar.com

দোয়াজ দহম'-এর চোখ ধাঁধানো প্রভাকে আড়াল করতে পারেনি।"

কাজী নজরুলের পর বিপুল প্রতিভা ও মমত্ব নিয়ে যিনি রাসূল (সা)-এর ওপর কবিতা লিখেছেন তিনি হলেন ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খৃ.)। তিনি 'সিরাজাম মুনীরা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থই রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।"

অবশ্য ত্রিশের দশকের জসীম উদ্দীন, বে-নজীর আহমদ, কাদের নওয়াজ প্রমুখ, চল্লিশের দশকে তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, রওশন ইয়াজদানী, মুফাখ্খারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ খান'রা পঞ্চাশের দশকে-আবদুস সাত্তার, আল মাহমুদ, মাহফুজ উল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন; ষাটের দশকে আবদুল মান্নান সৈয়দ, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মুকীত চৌধুরী, ফজল-এ-খোদা, মসউদ-উশ-শহীদ সত্তরের দশকে-আবিদ আজাদ, মুশাররফ করীম, মুস্তাফা মাসুদ; আশির দশকে মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, মুকুল চৌধুরী, গাজী রফিক, গোলাম মোহাম্মদ, বুলবুল সরওয়াব, গাজী এনামুল হক, শরীফ আবদুল গোফরান, নাসির হেলাল, নব্বই দশকে-কামরুজ্জামান, জাকির আবু জাফর, মানসুর মুজাম্মিল, মৃধা আলাউদ্দীন, রফিক মুহাম্মদ, আল হাফিজ, মহিবুর রহীম, ওমর বিশ্বাস কবিগণ রাসূল প্রশস্তি করেছেন।

এর মধ্যে ষাটের দশকের উজ্জ্বলতম কবি, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ 'সকল প্রশংসা তাঁর' নামে একটি আলাদা কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর আশির দশকের কবি, কবি হাসান আলীম 'যে নূরে জগত আলো' নামে একটি এবং নাসির হেলাল 'ফুলের উপমা' নামে অপর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে রাসূল (সা)কে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১ খৃ.)। গ্রন্থটির নাম "হযরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি।" ১৮৮৭ খৃ. প্রকাশিত ৪০৪ পৃ. এ গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে- "ইহাতে হযরত নূহ (আ)-এর (নোয়ার) সময় হইতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হিজরীর প্রথম অব্দ হইতে প্রত্যেক... বৎসরের ঘটনাবলী একেকটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিয়মিতরূপে লিখিয়াছি। প্রত্যেক সম্বন্ধে কুরআন শরীফের যে যে আয়াত অবতীর্ণ (নাজেল) হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি. ... হযরত মুহাম্মদ তরবারী বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।"

এরপর ১৮৯৬ খৃ. সিলেট থেকে নাগরী হরফে মুন্সী বুরহান উল্লা ওরফে চেরাগ আলী রচিত 'হালাতুন্নবী', কুষ্টিয়া থেকে ১৯০১ খৃ. আবদুল আজিজ খান (১৮৬৮-১৯০৩ খৃ.)

www.pathagar.com

রচিত 'সংক্ষিপ্ত মুহম্মদ চরিত, যশোর থেকে ১৯০২ খৃ. ডাঃ সুফী ময়েজউদ্দীন আহমদ (মধুমিয়া) রচিত 'ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (সা.)', শান্তিপুর নদীয়া থেকে ১৯০২ খৃ. মোজাম্মেল হক রচিত 'হযরত মোহাম্মদ (সা)', যশোর থেকে ১৯০৪ খৃ. মুনশী মহম্মদ মেহেরউল্লার প্রকাশনায় শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬ খৃ.) রচিত হযরত পয়গম্বরের জীবনী (নবীজীর যুদ্ধাবলী), কলকাতা থেকে ১৯০৮ খৃ. ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯খৃ.) রচিত মোসলেম পাতাকা; হযরত মোহাম্মদ (দ.) জীবনী, ১৯১৫ খৃ. কলকাতা থেকে শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০ খৃ.) রচিত 'মাসুম মোস্তফা (দ.)', ১৯১৬ খৃ. সারা তায়ফুর রচিত 'স্বর্গের জ্যোতি', ১৯১৮ খৃ. কলকাতা থেকে এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত 'নূরনবী' ও ১৯২২ খৃ. 'মানব মুকুট', ১৯২৫ খৃ. মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাগীর নগী রচিত 'নবীশ্রেষ্ঠ', ১৯২৫ খৃ, কলকাতা থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরু ভাস্কর', ১৯৪২ খৃ. চুঁচুড়া থেকে কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী', ১৯৪৯ খৃ. কলকাতা থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ', ঐ ১৯৪৯ খৃ. ঢাকা থেকে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ রচিত 'শেষ নবী', ১৯৫১ খৃ. ঢাকা থেকে মাওলানা আবদুল খালেক রচিত 'ছাইয়েদুল মুরছালীন' (দু'খণ্ড)', ১৯৬০ খৃ. ঢাকা থেকে মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচিত 'নবী গৃহ সংবাদ' ও ১৯৬৩ খৃ. নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ', ১৯৯৮ ঢাকা থেকে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জাল হোছাইন রচিত 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন' ছাড়াও কয়েকটি সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ– ১৯৮০ খৃ. ই.ফা.বা. থেকে অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত 'শ্বাশত নবী', ১৯৯২ খৃ. ই.ফা.বা. থেকে হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত 'অনুপম আদর্শ', ১৯৯৭ খৃ. ই ফা. বা থেকে ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'হযরত রাসূল করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা', ১৯৯৪ খৃ. ইসলামিক একাডেমী থেকে ইশারফ হোসেনের সম্পাদনায় 'মহানবী (সা) স্মরণে নিবেদিত কবিতা', ১৯৯৬ খৃ. প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা থেকে আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরীর সম্পাদনায় 'রাসূলের শানে কবিতা' শিরোনামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এবার বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও সংকলন সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করছি–

স্বর্গের জাতি

গ্রন্থটির লেখিকা সারা তায়ফুর (জ. ১৮৯৩)। পুরো নাম হুরায়ুন্নিসা সারা খাতুন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী লেখিকা সারা তায়ফুর-এর 'স্বর্গের জ্যোতি' গ্রন্থটি ১৯১৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৩৭১ বাংলা সনে বাংলা একাডেমী, ঢাকা এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

কাব্যিক গদ্যে রচিত–এর গ্রন্থের ভাষা সাবলীল। লেখিকা অত্যন্ত দরদ দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে এ গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখিকাকে চিঠি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

নূরনবী

আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত 'নূরনবী'র তুল্য ছোটদের জন্য তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। সুললিত ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি যে কোন বয়সী পাঠককে আকর্ষণ করতে সক্ষম। গ্রন্থটি শুরু হয়েছে এভাবে–

"সে অনেক দিনের কথা। তেরশ' কি তারও আগে,
সেই-সাত সমুদ্র পার, তের নদীর ধার, সেই সোনণ হীরার গাছ, আর মুক্তা মণির ফুল–
সবাই তখন ভুল।
তখন না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা, আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা।"

এমনি প্রাণকাড়া ভাষা দিয়ে পুরো বইটি করা হয়েছে। ১৯৯৫ খৃ. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

মানব মুকুট

'মহাপুরুষের ও শৈশব আছে, মানব শিশুর স্বাভাবিক সোহাগ-বিরাগ ও মান-অভিমান তাঁহার ও জীবনে লালায়িত হয়। শৈশব স্মৃতির পুষ্প পরশে তাঁহারও প্রাণের কোমল পর্দায় ঝঙ্কার উঠে" (পৃ. ৩০)

এয়াকুব আলী চৌধুরীর লেখার স্টাইলই আলাদা তাঁর ভাষা যেন বহতা নদীর মত তর্ তর্ করে বয়েই চলে।

রাসূল (সা)-এর জীবনকেন্দ্রিক ৭টি প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থ। লেখক দেখিয়েছেন মুহাম্মদ (সা) শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না– তিনি মানবতার মুক্তির দিশারী হিসেবে– পথপ্রদর্শক হিসেবে এসেছিলেন।

নবী শ্রেষ্ঠ

ঢাকা জেলার অধিবাসী মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাঙ্গীর নগরী রচিত 'নবী শ্রেষ্ঠ' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। গ্রন্থটির ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে রাসূল (সা)–এর চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে, সাথে সাথে গ্রন্থটি সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

সে সময়কায় একজন নামকরা সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র নাগ লিখেছিলেন, "আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আপনার গ্রন্থ পাঠে হযরত মুহম্মদের চরিত্র ও শিক্ষা দীক্ষার প্রতি সহস্র গুণে অধিকতর শ্রদ্ধাবন হইয়াছি।"

মোস্তফা চরিত

মাওলানা আকরম খাঁ গ্রন্থটি সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন– "এই অসাধ্য সাধন করিতে আমাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিরাম নিভৃত সাধনায় সমাহিত থাকিতে হইয়াছে। আমার এ সাধনা কতটুকু সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এই ব্যাপারে আমাকে ইতিহাস, জীবনী, তাফসীর, হাদীস ও তাহার ভাষা

www.pathagar.com

প্রভৃতি হযরতের জীবনী সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইয়াছে।"

মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকতা থেকে ১৯২৫ খৃ. 'মোস্তফা চরিত' প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর আকরম খাঁ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্রকে পাঠকের সামনে তুলতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি সম্বন্ধে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন–

"বাস্তবিকই প্রায় ন'শ পৃষ্ঠার 'মোস্তফা চরিত' এর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নবী করীম (সা)-এর জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার বিতর্কিকা। ২২৩ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি যে রসূল চরিত্রের মহিমা প্রদর্শনের পটভূমি রচনা করে তাঁর সমীক্ষাধর্মী মনীষার পরিচয় দিয়েছে, জীবনী রচনায় তা তুলনারহিত। এতে শুধু হাদীসের সত্যাসত্য নিরূপণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমগ্র ইসলামের আবির্ভাবের কারণের মধ্যে এ সমীক্ষা নিপুণ শিল্পীর সৃষ্ট পোট্রেটের বা ল্যান্ডস্কেপের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় আকরম খাঁ যে মেধা, পরিশ্রম ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা অক্লান্ত সাধনা অধ্যাবসায়ের ফল।"

'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য' নামে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর আরও একটি গ্রন্থ ১৯৩২ খৃ. ঐ মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

মরু ভাস্কর

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪ খৃ.) রচিত 'মরু ভাস্কর' নামের সুলিখিত বইটি মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহারের সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ ১৯৪১ খৃ. বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্বন্ধে অধ্যাপক আবদুল গফুর লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নবী চরিতসমূহের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরু ভাস্কর' অন্যতম। মননশীল গদ্য লেখক হিসেবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং সাবলীল ভাষার অধিকারী হিসেবে তাঁর খ্যাতির একটা বড় দলিল এই 'মরু ভাস্কর'।

'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ' নামেও কিশোরদের উপযোগী একটি নবীজীবনী তিনি রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় রচিত এর গ্রন্থটি ১৯৪৯ খৃ. দেব সাহিত্য কুটির কলকতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বনবী

'বিশ্বনবী' কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)-র অমর সৃষ্টি। নিঃসন্দেহের 'বিশ্বনবী' কবি গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফা যদি 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কোন কিছু রচনা নাও করতেন তবু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, বাঙালী পাঠক তথা বাঙালী মুসলিম পাঠকদের কাছে তিনি বেঁচে থাকতেন, শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকতেন। 'বিশ্বনবী' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, এরই মধ্যে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বনবীর কদর পাঠকের কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি রবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার প্রমাণ ১৯৪২ থেকে ২০০২

www.pathagar.com

পর্যন্ত মোট ৩০ টির মত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশককে প্রতি দুই বছরে একটি করে সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে। এ তথ্য থেকেই পরিষ্কার হয় গ্রন্থটির ঈর্ষণীয় পাঠক-প্রিয়তার কথা।

প্রথম খণ্ডে মোট ৫৮টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১৪টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। 'বিশ্বনবী' নিঃসন্দেহে একটি গবেষণা গ্রন্থ, সর্বসাধারণের বোধগম্যও। এর কোন আলোচনায় যুক্তির ভারে ন্যূব্জ হয়ে পড়েনি, আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন অযৌক্তিক কিছুকেও প্রশ্রয় দেয়া হয়নি।

আমাদের বিশ্বাস এ বিশাল গদ্য কাব্যটি আরও দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠককে বিমুগ্ধ করে রাখবে।

বিশ্বনবী ছাড়াও কবি গোলাম মোস্তফা–'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য' ও 'মরু দুলাল' নামে আরও দু'টি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন

ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ থেকে সৈয়দ একে কামরুল বারী প্রকাশ করেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন' নামে ১০০৮ পৃষ্ঠার বিপুলায়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ সীরাতগ্রন্থ। ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে রাসূল (সা)-এর জীবনের নানা দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় শুরুর আগে প্রথম ভাগে সমকালীন পরিবেশ শীর্ষক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৮টি পরিচ্ছেদে ৮টি জরুরী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সে গুলি হলো রাসূল প্রেরণ, কুরআন-হাদীস সংকলনের ধারা, রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবকালীন বিশ্ব, মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বাভাস, শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন, মক্কায় ইসমাঈলী বংশের আগমন, কা'বা শরীফের পুনঃ সংস্কার ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ পরিচয়।

গ্রন্থটির মাঝে মাঝে বিভিন্ন মূল্যবান চিত্রও সংযোজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান সময় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থের মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটির রচয়িতা শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তারই সুযোগ্য সন্তান অধ্যাপক ডঃ এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১০ বছরে প্রকাশিত সীরাত বিষয়ে মৌলিক রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করে।

সাইয়েদুল মুরসালীন (দু'খণ্ড)

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আবদুল খালেক রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন' (দু'খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। 'মোস্তফা চরিত'. 'বিশ্বনবী' পর্যায়ের গ্রন্থ এটি না হলেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি। এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খৃ.। ১৯৯০ খৃ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গ্রন্থটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দু'খণ্ডে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি লেখকের কঠোর পরিশ্রমের ফসল।

www.pathagar.com

নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ

'পারস্য প্রতিভা'র লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ' গ্রন্থটি ১৯৫৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। সীরাত সাহিত্যের ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লেখক কেন গ্রন্থটি লিখলেন– তা বলতে গিয়ে বলেছেন, ত্রিশ বৎসর আগের কথা। কতিপয় সাহিত্যামোদি ব্যক্তি আমার পারস্য প্রতিভা পাঠ করার পর আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় একখানি নবী চরিত লিখতে অনুরোধ করেন কিন্তু আমি আত্মজিজ্ঞাসা হইতে উপলব্ধি করিলাম, নবী চরিত্রের আসল স্বরূপ আমার বোঝা হয় নাই। তারপর পড়িয়াছি যথাসাধ্য এবং শুনিয়াছি বিস্তর কিন্তু এখনও সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সকল দিক সম্যক বুঝিয়াছি– এ দাবী করিতে পারি না। বিষয়টি বাস্তবিকই দুরূহ। তবে যতটুকু বুঝিয়াছি সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম।"

এমনিভাবে প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত। তবে সম্প্রতিক সময়ে কিশোরদের জন্য কবি আল মাহমুদ রচিত 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)' ও কবি নূরুল হুদা রচিত 'মহানবী' গ্রন্থ দু'টি অনবদ্য হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রতিনিয়ত সীরাত চর্চা ও প্রকাশনা চলছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা মিলে প্রায় হাজারের কাছাকাছি প্রকাশনা বাংলা ভাষায় রয়েছে।

'বাংলা ভাষায় রাসূল (সা) বিষয়ক গ্রন্থ' শিরোনামের আমার একটি লেখায় ৮০২টি পুস্তক-পুস্তিকা তালিকা (দেখুন; সাহিত্য-সংস্কৃতি; সীরাতুন্নবী (সা) সংকলন-২০০১) পেশ করেছি। ফলে আশা করা যায় আগামী ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায়ও সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধ অবদান সংযোজিত হবে। ■

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইসলামী বিশ্বকোষ (বিভিন্ন খণ্ড), সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা.।
২. বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তাফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পঞ্চদশ সং-১৯৭৮।
৩. বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা, মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮।
৪. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী (১ম খণ্ড), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।
৫. মহানবী– মুহাম্মদ নূরুল হুদা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
৬. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
৭. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮।
৮. হযরত রাসূল করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদন পরিষদ, ইফাবা, ১৯৯৭।
৯. নূরনবী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, মার্চ ১৯৯৫।
১০. অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০১ ই.ফা.বা.।
১১. ই. ফা. বা. প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ২০০০।
১২. সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ২০০১।
১৩. সাহিত্য সংস্কৃতি, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৬, ২০০০ ও ২০০১।
১৪. মাসিক মদীনা (সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা- ৯৯) সম্পাদক : মুহিউদ্দীন খান।
১৫. ইসলামী সংস্কৃতি (বিশ্বনবী সংখ্যা ১৯৯৮)- সম্পাদক : আবু রিদা, কলকাতা।

www.pathagar.com

শামায়িলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান

❑

আল্‌হামদুলিল্লাহিল আযিযীল আলীম গা-ফিরিজ জামবি, ওয়া কাবিলিত তাওবী শাদিদীল ইক্বাব, যিত তাওলী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ইলাইহীল মাছীর।

আস্‌সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ্‌, আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

সীরাতুন্নবীর বিষয়টি অনেক ব্যাপক, এর অনেক দিক রয়েছে। সবদিক আলোচনা করে শেষ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সীরাত বিষয়ে যত লেখালেখি, বয়ান-বক্তৃতা, সেমিনার-সম্মেলন হয়ে এসেছে তার সবকিছুর পরেও একথা বলার উপায় নেই যে সীরাতের ব্যাপারে লেখালেখি এবং প্রকাশ-প্রচারণা শেষ হয়ে গেছে। বরং যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সীরাতের বিভিন্ন দিক তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দরের চেয়েও সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হচ্ছে। আর কেয়ামত পর্যন্ত ইন্‌শাআল্লাহ এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কারণ রাসূল (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত সম্পদ, যেখানে সবার অংশ ও অধিকার বিদ্যমান।

সীরাতুন্নবীর মহৎপূর্ণ ও বিশেষ একটি অংশ হল শামায়েলে নববী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর শারীরিক আকার-আকৃতি, চলাফেরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, খানা-পিনা, হাসি-কান্না, লেন-দেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ইবাদাত বন্দেগী, দোয়া-মুনাজাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তার 'আদত-অভ্যাস সম্পর্কে সম্যক আলোচনা। সীরাত ও শামায়েল সম্পর্কে জানার জন্য পবিত্র কোরআন ও সহীহ্ হাদীসসমূহ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমরা জানি, যে কোন ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তার দৈহিক সৌন্দর্য অনেক সাহায্য করে। আর তার নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণের বিষয়টি যদি তার সাথে এক করা যায় তবে তো আর কথাই নেই– জীবন্ত ব্যক্তির উপস্থিতির স্বাক্ষর বহন করে সে মুহূর্তে। আমাদের নিকট রাসূল (সা)-এর কোন প্রকৃত ছবি বা মূর্তি নেই, স্বয়ং রাসূল (সা) এসব বানাতে ও রাখতে শুধু নিষেধই করেননি বরং যে কোন লোকের এরূপ মূর্তি সংরক্ষণকে কেয়ামত পর্যন্ত হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে এমতাবস্থায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এ নবীর অনুপম চেহারা যখন আমাদের সামনে নেই এবং তার কোন সুযোগও

www.pathagar.com

নেই– তখন পবিত্র কোরআন অধ্যয়নে এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সাহাবাদের নিখুঁত শাব্দিক বর্ণনা থেকেই তাঁর মানবীয় চরিত্র ও কীর্তিকলাপের সমস্ত ইতিবৃত্ত আমরা পেতে পারি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে তাদের এ প্রচেষ্টা সময়ের আবর্তনে সলফে-সালেহীন দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তারপরও যে কথা না বললেই নয় তাহলো, তিক্ত হলেও সত্য যে, হাদীসে রাসূলের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন কুমতলবীরা অনেক মনগড়া কল্প-কাহিনী ও বানোয়াট কথাবার্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তদ্রূপ সীরাত-শামায়েলের ব্যাপারেও অনেক জাল-মওযু কথাবার্তা ইতিহাসে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই যাচাই-বাছাই করে রাসূল (সা)-এর সহীহ্ শুদ্ধ সীরাত ও শামায়েল সংরক্ষণ করা ও নির্ভেজালভাবে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেক যুগের আলেম-উলামাদের নিকট সময়ের সুমহান দাবী। আসুন আমরা এই মহামানবের ব্যক্তিসত্তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সহীহ্ হাদীসের আলোকে দেখার চেষ্টা করি।

রাসূলুল্লাহর জন্ম ও বংশ পরিচয়

রাসূল (সা) নিজের বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : "আল্লাহতায়ালা ইসমাইল (আ)-এর বংশধর থেকে কিনানা গোত্রকে বাছাই করেন, কিনানা গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেন, আবার কুরাইশদের থেকে বনু হাশিমকে বাছাই করেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেন।" (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে আমার মাতা-পিতা আমাকে জন্ম দেওয়া পর্যন্ত বিবাহের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি, জ্বিনা ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। জাহেলী যুগের ব্যভিচার আমাকে কোন স্পর্শ করেনি।"

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "আমি আমার পিতা ইব্রাহিম (আ)-এর দোয়া, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন, যখন তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন তিনি দেখেছেন যে, তাঁর ঘর থেকে একটি আলো বের হল যা সিরিয়া দেশের প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করেছে।"

আবু কাতাদা (রা) বলেন : এক বেদুইন এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সোমবারের রোযা সম্পর্কে আপনার কি মত? উত্তরে তিনি বললেন, "সোমবার হল সেই দিন, যেই দিনে আমি পয়দা হয়েছি এবং আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) হস্তি বাহিনীর হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহর নাম ও উপনামসমূহ

হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেন, "আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ। আমি আলমাহি, আমার দ্বারা আল্লাহপাক কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল হাশির, কেয়ামতের দিন আমার পশ্চাতে

www.pathagar.com

মানবজাতিকে সমবেত করা হবে এবং আমি আল আকিব (শেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোন নবী আসবে না)। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

রাসূল (সা)-এর প্রসিদ্ধ উপনাম হল আবুল কাসিম। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পরে তাকে আবু ইব্রাহীমও বলা হত।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বাজারে ছিলেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আবুল কাসিম। নবী (সা) সেদিকে তাকালেন, (এবং বুঝতে পারলেন লোকটি অন্য কাউকে ডাকছে) অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রেখো, উপনাম ধরে আমাকে ডেকো না।" (বুখারী, মুসলিম)

আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (সা)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন জিব্রাইল (আ) এসে বললেন, "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা ইব্রাহীম।"

রাসূলুল্লাহর শারীরিক গঠন ও আকৃতি

রাসূল (সা)-এর শারীরিক সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়।

হযরত আনাস (রা) বলেন : রাসূল (সা) স্পষ্ট দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, আর খর্বকায় ও ছিলেন না। ধবধবে শুভ্র বর্ণও ছিলেন না আর বাদামীও ছিলেন না। অত্যধিক কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট ছিলেন না আবার একেবারে, সটান কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয় তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়্যত প্রদান করেন। ৬৩ বছর বয়সে ওফাৎকালে তার মাথায় এবং দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম, শামায়েল তিরমিযি)

হযরত আনাস (রা) আরো বলেন, রাসূল (সা) ছিলেন মধ্যম উচ্চতাবিশিষ্ট, না দীর্ঘ আর না বেটে। সুন্দর ছিল তার শারিরীক গঠন। আর তার চুল অত্যাধিক কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সটান সোজাও ছিল না। তিনি গৌর বর্ণের ছিলেন। পথে হাঁটার সময় তিনি সম্মুখে ঝুঁকে চলতেন। (বুখারী, মুসলিম, শামায়েলে তিরমিযী)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, "আমি রাসূল (সা)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন বস্তু কোনদিন দেখিনি।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে ও পরে তাঁর মত কোন ব্যক্তি দেখিনি।" (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাসূল (সা)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর কিছু দেখিনি। তাঁর কপালে যেন সূর্য প্রবাহিত ছিল।" তিনি আরো বলেন– "রাসূল (সা) ছিলেন লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দর।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর উভয় হাত ছিল মাংসল ও আকারে বড়। (বুখারী)

www.pathagar.com

হযরত আবু জুহাইফা (রা) বলেন, "আমি একবার রাসূল (সা)-এর হাত টেনে নিয়ে আমার মুখের উপর রাখলাম। আমার মনে হল যেন তার হাত বরফের চাইতেও অধিকতর শীতল এবং মেশকের চাইতেও অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত।" (বুখারী)

হযরত বারা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল।" (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন উভয় কাঁধ থেকে চাদর সরাতেন তখন (পিঠকে) মনে হত যেন চাঁদি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) লম্বা মাশরুবাসম্পন্ন ছিলেন, "আরবী ভাষায় বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত কেশের সরুরেখাকে মাশরুবা বলা হয়।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর পদদ্বয় ছিল মাংসল ও বড় আকৃতির।" (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "নবী (সা)-এর পা দু'টি গোশতে পুরু ছিল।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহর চেহারা মুবারক

রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল ও চেহারা মুবারক অতি সুন্দর চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও গোলাকার ছিল। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, " রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল ছিল চাঁদ-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গোলাকার।"

হযরত আলী (রা) বলেন, "রাসূল (সা) কে যে দেখতো, সে প্রথম দৃষ্টিতেই হতভম্ব হয়ে যেত।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম, তার চেহারা একজন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাসূল (সা)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর আর কিছু দেখিনি। তাঁর কপালে যেন সূর্য চলাচল করতো।"

রাসূল (সা)-এর কপাল ছিল প্রশস্ত। যখন ওহী নাযিল হত তখন ঘাম ঝরে পড়তো এবং ঘামের ফোঁটাগুলো তাঁর কপালে মনি-মুক্তার মত দেখাত।

রাসূল (সা)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল লম্বা ভ্রূযুক্ত কালো। চোখের তারকা ছিল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের এবং চোখের পাতার চুল ছিল কোমল ও দীর্ঘ।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর মস্তক মুবারক ছিল আকারে বড়।"

খতমে নবুয়্যত বা নবুওয়াতের মোহর

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, "আমি রাসূল (সা)-এর দু'কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত দেখেছি। তা ছিল কবুতরের ডিমের মত লাল বর্ণের একটি মাংসপিণ্ড।" (মুসলিম, তিরমিযী)

www.pathagar.com

আবু নাদরা আউফী বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহর মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, "তা ছিল তাঁর পিঠে উদগত মাংস খণ্ড বিশেষ।" (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, "হযরত সালমান ফার্সী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মোহরে নবুয়্যাত দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।" (শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহর চুল ও দাড়ি

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথার চুল ছিল খুবই কালো।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর মাথার চুল অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর চুল ছিল স্বল্প কুঞ্চিত।" (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর মাথার চুল তার দুই কানের মধ্য পর্যন্ত লম্বা ছিল।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত বারা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর চুল ছিল ওয়াফরাহ'র চেয়ে বেশী এবং জুম্মাহ্‌র চেয়ে কম।" (আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী)

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন হাদীসে রাসূল (সা)-এর মাথার চুলের বিলম্বতা সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁর চুল রাখার ধরন তিন প্রকার ছিল, 'জুম্মাহ' 'লিম্মাহ' ও 'ওয়াফরাহ'। মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'জুম্মাহ' বলা হয়। মাথার চুল লম্বা হয়ে ঘাড়ের মধ্য ভাগ পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'লিম্মাহ' বলা হয়। আর যদি কর্ণমূল বা কর্ণদ্বয়ের মধ্য ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে বলা হয 'ওয়াফরাহ' এই তিন ধরন ব্যতীত অন্য কোন রকম চুল রেখেছিলেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া না।

হযরত আলী (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর দাড়ি ছিল বড়।"

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর দাড়ির কেশ ছিল প্রচুর।" (মুসলিম)

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ওযু করার সময় দাড়ি মুবারকে খেলাল করতেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন মাথা আঁচড়াতেন তখন ডান পার্শ্ব দিয়ে শুরু করাকে পছন্দ করতেন।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার

www.pathagar.com

মাথায় ও দাড়িতে বিশটি সাদা চুলও ছিল না।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে সূরা হুদ ও তার মত অন্য সূরাগুলো বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তখন রাসূল (সা) বলেন, আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াক্বিয়াহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা, ও সূরা তাকভীর-এ সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে।" (তিরমিযী) এরূপ আরো কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়, যা থেকে বুঝা যায় যে, এ সকল সূরায় কেয়ামতের যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মাতগণের উপর আল্লাহর আযাব গজবের যেসব কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে তা চিন্তা করে রাসূল (সা)ও শারীরিকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে তাঁর চুল দাড়িতে শুভ্রতা দেখা গেছে।

রাসূল (সা) একবার এক সাহাবীর দাড়ির বাড়তি চুল নিজেই ছেঁটে দেন। তারপর বলেন- যে ব্যক্তি মাথার চুল বা দাড়ি রাখবে, তার সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা উচিত। কাতাদাহ (রা)-কে বলেছিলেন- "দাড়িকে সুন্দরভাবে রাখো।" (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহর পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক দ্বারাও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয়। রাসূল (সা)-এর জীবন থেকে এর প্রমাণ আরো বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। রাসূল (সা)-এর পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা লজ্জা নিবারক ছিল, সৌন্দর্য উৎপন্নকারী ছিল এবং তাকওয়া তথা খোদাভীতি ও সততার পোষাক ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন- "আমি আল্লাহর একজন দাস মাত্র এবং বান্দাহদের উপযোগী পোষাকই পরি।" রেশম জাতীয় ও অন্যান্য জাতির পোশাক বিশেষত তাদের ধর্মীয় যাজক শ্রেণীর নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকের অনুকরণ করাকেও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, "পোশাকসমূহের মধ্যে রাসূল (সা)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল কামীছ।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা) অর্থাৎ জামা। তাঁর জামার হাতা বেশী চাপাও হতো না, বেশী ঢিলাও হতো না। মধ্যম ধরনের হতো। হাতা কখনো কনুই পর্যন্ত এবং কখনো কবজি পর্যন্ত লম্বা হতো। জামার উপরের অংশ কখনো গরমের কারণে খোলাও রাখতেন, এমনকি এরূপ অবস্থায় নামাজও পড়তেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে কিংবা দূর সফরে সাধারণের চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের জামা পড়তেন। জামা পরার সময় প্রথমে ডান হাত ও পড়ে বাম হাত ঢুকাতেন। শুধু জামা পরিধানের ক্ষেত্রেই নয় সব ভাল কাজে ডান হাতের অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা তিনি সবাইকে দিতেন।

রাসূল (সা) সারা জীবনই লুংগি পরিধান করেছেন। তবে তিনি পায়জামা ব্যবহার করেছেন বলে কোন সহী বর্ণনা না পাওয়া গেলেও তিনি যে পায়জামা খরিদ করেছিলেন সে ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই পায়জামা পরতেন।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে তিনি যখন লুঙ্গি পরিধান করতেন তখন লুঙ্গির সামনের ভাগ একটু লটকিয়ে দিতেন এমনকি লুঙ্গির উভয় কোণ পায়ের উপর গিয়ে পড়ত। আর পিছন দিক থেকে লুঙ্গি উঠিয়ে রাখতেন।"

মাথায় পাগড়ি পরতে খুবই ভালবাসতেন। তবে কখনো কখনো শুধু সাদা টুপিও ব্যবহার করতেন। ঘরোয়া ব্যবহারের টুপি মাথার সাথে লেগে থাকতো। আর ঘরের বাইরে বের হতে অপেক্ষাকৃত উঁচু টুপিও পরতেন। ঘন সেলাই করা কাপড়ের সূঁচালো চুপিও তিনি পরতেন। পাগড়ির পরিবের্ত কখনো বড় রুমাল মাথায় বেঁধে নিতেন। পাগড়ির রং সাদা ছাড়াও কখনো হলুদ যা সম্ভবত মেটে রং বা ছাই রঙেরই হতে পারে পড়তেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কালো পাগড়ি পরেন।

পোশাকের বেলায় সাদা রংই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। তিনি বলেছেন : "তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে যাওয়ার সর্বোত্তম পোশাক সাদা পোশাক।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। তিনি এ ব্যাপারে আরো বলেছেন "সাদা কাপড় পর এবং সাদা কাপড় দ্বারা মৃতদের কাফন দাও। কেননা এটা অপেক্ষাকৃত পবিত্র ও পছন্দনীয়।" (তিরমিযী, ইবনে মাজা) ।তিনি কালো পোশাকও পরিধান করেছেন।

হযরত আবু রিমজা (রা) বলেন, "আমি নবী করীম (সা) এর নিকট আসলাম। দেখলাম তাঁর উপর দুইটি সবুজ চাদর ছিল।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সাদার পরেই তার পছন্দনীয় রং ছিল সবুজ। তবে তাতে হালকা সবুজ ডোরা থাকা পছন্দ করতেন।

হযরত বুয়ায়দা (রা) বলেন, "নাজ্জাশী রাসূল (সা)-এর জন্য সাদাসিদে দু'টি কালো রংয়ের মোজা হাদিয়া দিলেন। রাসূল (সা) তা ব্যবহার করলেন। তারপর ওযু করলেন এবং তার উপর মাস্হ করলেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী) অনুরূপভাবে দিহয়া কালবীও মোজা উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা ছেঁড়ার আগ পর্যন্ত পরেছেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, অনেক সময় তথাকথিত ধর্মীয় শ্রেণীর লোকেরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। বিশেষত বৈরাগ্যবাদী তাসাউফের প্রবক্তরা নোংরা, ময়লা কাপড় পরে থাকাকে উচ্চ মর্যাদার আলামত মনে করে থাকেন। রাসূল (সা)-এর পোশাক-পরিচ্ছদের অংশ নিখুতভাবে লক্ষ্য করলে যে কোন সাধারণ বিবেকই বলতে বাধ্য হবে যে তিনি এরূপ কাজের বিরোধী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, এ বিভ্রান্তি তিনি দূর করার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে জেনে রাখা উচিত যে, তিনি একবার ২৭ উটনীর বিনিময়ে এক সেট মূল্যবান পোশাক খরিদ করে পরেন এবং তা পড়ে নামাজও পড়েন।

রাসূল (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া সহ নতুন কাপড় সাধারণত শুক্রবারে পরতেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বৈরাগ্যবাদ প্রতিরোধ করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। তাই এক সচ্ছল

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে অতি মাত্রায় গরীবের মত জীবন-যাপন করতে দেখেই বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার জীবনে তাঁর দেয়া নিয়ামতের প্রভাব প্রতিফলিত হোক- এটা ভালবাসেন।' (তিরমিযী, নাসায়ী)।

রাসূলুল্লাহর আংটি, সুরমা ও আতর ব্যবহার

রাসূল (সা) সাধারণত রূপার আংটি ব্যবহার করতেন। তবে লোহার আংটিতে রূপার পালিশ ও ফলক সহ লোহার আংটি ব্যবহার করতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, "রাসুল (সা)-এর আংটি ছিল চাঁদির তৈরী এবং তা ছিল আবিসিনিয়ার পাথর।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন আরবের বাইরে পত্র লিখার ইচ্ছা করেন তখন তাঁকে বলা হয় যে, যে পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত থাকে না সেই পত্র অনারবরা গ্রহণ করে না। কাজেই তিনি একটি আংটি বানিয়ে নেন।" (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, "রাসূল (সা) চাঁদির একটি আংটি তৈরী করান, তা তাঁর হাতে ছিল অতঃপর আবু বকর ও উমরের হাতে ছিল। তারপর হযরত উসমানের হাতে ছিল। অবশেষে তাঁর হাতে থাকাকালীন সেটি আরিস কূপে পতিত হয়। তাতে অঙ্কিত ছিল "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" (বুখারী, আবু দাউদ) তিনি আংটি সাধারণত ডান হাতেই পরতেন। তবে কখনো কখনো বাম হাতেও পরেছেন। মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলে পরতেন না। মধ্যমার পার্শ্ববর্তী আংগুলে পরাই পছন্দ করতেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে তিনি আংটি ব্যবহারে ফলক উপরের দিকে নয় বরং হাতের পাতার দিকে রাখতেন।

রাসূল (সা) নিজেও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং উম্মাতকে সুরমা লাগানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) বেজোড় হিসাবে সুরমা ব্যবহার করতেন।" তিনি আরো বলেন, "রাসূল (সা) ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দুইবার সুরমা ব্যবহার করতেন।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) সুগন্ধিকে খুব ভালবাসতেন।" (আবু দাউদ)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) কখনো খুশবু ফিরিয়ে দিতেন না।" (বুখারী, তিরমিযী) তিনি আরো বলেন, "রাসূল (সা)-এর কাছে একটি আতরদান ছিল, যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।" (আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী)। রাসূল (সা) নিজ বাড়ীতে সুগন্ধি দ্রব্যের ধুয়া ছড়াতেন।

রাসূলুল্লাহর কথাবার্তা ও চলাফেরার ধরন

কথাবার্তার মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তার মর্যাদাকে উন্মোচিত করে। আমরা জানি যে রাসূল (সা) পাহাড়ের চেয়েও বেশী গুরুদায়িত্ব ও চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়াতেন এবং নানা

www.pathagar.com

রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটতো। তারপরও তাঁর কথাবার্তায় গাম্ভীর্য, আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হতো।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, "আমি ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতার সহিত প্রেরিত হয়েছি।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

রাসূল (সা)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁকে জাওয়ামিউল কালিম' নামে ভূষিত করা হয়েছিল। এখানে তাঁর 'জাওয়ামিউল কালিম' এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো যেমন :

(১) "মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।" (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি প্রেরিত পত্রে)

(২) "নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হবে।"

(৩) "দেখা ও শোনা এক কথা নয়।"

(৪) "যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)– এর কথা ছিল পৃথক পৃথক, যেই শুনত সেই বুঝতে সক্ষম হত।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

রাসূল (সা) ছিলেন আরবের সর্বাপেক্ষা সুভাষী মানুষ। তাঁর ভাষার সাহিত্যিক মান যেমন উচ্চ ও উৎকৃষ্ট ছিল, তেমনি তা ছিল সহজবোধ্য ও সরল। সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করলেও তিনি কখনো নিচুমানের ও অশালীন শব্দ ব্যবহার করেননি, আর না তিনি কৃত্রিম ধরনের ভাষা পছন্দ করতেন। একবার হযরত উমর (রা) বললেন, হে রাসূল (সা) আপনি তো কখনো আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকেননি, তবু আপনি আমাদের সবার চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন কিভাবে? তিনি বললেন–'আমার ভাষা ইসমাইল (আ)-এর ভাষা। এটা আমি বিশেষভাবে শিখেছি। জিব্রাইল এ ভাষাই আমার কাছে নিয়ে এসেছে এবং আমার অন্তরে তা বদ্ধমূল করেছে।'

একবার হযরত আলী (রা) নবীজীকে নিজের ব্যাখ্যার অনুরোধ করলে রাসূল (সা) বললেন, 'আল্লাহর পরিচয় আমার পুঁজি, বুদ্ধি আমার দ্বীনের মূল, ভালবাসা আমার ভিত্তি, আকাংখা আমার বাহন, আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু, আস্থা ও বিশ্বাস আমার সাথী, জ্ঞান আমার অঙ্গ, ধৈর্য আমার পোশাক, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার জন্য অতি বড় নিয়ামত, বিনয় আমার সম্মান, যোহদ তথা পার্থিব সম্পদ নিস্পৃহতা আমার পেশা। প্রত্যয় আমার পেশা, সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী, আনুগত্য আমার রক্ষাকবচ, জিহাদ আমার চরিত্র আর নামাজ আমার চক্ষু শীতলকারী।' রাসূল (সা) কথা বলার মাঝে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য হঠাৎ হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসতেন এবং বিশেষ বাক্যকে বার বার উচ্চারণ করতেন। শ্রোতাদেরকে কোন বিষয়ে সাবধান করতে চাইলে কথার সাথে

www.pathagar.com

সাথে মাটিতে হাত দিয়ে থাপড়াতেন। কোন কথা বুঝানোর ব্যাপারে হাত ও আংগুলের ইশারা দিয়েও সাহায্য নিতেন। তবে চোখের ইশারায় কথা বুঝানোকে নবী পয়গাম্বরদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলেও অভিহিত করেছেন। কথাবার্তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বক্তৃতা। কর্তব্যের তাগিদে কখনো বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হলে তিন কাল বিলম্ব না করেই সময়োপযোগী ভাষণ দিতেন। তখন তার জিহ্বা কখনো ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত, কখনো প্রবল স্রোতধারার মত এবং কখনো ধারালো তরবারীর মত সক্রিয় হয়ে উঠতো।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন. "রাসূল (সা) এমনভাবে কথা বলতেন যে, যদি কেউ গণনা করতে চায় সে গণনা করতে পারবে।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা)-এর এরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য যেমন এই ছিল যে, এর দ্বারা শ্রোতারা উপকৃত হবে– তেমনি এ উদ্দেশ্যে ছিল যে, উপস্থিত যারা একথাগুলো শুনছে তারা তা সংরক্ষণ করতে এবং ঐসব লোকের কাছে পৌঁছে দেবে, যারা অনুপস্থিত রয়েছে। যারা ভবিষ্যৎ বংশধর তারাও এই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কথার প্রভাব এতই গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, তাঁর বিরোধীরাও সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারতো না। তাই মুখরক্ষার জন্য তাদেরকে বাধ্য হয়ে বলতে হতো– এগুলো কথা নয় বরং যাদু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূল (রা) এমনভাবে বলতেন, যাতে বুঝা যেত যে, তিনি অক্ষমও নন আবার অলসও নন।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন বলতেন তখন সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন।" (মুসলিম)

হিন্দ বিন আবি হালাতের ভাষায়, "তাঁর চলা দেখে মনে হতো পৃথিবী তার চলার সাথে সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (সা)-এর চলার বিষয়টি বলেছেন এইভাবে যে, "আমাদের পক্ষে তাঁর সাথে চলাই কষ্টকর হতো," প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা)-এর চলার ধরন ছিল– সূরা লুকমানের "যমীনের উপর দিয়ে দম্ভ ভরে চলো না"– এই নির্দেশটির বাস্তব প্রতিফলন।

হযরত জাবের (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন চলতেন তখন তাঁর সাহাবীগণ সামনের দিকে থাকতেন। তাঁর পিছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হত।'

রাসূলুল্লাহর হাসি ও কান্না

রাসূল (সা) সর্বদা অত্যন্ত হাসি মুখ ও সদাপ্রফুল্ল থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন– "তোমার ভাই-এর দিকে মুচকি হাসি নিয়ে তাকানোটাও একটা সৎ কাজ।"

হযরত জাবের (রা) বলেন, "রাসূল (সা) এর হাসি ছিল মুচকি হাসি।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আল্লাহর শপথ, রাসূল (সা) কেবল মুচকি হাসতেন।" (বুখারী)

হযরত জারীর (রা) বলেন, "আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকে নবী (সা) আমাকে তাঁর কাছে যেতে কোন বাধা দেননি। তিনি যখনই আমাকে দেখতেন মুচকি হাসতেন।" (বুখারী)

অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরস জীবনে অভ্যস্ত হয় এমনকি কখনো কখনো কাঁদ কাঁদ মুখ ও শুষ্ক কঠিন মেজাজে থাকাকে খোদাভীরুতার অনন্য উপায় মনে করে। অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু মানুষ হয়েও রাসূল (সা) কখনো কখনো রসিকতাও করতেন। একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (সা)-এর এরূপ রসিকতা দেখে অবাক হয়ে বলেন, "আপনি দেখি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন।" রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ' তা করি। তবে আমি কোন অন্যায় ও অসত্য কথা বলি না।" তাঁর রসিকতার ছোট্ট দুইটি উদাহরণ পেশ করছি।

জনৈক ভিক্ষুক তার কাছে একটা বাহক উট চাইল। রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা দেব। ভিক্ষুক অবাক হয়ে বললো, 'আমি ওটা দিয়ে কি করবো'? রাসূল (সা) বললেন– 'প্রত্যেক উটই কোন না কোন উটনীর বাচ্চা হয়ে থাকে।"

আর একবার এক মজলিসে খেজুর খাওয়া হলো, রাসূল (সা) রসিকতা করে খেজুরের আঁটি বের করে করে হযরত আলীর সামনে রাখতে লাগলেন। অবশেষে আঁটির স্তূপ দেখিয়ে বললেন, তুমিতো অনেক খেজুর খেয়েছো দেখছি। হযরত আলী বললেন, আমি আঁটিসুদ্ধ খেজুর খাইনি।

এমনিভাবে জনৈক বুড়ির জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলের রসিকতার বিষয়টিও খুবই পরিচিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, "আমি রাসূল (সা)-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুন যাঁতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমরা নবী (সা)-এর সাথে তাঁর পুত্র হযরত ইব্রাহিমের কাছে প্রবেশ করলাম। তখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

নবী করীম (সা) প্রায়শই যেসব কারণে ক্রন্দন করতেন, সেগুলো হচ্ছে– কোন মৃতের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা, উম্মতের জন্য আশংকা, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি। তিনি চীৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করতেন এবং তাঁর কান্না ছিল মৃদু স্বরে।

রাসূলুল্লাহর কেরাত পদ্ধতি

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর কেরাতের ধরন ছিল পৃথক পৃথকভাবে পড়া। তিনি এক এক আয়াত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেন। 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'

www.pathagar.com

বলে থেমে যেতেন। 'আর রাহমানির রাহীম' বলে আবার থেমে যেতেন। এভাবেই পুরো পড়তেন।" (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) টেনে টেনে কোরআন পড়তেন। যেমন, 'বিসমিল্লাহ' বলে টেনে পড়তেন।" (বুখারী, আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর কেরাত কখনো চুপে চুপে হত, আর কখনো হত সশব্দে।" (আবু দাউদ, তিরমিযি)। তিনি আরো বলেন, "রাসূল (সা) তিন দিনের কম সময়ে কোরআনের খতম করতেন না।"

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন– "নবী করীম (সা) তেলাওয়াতের সময় যখন কোন ভয়ের আয়াত পড়তেন, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসতো তখন আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করতেন, আর যখন আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতার কথা আসতো তখন তাসবীহ অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন।" (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "তোমরা কোরআনকে বালি ছিটানোর মতো ছিটিয়ে দেবে না বা কবিতার মতো দ্রুত আবৃত্তি করবে না। কোরআনের আশ্চর্য বাণী থেমে ও বুঝে পড়বে। কোরআন দিয়ে হৃদয়কে নাড়া দিবে। কখন সূরার শেষে পৌঁছাব। এই চিন্তা করে কখনো কোরআন তিলাওয়াত করবে না।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "গায়িকা তার গানের প্রতি যতটা একাগ্র থাকে, আল্লাহতায়ালা সুকণ্ঠে ও সশব্দে কোরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত তার চেয়েও অধিক কান লাগিয়ে শোনেন।" (সুনানু ইবনে মাজা)

রাসূলুল্লাহর পানাহার

রাসূল (সা) এর পানাহার পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত ছিমছাম ও ভদ্রজনোচিত। তিনি গোশত খেতে খুবই পছন্দ করতেন। গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটি টুকরো টুকরো করে ভিজিয়ে রেখে 'ছারীদ' নামক যে উপাদেয় আরবীয় খাবার তৈরী করা হতো, সেটাও তিনি খুবই পছন্দ করতেন। অন্যান্য প্রিয় খাবারের মধ্যে মধু, শির্কা ও মাখন ছিল অন্যতম। দুধের মালাই ও খেজুর খেতেও ভালবাসতেন।

রাসূল (সা) এক এক ব্যক্তির আলাদা আলাদাভাবে খাওয়া দাওয়া করা পছন্দ করতেন না। একত্রে বসে খাওয়ার উপদেশ দিতেন। চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করাকে নিজের বিনয়ী স্বভাবের বিপরীত মনে করতেন। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া একেবারেই হারাম করে দিয়েছেন। কাঁচ, মাটি, তামা ও কাঠের পাত্র ব্যবহার করতেন। দস্তরখানের উপর হাত ধোয়ার পর জুতা খুলে বসতেন। ডান হাত দিয়ে নিজের সামনের দিক থেকে খাবার তুলে নিতেন। পাত্রের মাঝখানে হাত দিয়ে খাবার নিতেন না। হেলান দিয়ে বসে খেতেন না। কখনো দুই হাঁটু খাড়া করে এবং কখনো আসন গেড়ে বসতেন। প্রতি গ্রাস খাবার মুখে তোলার সময় বিসমিল্লাহ পড়তেন। যে খাদ্যদ্রব্য অপছন্দ হতো কোন দোষ উল্লেখ

www.pathagar.com

না করেই তা বাদ দিতেন। বেশী গরম খাবার খেতেন না।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, "রাসূল (সা) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাইতেন এবং ঐ আঙ্গুলগুলো চাটতেন।" (মুসলিম, আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "রাসূল (সা) কোন উঁচু স্থানে খাদ্য রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট বাটি-পিরিচেও খানা খাননি।" (বুখারী, তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) কদুকে ভালবাসতেন।" (তিরমিযী, নাসায়ী)

আমর ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন যে, তিনি নবী (সা)-কে হাতে ছাগলের একটি বাহু ধরে (ছুরি দিয়ে) কেটে কেটে খেতেন দেখেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) এর কাছে যখন খানা আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'হাদিয়া' বলা হলে খাইতেন আর 'ছদকা' বলা হলে খাইতেন না।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা) দাওয়াত কখনো ফেরৎ দিতেন না। তাঁর নিকট পানীয় হিসাবে সর্বাধিক প্রিয় ছিল মিষ্টি ঠাণ্ডা পানীয়। তিনি পানি খাওয়ার সময় ঢক ঢক শব্দ করতেন না এবং সাধারণত তিনবার মুখ সরিয়ে শ্বাস নিয়ে পানি খেতেন। প্রতিবার বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ ও আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করতেন। ওজুর পানি ও জমজম কূপের পানি তিনি দাঁড়িয়ে খেয়েছেন। দাঁড়িয়ে খাওয়ার বিষয়টি তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাই এ ব্যাপারে বলেছেন– কাউকে যদি এর পরিণাম জানানো হতো তবে সে তার আংগুল গলার মধ্যে ঢুকিয়ে তা বমি করে ফেলে দিত।

রাসূল (সা) মজলিসে একটি দানাও যেন নষ্ট না হয় সেদিকে যেমন নিজে নজর দিতেন তেমনি সাহাবীদেরকেও শিক্ষা দিতেন। খাওয়া শেষে হাত ধুতেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করে জীবিকা ও বাড়ীওয়ালার জন্য বরকত কামনা করে দোয়া করতেন।

রাসূলুল্লাহর নিদ্রা

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর অন্তর কোন দিন ঘুমাতো না।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইমরান (রা) বলেন, "নবী (সা) যখন ঘুমাতেন তখন আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, কেননা আমরা জানতাম না, ঘুমের মধ্যে তাঁর কি ঘটছে।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর নাক ডাকতো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) রাতের শুরুতে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থাকতেন।" (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন ঘুমাতেন তখন ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রেখে বলতেন- 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহইয়া'। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাই হিন্নুশুর।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) যখন 'জানাবাত' অবস্থায় ঘুমাতেন তখন লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলতেন এবং সালাতের ন্যায় অজু করতেন।" (বুখারী, মুসলিম)

এছাড়াও বিছানা নিজ লুঙ্গি দিয়ে ঝেড়ে শুইতেন এবং উম্মতকে বিছানায় শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে এরূপ করতে বলেছেন। কোরআনের সূরা পড়া ব্যতিত এবং আরো বেশ কিছু দোয়া পড়ার পূর্বে তিনি ঘুমাতেন না। ঘুমকেও মৃত্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি

রাসূল (সা)-এর একটি বিরাট পাত্র ছিল, তাতে চারটি আংটা লাগানো ছিল। একটি বড় রেকাবী ছিল- যার নাম ছিল 'গাররা।' চারজন ধরে তা তুলতে হতো। একটি কাপড়খণ্ড ছিল, যা দিয়ে তিনি কখনো কখনো ওজুর পানি শুকাতেন। একটি কাঠের পাত্র ছিল- যা তাঁর চৌকির নীচে থাকতো। তিনি তাতে রাতের বেলা পেশাব করতেন। জাফরান রংয়ের একটি লেপ ছিল। একটি আতরদান ছিল- যা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহর পতাকার রং ছিল কালো। নুযার কাঠের তৈরী একটি উত্তম পেয়ালা ছিল চামড়ার উপর খেজুর পাতার গাঁথুনী দিয়ে তাঁর বিছানা তৈরী ছিল।

রাসূলুল্লাহর কিছু আচার-ব্যবহার

রাসূল (সা) ছিলেন লোকজনের মধ্যে সর্বাধিক চরিত্রবান। সবার চেয়ে বেশী দানশীল ও সবচেয়ে বাহাদুর। তাঁর চরিত্র ছিল জীবন্ত কোরআন। উত্তম চরিত্রসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য তিনি প্রেরিত হন। যখনই তাকে দুটো দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দুটোর মধ্যে সহজতরটিকে গ্রহণ করেছেন- যদি তাতে পাপের আশংকা না থেকে থাকে। কিন্তু যদি তাতে পাপের আশংকা থাকতো তবে তিনি তা থেকে অতিশয় দূরে সরে যেতেন। তিনি ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি বা কষ্টের কারণে কারো উপরে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; কিন্তু যদি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মর্যাদা ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করা হতো তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিনি তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তেন। যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত নিজ হাতে কাউকে কোন সময় প্রহার করেননি। নিজের খাদেম বা স্ত্রীকেও প্রহার করেননি। তিনি কাউকে গালি দিতেন না এবং অশ্লীলভাষী ও অভিসম্পাতকারীও ছিলেন না। তিনি বাজারে গিয়ে কখনো শোরগোল করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নিতেন না। তিনি উদার মনে ক্ষমা করে দিতেন এবং ক্ষমাকেই সর্বদা উত্তম বলেছেন।

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমি দশটি বৎসর রাসূলুল্লাহর খেদমতে ছিলাম। আমাকে কখনো উফ্ শব্দ বলেননি, কোন কাজ (উল্টো) করে ফেললে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, কেন করেছো? আর কোন কাজ না করে থাকলেও বলতেন না যে, কেন করনি। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, "রাসূল (সা) অন্তপুরবাসিনী কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর তিনি যখন কিছু অপছন্দ করতেন তখন তা তাঁর চেহারা দেখেই আঁচ করা যেত।" (বুখারী)

রাসূল (সা) নিজ কাপড় সেলাই করতেন, বকরী থেকে দুধ দোহন করতেন, গাধায় সওয়ার হতেন, জুতা মেরামত করতেন। অন্য লোকেরা নিজ নিজ ঘরে যে কাজ করে থাকেন তিনিও তা করতেন। নিজের কোরবানীর পশু নিজেই জবাই করতেন। তিনি যমযমের পানি বহন করতেন। তিনি কোন বিধবা বা মিসকীনের সাথে চলতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি ছোটদেরও সালাম করতেন। যখন বৈঠকাদিতে যেতেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াক তিনি তা পছন্দ করতেন না। এক ব্যক্তি তার সাথে কথা বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি স্থির হও, আমি কোন সম্রাট নই, আমি তো এক কুরাইশী মহিলার সন্তান। তিনি বলতেন– আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ পাক আমাকে যেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তার চেয়ে উপরে তোমরা আমাকে স্থান দাও– তা আমি পছন্দ করি না। তিনি আরো বলেছেন– "তোমরা আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে করেছিল নাসারারা। আমি একজন আল্লাহর বান্দা। তবে তোমরা বলবে– 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" (বুখারী)

রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন– "একবার এক বেদুইন মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। লোকজন এতে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূল (সা) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করার জন্য প্রেরণ করেছেন, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।" (বুখারী, নাসায়ী)

হযরত যাবের (রা) বলেন– রাসূল (সা) এর নিকট কেউ কিছু চাইলে তিনি কোনদিন না বলেননি। হাতে না থাকলে কখনো অন্যের কাছে থেকে ধার করে এনে দিতেন। তাও না পারলে পরে আসতে বলতেন অথবা চুপ থাকতেন।

রাসূল (সা) সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি আগামীকালের জন্য কিছু জমা রাখতেন না। কারো খারাপ নাম শুনলে ভাল নাম রেখে দিতেন। কখনো কোন ভয়ভীতি মনে

www.pathagar.com

আসলে বলতেন– "আল্লাহ আল্লাহ রাব্বী লা শারীকালাহু।" কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই তাড়াতাড়ি নামায পড়তেন। কোন খুশীর খবর পেলে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেজদা করতেন। তাঁর কাছে সব চাইতে খারাপ চরিত্র ও অপছন্দনীয় ছিল মিথ্যা। কোন জিনিস দেয়া ও নেয়ার কাজ ডান হাত দিয়েই সম্পন্ন করতেন। বাহক জন্তুর মধ্যে ঘোড়াই বেশী প্রিয় ছিল তাঁর। বলতেন– ঘোড়ার মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে। তিনি সমগ্র দেশবাসীর বিরোধিতা ও অত্যাচারের মুখেও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কঠিন পাহাড়সম ধৈর্য ধারণ করতেন।

রাসূলুল্লাহর বয়স

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত মুয়ায়বিয়া (রা) বলেন, "রাসূল (সা) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি।" এভাবে বয়সের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা) অনুরূপ বলেন। (মুসলিম)

স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন– "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে আমাকেই দেখবে, কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন– "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।" (শামায়েলে তিরমিযী)

শামায়িলুন নববীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পেশ করা হলো। এই বিষয়ে আরো ব্যাপক জ্ঞানার্জন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থসমূহ থেকে আন্তরিকতার সাথে অধ্যয়নের দ্বারা আমরা নবীজীর সুন্দরতম আদর্শ উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। ■

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) অনুসরণ

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

□

এক.

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন– 'সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারবে– সে ইয়াহুদি কিংবা নাসারা হোক, আর আমি যে দীনসহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।'– মুসনাদে আহমদ

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়্যত দুনিয়ার সমগ্র মানুষের জন্য–

যে কোন লোকই রাসূলের (সা) আগমন সম্পর্কে সংবাদ পাওয়ার পর, সে যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন, সে যদি রাসূলের নবুয়্যত বিশ্বাস না করে এবং তিনি যে দীনসহ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন তার প্রতি ঈমান না আনে, আর এই অবস্থায়ই যদি সে মারা যায়, তবে তার জান্নাতবাসী হওয়া সম্ভব নয়; বরং সে জাহান্নামী হবে। কেননা পরকালীন মুক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমানের উপর, আর সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। অতএব তাঁর প্রতি ঈমান না এনে ও তাঁর আনীত দীন বিশ্বাস না করে কেউ পরকালীন মুক্তি লাভে সমর্থ হতে পারে না।

আলোচ্য হাদিসে ইয়াহুদি ও নাসারাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এরা আসমানী কিতাবধারী উম্মত, অর্থাৎ তাদের উপর নবী রাসূল এসেছিলেন। তারা তাদের অনুসরণ করত কিন্তু শেষ নবী আসার পর তাদের ওপর বিশ্বাসের পাশাপাশি শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস ও তার অনুসরণ করা ফরজ। আর তারাও শেষ নবীর প্রতি ঈমান না এনে মুক্তিলাভ করতে পারবে না, তখন অন্যদের– যাদের কোন আসমানী কিতাব নেই, তাদের তো কোন কথাই নেই। এই কথা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল দীন ও ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। তবে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে কিন্তু অনুসরণ করা যাবে না। রাসূল (সা) এর উপস্থাপিত ইসলামই এখন একমাত্র দীন হিসাবে মেনে চলতে হবে। সকল ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর কথা উল্লেখ আছে। এই কারণে ইয়াহুদি ও নাসারা

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের লোকগণ যত সহজে ও নিশ্চিতরূপে হযরত মুহাম্মাদকে (সা) সর্বশেষ নবীরূপে চিনতে পারে, তেমনি আর কেউ পারে না। কেননা তাদের কিতাবেই শেষ নবীর পরিচয় লিখিত রয়েছে, এই দৃষ্টিতে তারা যদি খালেসভাবে শেষ নবীকে চিনতে চেষ্টা করে তবে অতি সহজেই চিনতে পারে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: 'তারা তাঁর সম্পর্কে তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত (বিবরণ) পায়।'– আল আ'রাফ-১০৯

তবে যে লোক রাসূলের প্রচারিত দীন সম্পর্কে কোন কথাই জানতে পারেনি, তারা আল্লাহর নিকট হয়ত নির্দোষ প্রমাণিত হবে এবং মুক্তিলাভ করতে পারবে।

আসুন আমরা রাসূলের (সা) অনুসরণ করি এবং সুন্দর জীবন গড়ি।

দুই.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তির মালিকানাধীন উন্মুক্ত মাঠে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, কিন্তু সে তা পথিক-মুসাফিরদের ব্যবহার করতে দেয় না। (২) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির কাছে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে গিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, আমি এগুলো এত এত মূল্যে ক্রয় করেছি। ক্রেতা তা বিশ্বাস করলো, কিন্তু সে তা উক্ত মূল্যে ক্রয় করেনি (মিথ্যা শপথ করেছে)। (৩) আর যে ব্যক্তি ইমামের (নেতার) কাছে শুধুমাত্র পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বাইআত গ্রহণ করলো। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ প্রদান করে তবে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না।- বুখারী ও মুসলিম

মানুষ মনুষের জন্য

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সেরা হওয়ার পরও তাদের একজনকে আর একজনের মুখাপেক্ষী হতে হয়। একজন আরেকজনের থেকে সেবা গ্রহণ করতে হয়, আর এটাই মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মাধ্যম। কিন্ত সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের দ্বারা অন্য কেউ উপকার লাভ করতে পারে না। তাদের আচরণ ও তাদের চাল চলনে মানুষ দূরে সরে যায়। অথচ সূরা মাউনে বলা হয়েছে 'তাদের ধ্বংস যারা সাধারণ ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।'

তাই বলা যায়, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর সৃষ্টির কি কি সেবা করে আল্লাহকে খুশী করা যায় এবং আখেরাতে লাভবান হওয়া যায় সে চেষ্টা করে। আর যারা ধান্ধাবাজ তারা দুনিয়ার কল্যাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা মানুষের অথবা কোন সৃষ্টিজীবের উপকার করে না।

www.pathagar.com

আমাদেরকে পরোপকারী মানুষ হয়ে সমাজের সেবা করা এবং ধান্ধাবাজদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

মিথ্যা কসম করা অপরাধ

কথায় কথায় কসম করা ভাল মানুষের কাজ নয়। এরপর আবার মিথ্যা কসম! কল্পনাই করা যায় না। মানুষকে প্রতারণা করে অর্থনৈতিক লাভ বা অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য কসম করা জঘন্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। কেনা-বেচার মধ্যে এ ধরনের মিথ্যা কসম করলে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

দুনিয়ার লাভ আসল লাভ নয়

'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র'। অন্য হাদীসে আছে, "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য বেহেশত।" অথচ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য কতিপয় লোক নেতাদের পিছনে ঘুরে। যখন স্বার্থ আদায় হয়ে যায় তখন দূরে সরে যায়। আর যারা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় তাদের জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবে না।

আমাদের উচিত ধোঁকাবাজ, প্রতারকদের থেকে দূরে সরে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক করা। শুধু দুনিয়ার স্বার্থের জন্য কারও পেছনে ঘোরা মুমিনের কাজ নয়।

তিন.

যেসব লোক ঘোষণা দিলো আল্লাহ আমাদের রব। পরে তার উপর অটল থাকলো, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এবং বলে তোমরা ভয় পেও না এবং চিন্তা করো না। এবং তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (যে ওয়াদা আল্লাহ তোমাদের সাথে করেছেন।)

ফেরেশতারা বলতে থাকে- আমরা এই দুনিয়াতে এবং পরকালেও তোমাদের সংগীসাথী। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে এবং সেখানে তোমরা যে কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করবে তাই পাবে। অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ও মহান দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা অবতীর্ণ (মেহমানদারী)।

আর সে ব্যক্তির কথার চাইতে কার কথা অধিক ভালো যে আল্লাহর দিকে ডাকলো এবং ভাল কাজ করলো এবং বললো আমি মুসলমান।

(হে নবী আপনি জেনে রাখুন) ভাল এবং মন্দ দু'টি এক হতে পারে না। আপনি অন্যায় এবং মন্দকে দূর করুন খুব ভাল দিয়ে। (যখন এমনি আচরণ করবেন।) আপনি দেখবেন আপনার ও তাদের মধ্যে যে শত্রুতা ছিলো হঠাৎ এক সময় তারা প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

যারা ধৈর্যশীল তারাই শুধু এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আর এই মর্যাদার অধিকারী তারাই হবে যারা খুব বড় ভাগ্যবান। -সূরা হামিম আস সাজদা ৩০-৩৫

www.pathagar.com

আল্লাহকে রব ঘোষণা দেয়া

রব শব্দের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহকে 'রব' বলে স্বীকৃতি দেয়ার পরে সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ এবং এর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, বিশ্বাসের উপর অটল থেকে সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং এ বিশ্বাসকে বাস্তব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা– তাহলেই তাদের জন্য ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করা হবে, তাদের সাহায্যে তারা সদা তৎপর থাকবে। এই সাহায্য সহযোগিতা দু'ভাবে হয়ে থাকে:

সরাসরি আল্লাহর সাহায্য

সরাসরি আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে সেনাবাহিনী হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রেরণ করে থাকেন। এ অবস্থায় সাহায্যকারী ফিরিশতাদেরকে দেখা যেতেও পারে নাও পারে। এ ধরনের সাহায্য প্রেরণ রাসূলের (সা) জীবনে অনেক ঘটেছে। এখানে শুধু দুটো ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে! (ক) রাসূল (সা) এর হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রা) সহ যখন দুশমনদের ক্ষতির ভয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন আল্লাহ সরাসরি সাহায্য দান করেছিলেন।

'তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করলেন যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।' (সূরা আত তাওবা-৪০)

পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাহায্য

পরোক্ষভাবে সাহায্য যা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অন্তরের অনুভূতির সাথে জড়িত। যখন মুমিনগণ চরম নির্যাতন ও অসহায় অবস্থায় পড়ে তখন তাদের অন্তকরণে প্রশান্তি, মনে সাহস, ঈমানের মজবুতি, চরম ধৈর্যধারণ ক্ষমতা, সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ অথবা মৃত্যুর সময় সান্ত্বনা ও হাশরে কঠিন সময়ের সাহায্য ইত্যাদি।

ভাল আর মন্দ সমান নয়

যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার, তাহলো ভালো মন্দ কখনো সমান হতে পারে না, একথা মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি আমাকে গালি দিলে বা আঘাত করলে বা অস্ত্র ব্যবহার করলে আমি বা আমাদেরকেও করতে হবে। এ চিন্তা আসলে ভালো মানুষের লক্ষণ নয়। পক্ষান্তরে মন্দ ও অন্যায়ের প্রত্যুত্তর ভালো ও ন্যায় দিয়ে দিতে না পারলে মনে করতে হবে আমরা ভালো মানুষ হতে পারি নি। আমরা শক্তিবলে বা গায়ের জোরে এই নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবো। অতএব বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে এই নীতি অবলম্বন করে আমাদেরকে দায়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারি। ■

www.pathagar.com

বার্ষিক প্রতিবেদন
সেপ্টেম্বর ২০০২-এপ্রিল ২০০৩
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

□

চলতি দশকে হাতেগোনা যে কয়টি সাহিত্য সংগঠন তাদের কর্মতৎপরতা দিয়ে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া জাগাতে পেরেছে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যে আলোচিত হচ্ছে একটি নাম- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে এপ্রিল ২০০৩ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সাহিত্য সংস্কৃতি [সীরাতুন্নবী সংখ্যা ২০০২]

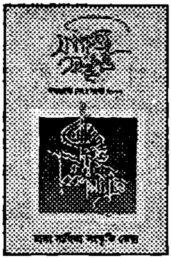

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় ২০০২ সালের নভেম্বরে একটি সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশ করে। বিশাল আয়োজনের এই সীরাত সংকলনে লিখেছেন এদেশের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, গবেষক এবং কথাশিল্পীরা। সম্পাদনায় কবি আসাদ বিন হাফিজ। গুরুত্বপূর্ণ এই সীরাত সংকলনটির মূল্য রাখা হয়েছিল মাত্র চল্লিশ টাকা। সুধী মহলে সংকলনটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

বিজয় দিবস ২০০২ উপলক্ষে নিউজ ব্যাংক মিলনায়তনে ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা, ছড়া-কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গানের আসর। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান মেহমান ছিলেন কবি আল মাহমুদ। বিশেষ মেহমান বাংলা একাডেমীর পরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন কবি আবদুল হাই শিকদার। কেন্দ্রের উপদেষ্টা ডাঃ রেদওয়ানুল্লাহ শাহেদী শহীদদের জন্য মুনাজাত করেন। উপস্থাপনায় ছিলেন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও কবি জাকির আবু জাফর।

কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, সালেম সুলেরী, মারুফ রায়হান, জাকির আবু জাফর সহ নবীন-প্রবীণ কবিবৃন্দ। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ, আবৃত্তি করেন আহসান হাবীব খান।

ইফতার মাহফিল ২০০২

বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ২ রমজান রমনা রেস্তোরাঁয় আয়োজন করা হয় ইফতার মাহফিলের। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের

www.pathagar.com

ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী জনাব মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান

সভাপতিত্বে পবিত্র এ মাহফিলে প্রধান মেহমান ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার, ফুলকুঁড়ি পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ও জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবুল আহমদ। রমনা গ্রীনের ছায়া সুনিবিড় স্থানে এ মহতি মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দেশের খ্যাতনামা কবি, সাংবাদিক, শিল্পী এবং সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন ইউনিটের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

একুশের বই মেলায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

বাংলা একাডেমী আয়োজিত বই মেলা ২০০৩ এ এই প্রথম ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র স্টল

www.pathagar.com

নেয়। শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডলের পরিকল্পনায় আকর্ষণীয় করে সাজানো হয় স্টলটি, স্টলে কেন্দ্রের অধিকাংশ প্রকাশনা সামগ্রীর পাশাপাশি জনশক্তিদের লেখা বই ও অডিও ক্যাসেট সিডি ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। অন্য যে কোন স্টলের তুলনায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের স্টলটি ছিল ভিন্ন সাজে সজ্জিত।

ঈদের কবিতা পাঠের আসর

একজন কবিকে সব সময়ই জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুতরাং কবিকে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েই কাব্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। জাতির কাছে যারা প্রতিশ্রুতি দেন তাদের একটি বই প্রকাশ হওয়া মানে জাতির কাছে পরীক্ষা দেয়া। প্রতিটি বই-ই তাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সত্যিকার অর্থে সাহিত্যিক হতে চাইলে পুরো জীবনটা সাহিত্যের জন্য উৎসর্গ করতে হয়।

৬ ফেব্রুয়ারী পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখা আয়োজিত ঈদের কবিতা পাঠের আসরে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ উল্লিখিত মন্তব্য করেন। নিউজ ব্যাংক হলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার, কবি ও ছড়াকার আসাদ বিন হাফিজ, কবি সালেম সুলেরী, কবি আবিদা শিকদার ও কবি জাকির আবু জাফর। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার মহিউদ্দিন আকবর এবং আলোচনায় অংশ নেন শিশু সংগঠক হুমায়ুন কবির সবুজ।

সাধারণ সম্পাদক ছড়াকার নূরুজ্জামান ফিরোজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ জমজমাট ঈদের কবিতা পাঠের আসরে অর্ধশতাধিক কবি ও ছড়াকার ঈদের কবিতা পাঠ করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। মাওলানা মাসুম বিল্লাহ আসরে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং হামদ ও নাত পরিবেশন করেন ওমর বিন আলী ও আল আমীন। পরিশেষে উপস্থিত সুধী ও কবিদের আপ্যায়ন করার ফাঁকে কবি আসাদ বিন হাফিজ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র পল্টন শাখার ২০০৩-০৪ সেশনের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

ঈদের কবিতা পাঠের আসরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের মৌলিক চেতনা যুগে যুগে কৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়েছে। তাই আমাদেরকে মূলেই থাকতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারী ০৩ সকালে পল্টন কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এশিয়ান ফেডারেশন অব মুসলিম ইয়থ-এর এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল এই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে দারসে কুরআন পেশ করেন প্রখ্যাত কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক ও কণ্ঠশিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি মোশাররফ হোসেন খান। শাখা সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ছড়াকার নূরুজ্জামান ফিরোজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই ঈদ পুনর্মিলনীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি মুশাররফ আখন্দী, কবি নূর-ই আউয়াল, ছড়াকার মানসুর মুজাম্মিল, কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, জাকারিয়া আজাদ, আরিফ নজরুল, মহিউদ্দিন আকবর প্রমুখ।

কবি মোশাররফ হোসেন খান বলেন, পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য যারা কাজ করেন তারাই টিকে থাকবেন। অন্যরা বিলীন হয়ে যাবে।

প্রধান বক্তার ভাষণে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, দুনিয়াতে পাওয়ার চেষ্টা করলে অতৃপ্তি এসে যায় বরং দেয়ার চেষ্টা করলে মনে তৃপ্তি পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে হামদ পরিবেশন করেন শিল্পী গোলাম নবী পান্না।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন প্রত্যয়-চলচ্চিত্র ইউনিট

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাসাস কেন্দ্র চলচ্চিত্র ইউটিটের উদ্যোগে ২৫ মার্চ ২০০৩ নিউজ ব্যাংক মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিটিভি'র সাবেক পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা। মঞ্চে কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, চলচ্চিত্র পরিচালক হাফিজ উদ্দিন, মতিন রহমান ও চলচ্চিত্র ইউনিটের সভাপতি হাসান আখতার

www.pathagar.com

১লা এপ্রিলের র‍্যালীতে শিশু কিশোররা বিভিন্ন লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে

সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি.টি.ভি-র সাবেক পরিচালক জনাব গোলাম মুস্তাফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব মতিন রহমান ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব হাফিজ উদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। চলচ্চিত্র ইউনিটের সভাপতি জনাব হাসান আখতার অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম শিল্পের সবগুলো শাখা যার মধ্যে বিদ্যমান। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ এ মাধ্যমকে তাই বেছে নিয়েছে। আমাদের দেশে কিছু কিছু অসাধু ব্যক্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে অসুস্থ চলচ্চিত্র তৈরীর মাধ্যমে যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রকে এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

১লা এপ্রিল বিশ্ব মুসলিম গণহত্যা দিবস পালনের দাবীতে সমাবেশ ও র‍্যালী

এপ্রিল ফুল নয়, বরং ১লা এপ্রিলকে বিশ্ব মুসলিম গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের দাবীতে ও ইঙ্গ মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেইটে গত ১লা এপ্রিল বিকেল ৪.৩০ মিনিটে শিশু কিশোর ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে এক র‍্যালীর আয়োজন করে। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর-এর সভাপতিত্বে র‍্যালী-পূর্ব এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শাহিন হাসনাত, কেন্দ্রের প্রচার সম্পাদক আবেদুর রহমান, অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

বক্তারা বলেন, ১৪৯২ সালের এই দিনে বিশ্ব সভ্যতা ও মানবতার জন্য হুমকীস্বরূপ খুনী খৃস্টান বাহিনী নজিরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লাখ মানুষকে ঐতিহাসিক গ্রানাডা শহরের বিভিন্ন মসজিদে অবরুদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল।

—২০

www.pathagar.com

স্পেনের আটশত বছরের গৌরবময় মুসলিম শাসনের শেষ দিকে যখন মুসলমানরা কোরআন সুন্নাহ ছেড়ে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে খৃস্টান জগৎ স্পেনের মাটি থেকে মুসলমানদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ইতিহাস না জানার কারণে মুসলিম বিশ্ব এই এপ্রিল ফুল পালন করে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য। তাই ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র গণসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে বিগত ৫ বছর যাবৎ এই দিবস পালন করে যাচ্ছে। বক্তারা আরো বলেন, ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী শক্তি ইরাকে যে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তার সাথে যোগ দিয়েছে সেই স্পেন। উদ্দেশ্য একই, দুনিয়া থেকে মুসলিম উচ্ছেদ করা।

বক্তাবৃন্দ অতিসত্বর ইরাকে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানান। এই যুদ্ধ মানবতা বিরোধী। এই যুদ্ধ শুধু ইরাকেই ৫ লাখ প্রতিবন্ধি শিশুর জন্ম দেবে। বক্তারা যুদ্ধ অপরাধী ও বিশ্বসন্ত্রাসী হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালতে বুশ, ব্লেয়ার ও স্পেনের রাজার বিচার দাবী করেন। র‍্যালীতে আরও অংশ নেন নাট্যকার শাহ আলম নূর, গবেষক মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, লেখক কবি নাসির হেলাল, লেখক আবদুর রহিম খান, শিল্পী ইব্রাহিম মণ্ডল, জনাব হাসান মূর্তাজা, হাসান আখতার, জনাব নূরুল ইসলাম, কবি জাকির আবু জাফর সহ বিপুল সংখ্যক সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিশুরা। এ র‍্যালীটি রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে মুক্তাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে পল্টন শাখা কর্তৃক 'এন্টি মিসাইল' শীর্ষক একটি যুদ্ধ বিরোধী ছড়া বুলেটিন বের হয়।

বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪১০

বিগত ১লা বৈশাখ ১৪ এপ্রিল রমনা পার্কের পূর্ব গেইট সংলগ্ন সবুজ চত্বরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মহানগর সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে বাংলা ১৪১০ সাল বরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট

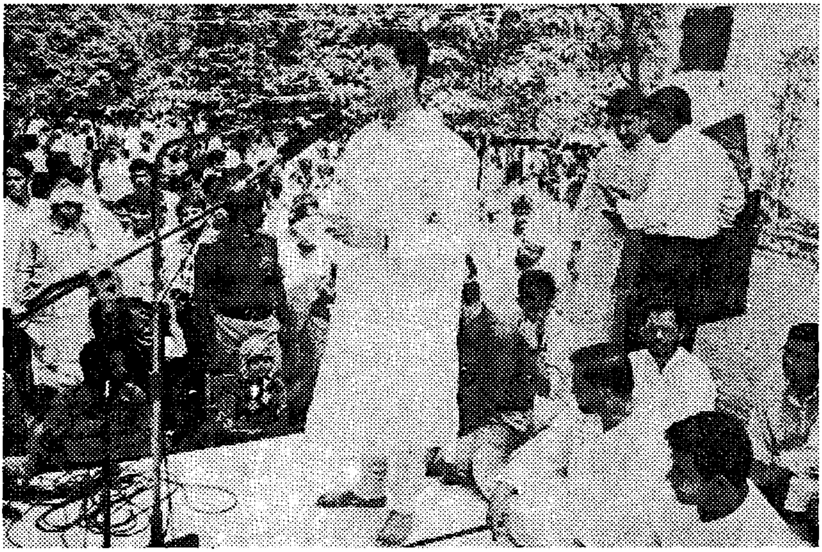

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ. ন. ম. এহসানুল হক মিলন

www.pathagar.com

লোকবিজ্ঞানী ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান ছিলেন মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আলোচনায় অংশ নেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিশিষ্ট লেখক জনাব মাহবুবুল হক ও লন্ডনস্থ মেসেস কালচারাল গ্রুপের সেক্রেটারী জনাব মোঃ মুহিব রাহমানী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। উপস্থাপনায় ছিলেন শাখার সেক্রেটারী ইয়াকুব বিশ্বাস এবং নাট্য ও প্রচার সম্পাদক আহসান হাবীব খান।

প্রধান মেহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ববৃহৎ গণমুখী উৎসব। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসী এই দিনে বর্ষবরণের আনন্দে সামনে চলার পথ খুঁজে পায়। বাংলা নববর্ষ বাঙালী মুসলমানদের আনন্দের দিন, কারণ ইসলামী হিজরী সনের ভিত্তিতেই বাংলা সাল বিকশিত। বক্তারা বলেন নববর্ষ আমাদের আত্মজাগৃতির দিন। বৈশাখী মিলনের বন্ধন আমাদের জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে।

কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি সাঈদ আহমদ, কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, মনসুর আজীজ, শরীফ আবদুল গোফরান, জাকির আবু জাফর, নাসির হেলাল, হাসান আলীম ও আসাদ বিন হাফিজ। উপস্থিত ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান এবং ঢাসাস কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও সেক্রেটারীবৃন্দ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে শিল্পী মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর নেতৃত্বে উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠী, শিল্পী ও গীতিকার লিটন হাফিজ চৌধুরীর নেতৃত্বে সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী, শিল্পী ও সুরকার মশিউর রহমান এর নেতৃত্বে মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। পরিশেষে মহানগর নাট্য সংসদের অভিনেতা শাহজাহান কবির, আবদুল আহাদ শোয়েব, আহসান হাবীব, সালাউদ্দিন সুমন, আবদুল্লাহ মারুফ ও রেদওয়ান মাহমুদ অভিনীত হাবীব আহসান রচিত নাটিকা 'বিবৃতি প্রদান ছাউনি' মঞ্চস্থ করে। মাননীয় প্রধান মেহমানসহ সহস্রাধিক দর্শক শ্রোতা প্রাণভরে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এখানে উল্লেখ্য, রমনা পার্কে ইসলামী কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন এই প্রথম মঞ্চ করে অনুষ্ঠান করতে পারল যা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪১০ উপলক্ষে ঢাসাস কেন্দ্র মহানগর সংস্কৃতি সংসদ শাখা প্রকাশ করে 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে' শীর্ষক ছোট্ট কলেবরের একটি স্মারক। শরীফ বায়জীদ মাহমুদ সম্পাদিত এই স্মারকে বৈশাখের গান লিখেছেন– কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও নূর-ই আউয়াল। কবিতা লিখেছেন– কবি মোশাররফ হোসেন খান, হাসান আলীম, শরীফ আব্দুল গোফরান, ইব্রাহীম মন্ডল, কচি চৌধুরী, জাকির আবু জাফর, মানসুর মুজাম্মিল, আলতাফ হোসাইন রানা, ওমর বিশ্বাস, সিরাজ মুহাম্মদ, আমীন আল আসাদ, মোজ্জাম্মেল প্রধান, কাজী তাবাসসুম, উম্মে হানি পারভিন, ইয়াকুব বিশ্বাস ও শাকিল মাহমুদ। প্রবন্ধ লিখেছেন নাসির হেলাল। নিবন্ধ শাহীন হাসনাত, নাটক লিখেছেন, হাবীব আহসান। প্রচ্ছদ শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। সব মিলিয়ে বলা যায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র মহানগর সংস্কৃতি সংসদ শাখার এবারের বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে।

মানসুর মুজাম্মিলের দুটি ছড়ার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব

১৮ এপ্রিল ২০০৩ বিকাল ৪টায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে নিউজ ব্যাংক হলে কবি মানসুর মুজাম্মিলের 'পা চালিয়ে যাও' এবং 'হারিয়ে যাওয়ার দিন' বই দুইটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

www.pathagar.com

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চে কবি আবদুল হাই শিকদারসহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে

ছিলেন এ সময়ের সাহসী ছড়া যোদ্ধা জনাব আবু সালেহ। শাখা সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বই প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি আসাদ বিন হাফিজ, সসাসের সাবেক আহ্বায়ক এইচ আর আযাদ, বিশিষ্ট সংগঠক ও সাহিত্যিক মাহবুবুল হক, কবি ফারুক নওয়াজ, কবি সালেম সুলেরী, কবি বেগম রাজিয়া হোসাইন এবং কবি আতিক হেলাল। প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি মহিউদ্দিন আকবর।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশ-মা-মাটির জন্য যারা নিরলসভাবে লিখে যায় জাতি তাদের একদিন স্মরণ করবেই। মানসুর মুজাম্মিল তেমনি একজন যোগ্য ছড়াকার যিনি দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের শিশু-কিশোরদের যোগ্য করে গড়বার জন্য লিখে যাচ্ছেন।

বিশেষ অতিথি কবি আবদুল হাই শিকদার বলেন, মানসুর মুজাম্মিলের প্রত্যেকটি লেখায় যেমন মেসেজ আছে তেমনি ভাব, ভাষা, ছন্দে নতুনত্ব আছে। তার প্রতিবাদী ছড়া সবাইকে নাড়া দেয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে কবি মহিউদ্দিন আকবর বলেন, মানুসর মুজাম্মিলের প্রত্যেকটি লেখা জাতিকে সজাগ করে দেয়। আর এ দুটি বইয়ে তার বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেছেন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই বই দুটির ব্যাপক প্রচার কামনা করেন।

ইকবাল কবীর মোহন-এর 'ইঙ্গ-মার্কিন বর্বরতা রক্তে রাঙা ইরাক' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ও ঝাল ছড়াসন্ধ্যা

বিগত ২৫ এপ্রিল ২০০৩ বিকাল ৪টায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে নিউজ ব্যাংক হলে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ইকবাল কবীর মোহন-এর 'ইঙ্গ-মার্কিন বর্বরতা রক্তে রাঙা ইরাক' শীর্ষক সম্পাদনা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও ঝালছড়া সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। শাখা সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি

www.pathagar.com

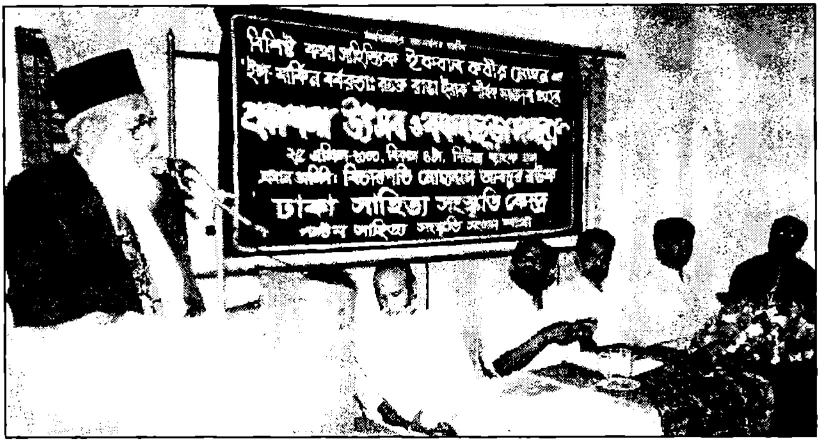

ইকবাল কবীর মোহনের সম্পাদনা গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুর রউফ। মঞ্চে কবি মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, সোলায়মান আহসান ও পল্টন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল ইসলামকে দেখা যাচ্ছে

মতিউর রহমান মল্লিক, কবি আবদুল হাই শিকদার, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী জনাব সোলায়মান আহসান।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী বুশ-ব্লেয়ার চক্র ইরাকে মানব বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাতে সাদ্দামকে নিরস্ত্রিকরণের নামে জাতিসংঘের তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হামলা চালিয়ে ইরাকের তেল সম্পদ দখল করেছে। মূলত সাদ্দামকে নিরস্ত্রিকরণ, ইরাকী জনগণকে মুক্তি কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগান এসব কিছুই মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অজুহাতমাত্র। এই প্রেক্ষিতে এখন থেকেই সারা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামগ্রিক দিক থেকে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং বিশ্বের গ্রেট সন্ত্রাসীচক্রকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সভায় অন্যান্য বক্তা ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন এবং ইকবাল কবীর মোহন সম্পাদিত সময় উপযোগী বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে বইটির প্রচার কামনা ও লেখককে ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে ঝালছড়া সন্ধ্যায় সমাজের সামগ্রিক অন্যায়, অসংগতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বরচিত ছড়া পাঠে অংশ নেন বিখ্যাত কবি ও ছড়াকার মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, মোশাররফ হোসেন খান, নাসির হেলাল, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, মানসুর মুজাম্মিল, জাকির আবু জাফর, সাঈদ আহমেদ, গোলাম নবী পান্না, আরিফ নজরুল, নেয়ামুল আলম, শৈবাল মামুন, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ফাতেমা বিনতে আলী, নার্গিস চমনসহ দেশের খ্যাতিমান কবি ও ছড়াকারবৃন্দ। আবৃত্তি করেন সংবাদপাঠক আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কার্টুন প্রদর্শনী

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী কর্তৃক জাতিসংঘের নিষেধ অমান্য করে ইতিহাসের জঘন্যতম হামলার প্রতিবাদে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র দেশের খ্যাতনামা কার্টুনিস্টদের নিয়ে

www.pathagar.com

ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কার্টুন প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুর রউফ, ডঃ আবদুস সাত্তার, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। বক্তব্য রাখছেন জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী

এক কার্টুন প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় প্রেসক্লাব গ্যালারীর ২য় তলায়। ৩১ মার্চ সকাল ১০ টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সম্মানিত বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুর রউফ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মানিত সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার। শরীফ বায়জীদ মাহমুদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিল্পী তোফাজ্জল হোসেন তোফা। অনুষ্ঠানে ধ্যনবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি জনাব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কার্টুনের ভাষা অত্যন্ত জোরালো, ভাষার মধ্যে যা প্রকাশ করা যায় না ছবি অথবা কার্টুনের মাধ্যমে তার চেয়ে বেশী প্রকাশ করা যায়। তিনি এই কার্টুনকে ঘরের দেয়ালে না রেখে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, বুশ ও ব্লেয়ার চাচ্ছে জাতিসংঘ ভেঙ্গে দিয়ে আগ্রাসী হামলা চালানোর সকল প্রতিবন্ধকতাকে নস্যাৎ করে দিতে। এই যুদ্ধ হচ্ছে পুরো মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য। যে কোনভাবেই হোক এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের দীপ্ত পদভারে যদি কেউ এগিয়ে যায় তবে পরাশক্তিরাও হটতে বাধ্য হবে।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্পী আবদুস সাত্তার বলেন, আজকের এই কার্টুন প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বের সবচাইতে বেশি ঘৃণিত বুশ, ব্লেয়ারকে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, শিল্পীরা এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্ব জনমতের সাথে মিশে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উক্ত প্রদর্শনীতে তোফাজ্জল হোসেন (তোফা), আসিফুল হুদা, শামসুদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, পংকজ পাঠক, ইব্রাহিম মণ্ডলের কার্টুন প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী ৩১-০৩-০৩ থাকে ০২-০৪-০৩ পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ৮ থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত

www.pathagar.com

ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপের সেক্রেটারী মুহিব রাহমানীকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ ও মহানগরের সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এ প্রদর্শনী দেশ ও বিদেশের মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়।

লণ্ডনস্থ মেসেজ কালচারাল গ্রুপের সেক্রেটারী জনাব মুহিব রাহমানীর সংবর্ধনা সভা

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মহানগর সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে গত ৩মে শনিবার বিকেলে লন্ডনস্থ মেসেজ কালচারাল গ্রুপের সেক্রেটারী জনাব মুহিব রাহমানীর সম্মানে এক মতবিনিময় ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলা সাহিত্য পরিষদের কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক শিল্প আবদুর রউফ ও সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক শিল্পী লিটন হাফিজ চৌধুরী। সংবর্ধনার জবাবে জনাব মুহিব রাহমানী বলেন বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকেই আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে মেসেজ কালচারাল গ্রুপ করেছি। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

প্রধান মেহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এখনো খানিকটা অচলায়তন রয়েছে, এই বাধার প্রাচীর আমাদের ভেংগে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে প্রফেশনালিজম বৃদ্ধি করতে হবে। এই বিশ্বায়নের যুগে আমাদের আরো যোগ্যতা বাড়াতে হবে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে আমাদের পাহারাদারের ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

আহসান হাবীব খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে ইসলামী গান পরিবেশন করেন শিল্পী জুবাইর হুসাইন, এস এম শামীমুল হক ও ফয়সাল আমিন কাজী। তেলাওয়াত করেন শিল্পী আবুল

www.pathagar.com

কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানের ১ম পর্ব শেষে দ্বিতীয় পর্বে ছিল আকর্ষণীয় উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক পর্বে সাইমুমের পরিচালক লিটন হাফিজ চৌধুরীর নেতৃত্বে সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীরা যুদ্ধ বিরোধী গান, উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক আবদুর রউফের কণ্ঠে বিয়ের গান সবাইকে মুগ্ধ করে। উপস্থিত শ্রোতারা শিল্পীদের সাথে সাথে কোরাসে কণ্ঠ মিলায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি ওমর বিশ্বাস, রফিক মুহাম্মদ ও সাজ্জাদ বিপ্লব। মতবিনিময়ে অংশ নেন কবি হাসান আলীম ও সরদার ফরিদ আহমদ এবং জনাব মহিব রাহমানী। এ পর্বটির উপস্থাপনায় ছিলেন সংবাদ পাঠক আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। চা-চক্রের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আপ্যায়নটাও জমেছিল বেশ।

ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের চারুকলা বিভাগ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবার ১টি করে প্রশিক্ষণ ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সময়ে ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার, চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শিল্পী সবিহ উল আলম ও বিশিষ্ট শিল্পী রেজাউল করিম।

ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন ফন্ট যেমন কুফি, নাস্তালিক, সুলস, দেওয়ানী ইত্যাদি লিখন পদ্ধতির উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী।

বিভিন্ন রং-এর ব্যবহার যেমন জলরং তেলরং ইত্যাদির উপর ক্লাশ নেন শিল্পী ইব্রাহিম মণ্ডল। এই ছিল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব এবং বিভিন্ন ইউনিটের/শাখার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক

এটিএম কার্ড

আজ। আগামীকাল। আগামী দিনগুলোর জন্য।

আর ক্যাশ নয়-

E-cash

নিরাপদ। সুবিধাজনক। বিশ্বস্ত।

ATM কার্ড এখন মাত্র ৫০০ টাকায়

ATM থেকে যে কোন মুহূর্তে নগদ টাকা তোলা যায়।

গ্রাহকরা যে কোন সময় তাদের বর্তমান জমা-স্থিতি জানতে পারেন।

ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকগণ **হজ্জ সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব, মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব** এবং **গৃহসামগ্রী প্রকল্পের** মাসিক কিস্তি **ATM**-এর মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন।

বিটিটিবি এবং **গ্রামীণ ফোনের** বিল **ATM**-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়।

সেবাফোন, ওয়াসা, তিতাস, ডেসা ইত্যাদির বিল **ATM**-এর মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কার্ড সেল, ইনফরমেশন টেকনোলজী ডিভিশন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

হেড অফিসঃ ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৯৫৫৯৪১৮, ৯৫৬৩০৪৬-৯/১৬৪

ই-মেইলঃ ibbl@agni.com, ওয়েব সাইটঃ www.islamibankbd.com

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত